যুগন্ধাক্ষর

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

দশ টাকা মাত্র

লেখা-সম্পাদক

অধ্যাপক বিনয়কুমার মাহাতো

প্রীতিভাজনেষু

এক

বলতে গেলে দুপুরের খাওয়া সেরেই অনুলেখা তৈরি হতে আরম্ভ করেছে, আর তখন থেকে শিলাদিত্যর প্রতীক্ষা সুরু। অনুলেখার স্বামী শিলাদিত্য দত্ত। যে কোনো মুহূর্তে অনুলেখা সামনে এসে দাঁড়াতে পারে, চোখ দুটো কপালে তুলে ভুরু কুঁচকে ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিয়ে বলতে পারে, 'কি অপদার্থ তুমি, করছ কি এতক্ষণ, তৈরি হওনি!' বিরক্তির মাত্রা অত্যধিক হলে কথাগুলো বাঁকা উচ্চারণের ইংরেজিতেই প্রকাশিত হবে।

আকাশের শীর্ষবিন্দুতে দাঁড়ানো দুপুরের সূর্য পশ্চিমাকাশের ঢালু জমি ধরে অনেকখানি নিচে গড়িয়ে গেছে, দিগ্‌বলয়ের সীমারেখা অতিক্রম করে যেতে দেরি নেই বিশেষ, এতক্ষণে অনুলেখা বাইরে বেরুবার সাজগোজ শেষ করে বাড়ির সামনে বাগানের মতো পড়ো জমিটা পার হয়ে শিলাদিত্যর কাছে এসে দাঁড়াল। শিলাদিত্যর পোশাকের পারিপাট্য ততক্ষণে অনেকখানি ম্লান। ইতিমধ্যে মোটরখানার ওপর একপ্রস্থ কসরৎ শেষ হয়ে গেছে তার, এখন অনুলেখার ইচ্ছা ও অনুমতির অপেক্ষা।

অনুলেখা কিন্তু তার স্বভাবসিদ্ধ বাঁকা কথার আশ্রয় না নিয়েই বলল, 'যাক, তুমি এখানেই আছ, আমি ভাবছিলুম আবার খুঁজতে যেতে হবে।'

কৃতার্থ ভঙ্গিতে শিলাদিত্য উত্তর দিল, 'বাঃ, আমি কখন থেকে অপেক্ষা করছি!' তারপর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলল, 'চল তাহলে?'

'হেঁটে যাবে নাকি, গাড়ি—?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' শিলাদিত্য তাড়াতাড়ি গাড়ি বার করতে ছুটল। গাড়িটা যে ইতিপূর্বে অনড়তা জানান দিয়ে রেখেছে, এ কথাটা সে

আর অনুলেখার কাছে ভাঙল না। বললে অনুলেখা বিশ্বাস করবে না, একটা কদর্থ করে তাকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করবে।

শিলাদিত্য গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করতে গেল। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গ্যারাজ ছাড়ানো যায় না। ঠেলেঠুলে বাইরে আনতে হয়, হাঁটিয়ে হুঁটিয়ে এন্‌জিন উত্তপ্ত করে না তোলা পর্যন্ত গতিশক্তি জারি হয় না। কাজটা সময়সাপেক্ষ। আগেকার কাল হলে অনুলেখা এ দেরি সহ্য করতে পারত না, আজকাল প্রতিটি জায়গায় ঠেকতে ঠেকতে তার কিছুটা ধৈর্যবৃদ্ধি হয়েছে, তাই সে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

এ যেন অনুলেখার জীবনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। জীবন পর্বের আদি সুর বিস্মৃত, অন্তিম পর্যায় অজ্ঞাত। তাই কেমন খাপছাড়া মনে হয়। পায়ের নিচে মাটি, মাথার ওপর আকাশ, এ ধরনের রিক্তের সম্পদ ছাড়াও জীবনটাকে আশ্রয় দেবার মতো একটা সুষ্ঠু পরিবেশ আছে তার—আপাত নজরে আকিঞ্চন চোখে পড়ে না। অপরের কথা স্বতন্ত্র, এমনকি তারই হঠাৎ এবং আত্মবিস্মৃত নজরের সামনে জীবনের এই ফাঁকটুকু অল্প-বিস্তর চাকচিক্যময় আলোর আড়ালে বেমালুম লুপ্ত হয়ে থাকে। সেই রশ্মিটা সচেতন মনের নৈরাশ্যময় অন্ধকারে ডুবে গেলেই দেখা যায়, সে যেন এক অসহায় দুর্বিপাকের শিকার। নিজের অতীতটা—।

না, অনুলেখার অতীত নেই, অতীত অর্থাৎ পিতৃকুলের উঁচুতলার আভিজাত্য, মাতুলবংশের সম্পদ-গরিমা। ওটুকু নিজের হাতে মুছে দিয়ে আসার সাধ্য না থাকলে সে আজ এখানে এসে দাঁড়াত না। শিলাদিত্য কোনোদিনই অত ওপরে উঠতে পারত না, তার দুরাশার সিঁড়ির তেমন অজস্র ধাপ ছিল না। সাধ্যের শেষ স্তরে পৌঁছে অসহায় বুভুক্ষু চাতকের দৃষ্টি চোখে নিয়ে সে ওপরপানে হাঁ করে তাকিয়েছিল। হাতের নাগালে অনুলেখাকে পাওয়া দূরের কথা, তার কাছে পৌঁছুবার পক্ষে শিলাদিত্যর চোখের দৃষ্টিও তেমন স্বচ্ছ ছিল না। তাই অনুলেখা প্রায়ই লক্ষ্য করত শিলাদিত্য দত্তর—যার

পিতার নাম ঠিকেদার ঈশ্বর অমূল্যভূষণ দত্ত, পিতামহ মণ্ড-ব্যবসায়ী স্বর্গীয় কৃষ্ণভূষণ দত্ত, ওরফে কেষ্টা শুঁড়ী, আদি-নিবাস জেলা বরিশাল, সাকিন গঞ্জ ঝালোকাঠি—পদ্মপলাশ চোখজোড়াকে ভর করে এক নিয়ত করুণ অব্যক্ততার ভাব বিরাজমান।

শিলাদিত্যর বংশ-পরিচয় অনুলেখার যতটুকু শ্রুতিগোচর হয়েছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। বরিশাল জেলার গঞ্জ ঝালোকাঠির বিপত্নীক যুবক-প্রৌঢ় ব্যক্তি কৃষ্ণভূষণ দত্ত কাঁধে উত্তরী বগলে হ্যানিম্যানের বাক্স নিয়ে এ শহরে ভাগ্যান্বেষায় এসেছিলেন। স্বদেশে থাকতে নিঃসন্তান স্ত্রীর নিত্যগঞ্জনা সেবন এবং আহার বিরতি অথবা অর্ধাহারেই দিন কাটত তাঁর। শেষাবধি নির্বলের ভরসা গ্রহবিদের শরণ নিয়েছিলেন তিনি। গ্রহবেত্তা তাঁর কোষ্ঠীর সপ্তমস্থ শনির সঙ্গে অন্যান্য কুগ্রহের প্রেক্ষা বিচার করে আশ্বাস দিয়েছিলেন, জাতকের ভাগ্যোন্নতি অবধারিত, কিন্তু তা প্রথমা পত্নীর পরলোকপ্রাপ্তির পরবর্তী যুগে। এর কিছুদিন পরই সতী মধুভামিনী এয়োতি সিঁদুর মাথায় নিয়ে স্বর্গারোহণ করেন। নিন্দুকের মতে তাঁর মৃত্যু কিছুটা রহস্যাবৃত ছিল। কিন্তু সেকথা গ্রাম গঞ্জ মহকুমা ও জেলানগরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই বহু নদী পথ এবং খন্দ অতিক্রম করে কৃষ্ণভূষণ এ শহরে এসে চিকিৎসা পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছিলেন। শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত মদ্য-ব্যবসায়ী রাধানাথ সরকার তার মদের দোকানবাড়ির একখানি ঘর দিয়েছিল। সেখানেই ডাক্তারখানা। সেখানেই নিবাস আবাস।

রাধানাথ সরকারের একমাত্র সন্তান সুন্দরী শ্যামনন্দিনী—কিন্তু অধিক বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া। তৎকালীন সমাজ কর্তৃক অরক্ষণীয়ার পক্ষেও যে উদার ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা, তা'ও উত্তীর্ণ।

যথাসময়ে বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তার, বাজনাবাদ্যি করে বর এসেছিল, কিন্তু বিবাহ বাসরে ঢোকেনি। পাত্রপক্ষ পাত্রীর পিতার আর্থিক সঙ্গতির সন্ধান নিয়েছিল, কিন্তু সে ভাগ্যরবি কোন্ পথে উদিত, সে খোঁজ নেয়নি নাকি। কায়েতের ঘরের বর্ধিষ্ণু

পুরুষের শা-শুঁড়ীর মতো মদের ব্যবসা, এ তাদের পিতৃপুরুষে অশ্রুতপূর্ব। অতঃপর সে পাত্র বিদায় হল, তারপর আর কেউ ভরসা করে ভাঙাকপালী শ্যামনন্দিনীকে বিবাহ করতে আসেনি।

শ্যামনন্দিনীর জায়াভাগ্য বাঁধা ছিল কৃষ্ণভূষণের সপ্তমস্থ শনি হেতু বিচিত্র পন্থায় ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে। তারপর থেকে হ্যানিম্যানী ডাক্তার কৃষ্ণভূষণ দত্ত পরিচয় পরিবর্তিত কেষ্টা শুঁড়ী। কেষ্টা শুঁড়ীর ছয় পুত্র ষড়্রিপু। কামাবতার অমূল্যভূষণ, ক্রুদ্ধচরিত জ্যোতিভূষণ, লোভলোলুপ পরদারাসক্ত জীবনভূষণ, ধনমোহাচ্ছন্ন অমিয়ভূষণ, মদপ্রমত্ত বেকার চূড়ামণি অনিলভূষণ ও মাৎসর্য-ভাববিপন্ন সুনীল-ভূষণ।

যতখানি নিচু জায়গা থেকে শিলাদিত্যর উৎপত্তি এবং সর্ববিষয়ে যে পঙ্গু, তাকে নিজের সমান উঁচুতে টেনে তোলার সাধ্য অনুলেখার ছিল না। যে স্থান থেকে অনুলেখার উদ্ভব সেখানকার অতি সূক্ষ্ম আবহাওয়ায় গিয়ে টিকে থাকবার মতো জীবনগরিমা বা স্বোপার্জিত সুকৃতি শিলাদিত্যর নেই। সরল কথায় যাকে প্রেম বলে, শিলাদিত্য সম্বন্ধে তেমন কিছু অনুলেখা নিজের অন্তরে অনুভব করেনি। শিলাদিত্যকে সে কামনা করেনি। তার প্রার্থনায় আত্মাহুতি দিয়েছে। অনুলেখার একান্ত নিভৃত মনের স্বীকারোক্তি, শিলাদিত্য তার একটি এক্সপেরিমেন্ট। নিজের উদারতা ও আত্মত্যাগের পরিমাণ নিরূপণ।

আজ অনুলেখার কোনো অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই—তবু মাঝে মাঝে পেছনের দিনগুলো মনে পড়ে যায়, মনের অণু-পরমাণুতে আর্ত অসহায়তা, কিন্তু এ চিত্তদৈন্য বহির্জগতে টের পেতে দেয় না, বরং এক আত্মকেন্দ্রিক কাঠিন্যে নিজেকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে, তাকে দেখে ভয় পায় সকলেই। শিলাদিত্যর তো কথাই নেই, তার মনো-জগতে অনুলেখা সম্বন্ধে আজও এক কিংবদন্তীর ভাব বিরাজমান, আর অনুলেখা নিজের প্রকৃত উদার মনোবৃত্তি বিষয়ে সচেতন থাকা সত্ত্বেও শিলাদিত্যর বিস্ময়মাখানো হৃদয়ের পূজা-উপচার আঠারোআনা

অনীহার সঙ্গে গ্রহণ করে। সংকোচের বালাই যদি কিছু থাকে, আছে তার অন্তরের অন্তস্তলে, বাইরের দিকে তা অপ্রকাশ।

গাড়ি এখনো চলৎশক্তি পায়নি, হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিলাদিত্য ঘর্মাক্ত কলেবর। সেলফ্ স্টার্টার বলে গাড়িতে এককালে যে একটা সুবন্দোবস্ত ছিল, তা আজ প্রাচীন রূপকথা। হাতলের আস্ফালনে এন্‌জিনটা দু'একবার ফোঁস-ফাঁস করেছিল, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তার বার্ধক্যের খোঁয়াড়ি তখনো ভাঙেনি—তবে একটুখানি জাগরণ যেন এসেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত অনুলেখা ফটকের গায়ে শিথিল হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রীজহিল চপ্পল সমেত ডান পা-টি সর্বনিম্ন কার্নিসে তুলে দিয়ে শিলাদিত্যর চিরাচরিত কার্যকলাপ নিবিষ্ট অথচ নির্লিপ্ত চোখে নিরীক্ষণ করছিল সে। একপ্রস্থ দম নেওয়ার পর শিলাদিত্য এখন দ্বিতীয় দফার কর্মসূচীতে প্রবিষ্ট, ছোট অস্টিনটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার প্রতিটি পদক্ষেপে আশা-ভরসার ভাব পরিস্ফুট—গাড়ি এইবার সচল বিক্রমে জেগে উঠবে হয়তো।

অনুলেখা হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। শিলাদিত্য থমকে দাঁড়াল, গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে অনুলেখার কাছ থেকে অন্তত গজ-দশেক দূরে চলে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মুখ শিলাদিত্যর, অথচ এক ধরনের নির্বোধ আশাময়তার ছাপে লিপ্ত। কথাও বলল সেইরকম ভাব নিয়ে, অনেকক্ষণ পরে অনুলেখার সাড়া পেয়ে সে যেন বিভোর-চেতন, হোক না তা এককলি অর্থহীন হাসি।

কতকটা যেন বর্তে-যাওয়া কণ্ঠ শিলাদিত্যর, 'হাসলে যে!'

অনুলেখা আবার হাসল, এমন হাসি, যার অর্থ অনুধাবন করতে শিলাদিত্যর মতো মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর একটি পরিপূর্ণ জীবন না হোক

এক যুগ সময় আবশ্যক। পরক্ষণেই সে বলল, 'সত্যিই কিছু না, একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ চাষাড়ে রসিকতা আমার হঠাৎ মনে এল কেন, বল তো? তোমাকে দেখেই নাকি! ক্ষণে ক্ষণে তোমার অপরূপ রূপ পাল্টে যাচ্ছে বলেই বোধহয়? আধ-ঘণ্টাব্যাপী মেকানিক, সোফার, কুলি; অতঃপর—? মনে হচ্ছে কি জানো, তুমি সেই পৃথিবীবিখ্যাত হরেকরকমবা-র কারখানার একটি জিওবা!'

মানুষের মুখনিঃসৃত বাক্য সত্যিই যদি ছুরির ফলা হত তাহলে কথাগুলি শিলাদিত্যর শরীরে কেটে বসত নিশ্চয়ই। কিন্তু তার অনুভূতি যেন আজকাল স্বতঃবর্মাবৃত থাকে, তাই অনুলেখার উক্তি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যেব সঙ্গে হজম করে নিয়ে সে জবাব দিল, 'না আমার চতুর্থ শ্রীরূপ তোমায় এখন আর দেখতে হবে না, প্রবীণ অটোমোবিল এবার অটোক্র্যাশি ছেড়ে কমোনার হয়েছে—জিদ ছেড়েছে।' বলতে বলতে হাতঘড়ি দেখল শিলাদিত্য, 'শেষ পর্যন্ত তোমার একটু দেরি হয়েই গেল, কাল কিন্তু গাড়িটা মোটেই ট্রাবল দেয়নি!'

উত্তরে অনুলেখা যা বলতে চায়নি তাই বলে ফেলল। অথচ এত নিম্নশ্রেণীর কথা মুখে আনা দূরে থাক্, চিন্তার ধারে-কাছেও সে ঘেঁষতে দিতে চায় না। অনুলেখা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তীর নিক্ষেপ করার চেয়ে তূণে ভরে রাখাই বেশি কার্যকরী। নিশানা ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু নিয়ত আয়োজন, সদাপ্রস্তুতি চিরদিনই অব্যর্থ। তবু তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'কাল তো গাড়ি খারাপ হবার কথা ছিল না, কাল যে তোমার মাকে ট্রেন ধরাবার ছিল; তাঁর কন্যা সন্তানসম্ভবা, তার কাছে না গেলেই নয়।'

গাড়িতে উঠে বসেছে শিলাদিত্য, অনুলেখার জন্য ওপাশের দরজাটা খুলে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, 'তোমার এক কথা, এত সেন্টিমেণ্টাল তুমি!'

গাড়ির সুমুখ ঘুরে এপাশে আসতে আসতে অনুলেখা শিলাদিত্যকে লক্ষ্য করে। তার মাঝে মাঝে সংশয় হয়, সন্দেহ জাগে, অত চোখা চেহারার মানুষটা কি সত্যিই এত অসার? কিন্তু শিলাদিত্যর অসতর্ক মুহূর্তে অনুলেখা তাকে লক্ষ্য করেছে, লোকটা হয়তো ব্যবহারিক জগতে পূর্ণ সাবালক হতে পারেনি, কিন্তু আরও একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যা সে অনুলেখার সামনে গোপন রাখতে চায়—দাম্পত্য-জীবনের ভূমিকায় তাকে অগ্রণীর অধিকার দেবার জন্যই বোধহয়।

গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অনুলেখা বৃশ্চিক-দংশিতার মতো ছিটকে নেমে পড়ল, পরনের শাড়ি গাড়ির গোপন খোঁচায় বিঁধে বিঘতখানেক ছিঁড়ে গেছে। এরপর আর তার পক্ষে স্থিরভাবে বসে থাকা সম্ভব নয়। সে কেন, কেউই আর এ অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারত না। নামেই মোটর, আচার-আচরণে জঞ্জালফেলা ঠেলাগাড়ির অধম। এ গাড়ি চড়লে রিক্সা-চড়া পায়ে-হাঁটা নারী-পুরুষেরও জাত যায়। তারিফ করতে হয় অনুলেখার—তার অপরিসীম সহনশীলতার। প্রতিদিনের অনেক দুঃখ মুহুর্মুহুঃর অবমাননা সয়ে তার দিনাতিপাত। প্রায়ই মনে হয় সহ্যের শেষ সীমায় সে উপনীত, তবু তার মতো মেয়ে বলেই এখনো পর্যন্ত দাঁড়ি না টেনে মাঝে মাঝে অর্ধ-বিরাম সাময়িক বিরতি দিয়েই ক্ষান্ত।

গাড়ির এন্‌জিনের সচলতা আবার স্তব্ধ না হয়ে যায় সেদিকেই শিলাদিত্যর প্রধান মনোযোগ, অনুলেখার বিপত্তি নজরে পড়েনি। অনুলেখা হঠাৎ তীরগতিতে নেমে পড়তে সে বিস্মিত হয়। তার ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধানে চোখজোড়াকে পূর্ণস্ফুরিত করে বলে, 'কি হল, নেমে পড়লে যে!'

'না, নেমে না গিয়ে আমার উচিত ছিল তোমার গাড়ির সিটে গা এলিয়ে শুয়ে পড়া—সিডান বডির মারসেডিস্ তো! গাড়ি করেছ একখানা, উঠতে মাথা ঠোকে, বসতে শাড়ি ছেঁড়ে। এই দেখ আমার শাড়ির দশা! তবু রক্ষা, একেবারে বেআব্রু করে

ছেড়ে দেয়নি। তোমারই পৈতৃক সম্পত্তি তো? এক দেশমান্য পিতার সন্তানকে স্বামিত্বে বরণ করে আমার মান-ইজ্জত ভেসে গেল, এবার তাঁর গাড়ি চড়ে আব্রুটুকুও যায় যায়।'

এন্‌জিন বন্ধ হয় হোক, ওদিকে আর মনের একাগ্রতা বিদ্ধ করে না রেখে শিলাদিত্য গাড়ি থেকে নেমে এল। রাস্তাটা ফাঁকা বলেই বাঁচোয়া, তাই সে একান্ত অনুগত অপরাধীর মতো অনুলেখার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারল এবং তার আঁচল অনুসন্ধান করে নিজের মুঠোয় নিয়ে বলতে পারল, 'কোথায় ছিঁড়ল, দেখি?'

'সরে যাও ইডিয়ট,' অনুলেখা বেশ স্বচ্ছন্দেই বলে, 'কিছু তো নেই তোমার, শ্লীলতাজ্ঞানও কি নেই! হারিয়ে ফেলেছ, না কোনোদিনই জন্মায়নি?' বহুমূল্য প্রসাধনী রঙ ছাপিয়ে তার মুখের রক্তোচ্ছ্বাস বিশদতর জেল্লা দিচ্ছে, কিন্তু তার গাম্ভীর্যময় আভি-জাত্যের খোলশটা আর জুৎসইভাবে মুখের ওপর এঁটে বসে নেই।

কি যেন হল শিলাদিত্যর, যা বলা উচিত নয় তার অনেকখানি সে বলে ফেলল। এই বলাটুকুর ভবিষ্যৎ দায়-দায়িত্ব জেনেও বলল, 'এ ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করছ লেখা, লোকে দেখলে কি ভাববে?'

'লোক!' অনুলেখা অদ্ভুতভাবে হাসল। সে হাসিতে তার সুন্দর মুখটা খুব বেশি বিকৃত হল না যদিও, তবু যেন এখন সেদিকে তাকানো অসম্ভব। হাসিটুকু শেষ করে এক নিমেষ নীরব থেকে যেন খানিকটা দম টেনে নিল সে, তারপর সমস্ত বিষাক্ত শক্তি একাগ্র করে শিলাদিত্যর দিকে নিয়োগ করল, 'এই তো শহর, এখানে কে না তোমাদের চেনে? সকলেই জানে তোমরা আমায় ডিউপ করেছ, ঠকিয়েছ—ইনক্লুডিং ইওর ফাদার। আজ নয় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে তিনি জবাবদিহি থেকে বেঁচেছেন। তোমার মা কুঁড়ের জড়, বিয়ের দু'হপ্তা যেতে-না-যেতে আমায় শিলনোড়ায় পোস্ত বাটতে বসিয়ে দেন, কি না তাঁর হাজব্যাণ্ড পোস্তর বড়া খেতে ভালবাসেন। এর মানে কি? তিনি কি জানতেন না, আমি তো আমি, আমার আয়া অবধি কখনো শিলনোড়া দেখেনি?'

'লেখা।'

'ওঃ, রিসেণ্ট্‌লি কোনো বাংলা ছবি দেখেছ বুঝি, তাই ডাক দিতে শিখেছ, কিন্তু মনে রেখ, ইওর ওনলি ল্যানগোয়েজ ইজ ব্রেইং।'

এ পথ বড় কঠিন, সুর ও শব্দের মূর্ছনায় অম্বুলেখাকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন কঠিন শক্তির কবলে তাকে টেনে নিয়ে নির্মম নিষ্পেষণ। তার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝোলার ঝুঁকি নেওয়া।

কিন্তু নিজের শক্তি ও সাধ্যের মাত্রা সম্বন্ধে শিলাদিত্য সচেতন। জীবনের প্রথমাংশের সামর্থ্য ও মর্যাদা আজ আর নেই, অবলম্বনের অভাবে অসহায়তায় মূর্ত সে। অম্বুলেখা তাকে যতটা মূর্খ মনে করে ততটা মূর্খ সে নয়, তবে অবস্থাবিপাকে মূক। তার মনের প্রতিটি স্তরে এক আমূল বিবর্তন—যার ছাপ চোখে-মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখ দুটিতে কোনো ভাবের সাড়া নেই, আচরণে সত্যিকার গতিপ্রবাহ নিশ্চিন্তরূপে অনুপস্থিত। অথচ এরই মাঝে প্রাণের আস্ফালন দেখাতে হয় তাকে—অম্বুলেখাকে নিয়ে জ্বলন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার নাট্য-প্রহসন।

অম্বুলেখার উক্তি সাদর ঔদার্যের সঙ্গে পরিপাক করে নিয়ে শিলাদিত্য বলল, 'সত্যি তুমি দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ! শাড়িটা ছিঁড়েছে বটে, কিন্তু ছেঁড়া দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া তোমায় বাদ দিয়ে কে আর তোমার শাড়ির আঁচলের দিকে নজর দিতে যাবে? আমাদের শহর ছোট, কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী শহরে ক'জন আছে? এই নিয়ে আমায় সকলের ঈর্ষা। সেদিন পি. এ. ও. কি বললেন জানো, অবশ্য তাঁর তখন সাতপেগ হুইস্কির তুরীয় অবস্থা—।'

শিলাদিত্যের স্তুতি ও স্তোক শুনতে শুনতে অম্বুলেখার ক্রোধ খানিকটা নির্বাপিত হয়ে এসেছে, কিন্তু এক কথায় নিজের জিদ ত্যাগ না করে সে বলল, 'এসব কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না?

একজন মাতাল তোমার সুমুখে বসে তোমার স্ত্রীর রূপের প্রশংসা করে আর তুমি তাই সহ্য কর ?'

শিলাদিত্য বুঝতে পারল অনুলেখার উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, আরো কিছু বলে তার শেষ তাপটুকুও হরণ করে নেওয়া দরকার। নয়তো সামান্য স্ফুলিঙ্গ আবার কোন্ ছুতোয় দাবানল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কিভাবে এগুতে হবে তা স্থির করতে না পেরে সে একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলল। প্রথমটা অর্বাচীন হাসি হাসল, তারপর নিজের নির্বোধ মনোবৃত্তিটাকেই বুদ্ধির খোলশ জড়িয়ে এগিয়ে দিল, 'মাতাল বলেই অন্তত সে সময়টা তাঁর মনে কোনো পাপ ছিল না, তাছাড়া নিন্দে করাব অধিকার না থাক প্রশংসা করার অধিকার সবারই আছে। আর পি. এ. ও. তোমার মামাতো ভাই অধীরদা'র বন্ধু, তাঁরা তো এক সঙ্গে আর্মিতে ছিলেন ? পি. এ. ও. কিন্তু একজন সত্যিকার ভদ্রলোক।'

'কে অস্বীকার করেছে ?' শিলাদিত্যর মন্তব্যের পিঠেই অনুলেখা জবাব সেঁটে দেয়, 'কিন্তু ভদ্রলোকেরা যত তাড়াতাড়ি হাত বাড়ায়, ছোটলোকেরা তা পারে না, কারণ তারা এমনিতেই ব্ল্যাক লিস্টেড্ ক্রিচার।'

'তা ঠিক।' অনুলেখার কথায় সায় দিয়ে শিলাদিত্য আন্দাজ করে নেয় প্রতিপক্ষের ক্রোধের মাত্রা আরো অনেকখানি নেমে গেছে, তাই সে তার চোখের সুমুখেই কবজি উল্টে ঘড়ি দেখার সাহস করে। 'এঃ, একটি ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে, এর পর কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট রাখতে যাওয়া—'

'কিন্তু আমি তো স্থিরই কবেছি আর যাব না'। বলতে বলতে অনুলেখা শিলাদিত্যর গায়ে প্রায় ধাক্কা দিয়েই রাস্তার এপারে এসে বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে বলল, 'গাড়ি তো স্টার্ট নিয়েছে, এখন ওটাকে একটু হাওয়া না খাওয়ালে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না। তুমি বরং পি. এ. ও.-র ওখানে চলে যাও, তাতে পুরো না হোক অর্ধেক ভদ্রতা তো রক্ষা হবে। তাঁকে বোল, আমার শরীর খারাপ, তিনি

যদি নিজে এসে আমায় দেখে যান, আই শ্যাল বি মোর ডিলাইটেড্। বললে উনি আসবেনই।'

'উনি আসবেনই' কথাটা বলবার সময় অনুলেখা শিলাদিত্যর কালো-হয়ে-আসা মুখের দিকে চকিত চোখে তাকিয়ে দেখল। তার চিন্তা বিব্রত হল এক জায়গায়, শিলাদিত্য পাংশু হয়ে গেল কেন, তার যাত্রা-প্রত্যাখ্যান করায়, না উনি আসবেনই এই বিশ্বাস প্রকাশ করার জন্য ? এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথা মনে হল, শিলাদিত্য আজকাল মানুষ হবার চিন্তা করে নাকি!

পাশাপাশি দু'খানা গাড়ি ঢুকতে পারে শিলাদিত্যর পিতামহর শ্বশুরের বাড়ির ফটক এতখানি চওড়া, আর তার পৈতৃক সম্পত্তি পুতুলমার্কা গাড়ির খানতিনেক স্বচ্ছন্দেই—সেই বিস্তীর্ণ ফটকের প্রায় মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময়ও অনুলেখা তার কাঁধটাকে সংকুচিত করল, যেন পার্শ্ববর্তী জীর্ণপ্রায় স্তম্ভ দুটির স্পর্শ বাঁচাবার জন্যই। অনুলেখার এই অসঙ্গত আচরণ শিলাদিত্যর চোখের সুমুখে পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে ফুটে ওঠে। এ বাড়ির বধূ হয়ে আসার পর থেকেই তার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার প্রয়াস এক মনোরোগে পরিণত হতে চলেছে। বাড়িখানির অব্যবহৃত অনেকাংশে বুনো পায়রার বাসা, সর্বত্রই চড়ুই শালিখের অবাধ বিচরণ—তাদের বক্-বকম্ কিচির-মিচির অবধি তার কানে যেন বিজাতীয় সুর ও শব্দের আক্রমণ। দিন দিন রোগবৃদ্ধি হচ্ছে অনুলেখার।

দুই

অনুলেখা নিজের ঘরে ফিরে এল। এখানে, এ বাড়িতে তার অবশ্য নিজের বলতে কিছুই নেই। যাক, যে বা্যক্তিকে, ব্যক্তি নয় ঠিক লোকটাকে—ব্যক্তি কথাটা এখানে শিবরূপে মর্কটের উপাসনার মতো মনে হয়—যাকে কেন্দ্র করে সে এখানে নিজত্বের দাবি করতে পারে, সে-ই তার নিজের নয় যখন। এখানকার কোনো সঞ্চয়—সঞ্চয় অর্থে শতমুখী জীর্ণতা ও দৈন্য—এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই, বস্তুগত অথবা আত্মিক।

নিজের ঘর একটা কথার কথা মাত্র, সেই ঘরে ফিরে এল অনুলেখা। বিকেল পাঁচটায় প্রজেক্ট্ অ্যাড্‌মিন্‌স্ট্রেটিভ অফিসারের বাংলোয় চায়ের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়েছিল সে। মিস্টার সি. এন. অমবস্ট তার স্বর্গত মাতুল-পুত্রের বন্ধু। অফিসের কাজে প্রায়ই তিনি মহানগরী থেকে এখানে আসেন, সুদীর্ঘকাল ব্যয় করে যান। অনুলেখার মামার বাড়িও এখানে. এই শহরে, তার তথাকথিত শ্বশুরবাড়ির দেশে।

দরজার পর্দায় একটা ছায়া পড়ে স্থির হয়ে যেতে দেখে অনুলেখা সেদিকে তাকাল, সে জানে ছায়াটা কার, কিন্তু সাড়া দিল না।

'ঘরে আছেন মা?'

'মা!' অনুলেখার আটাশ বছর তন্বী বয়সের গায়ে যেন আরো আটাশ বছরের ভার এসে পড়ে। এ ডাকটা সহ্য হয় না তার। অথচ দুর্গা—যাকে দেখে অনুলেখার মনে একটা নামকরণের বাসনা জেগে ওঠে, বঙ্গললনা, যাকে সে ব্যঙ্গ করে, মেড ইন বেঙ্গল—এই মা-ডাক ছাড়তে পারেনি। অনুলেখার বিষবাক্যের কশা তার ওপর পড়লে বড় জোর এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে, 'ভুলে যাই যে মা!'

কিছুক্ষণ আগেই অনুলেখা তার মানসিক উত্তাপের অনেকখানি

অংশ শিলাদিত্যর ওপর উজাড় করে এসেছে, তাই এ যাত্রায় দুর্গাকে অব্যাহতি দিয়ে তার পক্ষে যা সাধারণ সেইরকম খানিকটা ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলল, 'ঘরে আছি জেনেই তো এসেছ, পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরেও আসতে পার।'

দুর্গা ঘরে ঢোকে, তার সম্বন্ধে অনুলেখার মন্তব্য মিছে নয় নেহাৎ। দক্ষিণ বিহারের গ্রামাঞ্চলে জন্মেও সে যেন বাংলাদেশের ছাপ সর্বাঙ্গে বহন করছে, অথচ তার পিতৃনাম এই প্রদেশীয়। যে পতি তাকে অকাল বৈধব্য দান করে গেছে তারটাও। দুর্গা এখনো জীবনে ত্রিশ-বত্রিশটার বেশি একই ঋতু দেখেনি, আর এ বাড়ির পরিচারিকারূপে তার আবির্ভাব বৈধব্যদুর্গতির পরই, অর্থাৎ পাঁচ-সাত বছর।

দুর্গা মৃদুশব্দে জানায়, 'সেই মেয়েটি এসে বসে আছে।'

'কোন্ মেয়েটির এমন দুর্মতি হয়েছে যে, আমার অপেক্ষায় বসে আছে?' প্রশ্ন করে অনুলেখা তার যুগলচোখে কৌতুক নাচাবার চেষ্টা করে, এমনি প্যাঁচ ঘুরিয়ে কথা বলতে বেশ লাগে তার। কথার ব্যবহার শুধু মনের ভাব প্রকাশের জন্যই নয়, সে ভাষা তো পশু-পাখিরও আছে। মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে ভাব প্রকাশের সুষ্ঠুতা এবং সর্বক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা সম্ভব না হলে উৎকর্ষ তো থাকা দরকার। দেহ আছে বলেই তাকে সাজাবার প্রয়োজন হয়, কথা আছে বলেই তার বিন্যাস-সাধন।

প্রায় সঙ্গোপন হাতে মাথার ঘোমটা স্থানন্যস্ত করতে করতে দুর্গা জবাব দেয়, 'সেই পাঞ্জাবী মেয়েটি।'

'ওঃ, প্রীতম কাওর—কতক্ষণ তিনি?'

'আপনি বাড়ি থেকে বেরুবার একটু আগেই এসেছে, তখন কাজে যাচ্ছিলেন বলে খবর দিইনি।'

নিজেকে সতর্ক করার অবসর পেল না অনুলেখা, হেসে ফেলল সে এবং বলল, 'তারপর দেখলে কাজে বেরুতে গিয়েও না গিয়ে অকাজ নিয়ে বসে আছি, তাই খবর দিলে বুঝি? তা বেশ করেছ,

কিন্তু তিনি যখন এতক্ষণ অপেক্ষা করতে পেরেছেন আর একটু পারবেন বোধহয় ? তাঁকে গিয়ে বল, আমার আধঘণ্টা দেরি হবে—আসছি।'

দুর্গার প্রবেশ ও প্রস্থান অনুরূপ, যেন এক অকারণ শুচিতায় নিয়ত পূর্ণ। কোথাও আড়ম্বর নেই। নিজেকে প্রচার করার লোভ নেই। অবশ্য প্রচার করার মতো কি-ই বা আছে তার! প্রচার শব্দ এখানে অপপ্রয়োগ, কিন্তু দুর্গাকে দেখলে এক ধরনের আঘাত পায় অনুলেখা, মনে হয় এ বাড়ির দাসীটা পর্যন্ত তার নম্র এবং নীরব উপেক্ষা দিয়ে তাকে অবিরত শাসন করছে।

পাঞ্জাবী মেয়েটি অপেক্ষা করছে, তার সময়ের মূল্য আছে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন জীবনায়োজনে ব্যাপৃত। এই সূত্রেই অনুলেখার কাছে আসা। কোথা থেকে খবর পেয়েছে শহরের অফিসার মহল ও অভিজাত আবেষ্টনীতে অনুলেখার জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান সংরক্ষিত হয়ে আছে, সে ইচ্ছে করলে অনেকের অনেক কিছু করে দিতে পারে। পাঞ্জাবের রিফ্যুজি মেয়ে প্রীতম কাওর একটি সরকারী উচিত মূল্যের দোকান চায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত খাদ্যবস্তু বিক্রয়াধিকারের সনদ। প্রীতম কাওরের বড় ভাই কুলদীপ সিংও একটি লাইসেন্স পেয়েছে। একই পরিবারে দ্বিতীয় দাক্ষিণ্য দিতে কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক কারণেই নারাজ। কিন্তু প্রীতম কাওর নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। তাছাড়া তাদের পরিবার ছোট নয়, একটি দোকানে যা আয় তাতে মোটামুটি অন্ন-আবাস সংস্থান হতে পারে, উদ্বৃত্ত থাকে না কিছুই। আর উদ্বৃত্ত ছাড়া উন্নতির সোপানও নির্মিত হয় না।

প্রীতম কাওরের ব্যস্ততা যতই থাক অনুলেখার উচিত নয় নিজের মূল্যহীনতার নিদর্শন ঐ রিফ্যুজি মেয়েটার সুমুখে ধরে দেওয়া, তাই কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও সে অযথা কিছু সময় ব্যয় করে নেয়। সময় অপব্যবহারের অপবাদ যাতে তার নিজের মনকে স্পর্শ না করে সেইজন্য বিকেলের দিকেই দ্বিতীয়বার বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। সেখানে খানিকটা সময়ের হিসেব রেখে এসে দ্বিতীয় দফা বেশ পরিবর্তন করে মুখের রঙ-টঙ পুনঃপর্যায়ে মেরামত করে নেয়।

তেইশ জোড়া স্লিপারের মধ্যে পছন্দসই একজোড়া বাছতে বসে—পরনের শাড়ির সঙ্গে সমতা রাখবে, না পুরোপুরি বৈষম্য তা স্থির করতেও সময় খরচ হয়।

প্রীতম কাওর ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, ঘরে ঢুকেই অনুলেখা সে অস্থিরতা প্রত্যক্ষ করে। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর পুলক-প্রসন্ন হয়ে ওঠে, পৃথিবীর অনেক স্থানেই তার মূল্যের অসীমতা অনুভূত হচ্ছে, সাক্ষাৎ প্রমাণ এই মেয়েটি।

অনুলেখাকে দেখে প্রীতম কাওর উঠে দাঁড়াল। পরনে গাঢ় সবুজ নকল সিল্কের সালোয়ার, কোর্তা ফিকে হলুদ, আর দুধসাদা ওড়নী। সাধারণত রূপ ও বয়স দিয়েই নারীর প্রাপ্য মান-মর্যাদা নিরূপিত হয়, এ সংবাদটুকু অনুলেখার সুপ্ত চেতনাতেও অনুস্যূত হয়ে আছে, তাই ইতিপূর্বে প্রীতম কাওরকে বারদুই দেখা সত্ত্বেও সে তার বয়েসের আন্দাজ নেবার চেষ্টা করে। চব্বিশ-পঁচিশ বোধহয়। কিংবা হয়তো অনুলেখার চেয়ে বছর পাঁচেক বড়ই; আঁটসাঁট পোশাক পঁচিশের ওপারের ঢিলে বছরগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

নিজের অনুসন্ধানী দৃষ্টির তাৎপর্য প্রীতম কাওরকে বুঝতে না দিয়ে অনুলেখা শান্ত আভিজাত্যের সঙ্গে বলল, 'বসুন!' তারপর দূরত্ব বাঁচিয়ে সে নিজে অপর একখানি চেয়ারে বসল।

অনুলেখার কাছে অনুগ্রহানুসন্ধানে এসেছে প্রীতম কাওর, কিন্তু তার কণ্ঠে উপযুক্ত পরিমাণ সানুনয়তা নেই, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, বলেছিলেন একসপ্তা পরে আসতে!'

নিজের কৃতিত্বে গুরুত্ব আরোপ না করে অনুলেখা বলল, 'হ্যাঁ, আমি কালেক্টারকে বলেছি—তাঁর সঙ্গে আমার মামার বাড়িতে দেখা হয়েছিল, পরশুই বোধ হয়। আপনি ডিসট্রিকট্ সাপ্লাই অফিসারের মাধ্যমে তাঁর কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিন।'

প্রীতম কাওর নড়ে বসে একটু, অনুলেখার কথা শুনে খুশি হয়নি। কারণ এ পর্ব একদফা পরখ করার পরই সে এই উমেদারীতে

এসেছিল। ডি. এস. ও. রূপী প্রপার চ্যানেল তার আবেদনে অননুমোদনের নোট দিয়েই উঁচু দপ্তরে পাঠিয়েছিল।

সাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সরলতা বাঁচিয়ে রেখে প্রীতম কাওর একটু হেসে জবাব দেয়, 'সে পালা একবার চুকে গেছে, ডি. এস. ও. আমার দরখাস্তের ওপর যা-তা লিখে নাকচ করে দিয়েছিলেন। তার ওপর কালেক্টারেরও না-মঞ্জুরী পড়েছিল।'

অনুলেখা নিঃশব্দে হাসে, অবশ্য সে হাসি প্রীতম কাওরের দৃষ্টি থেকে গোপন করবার চেষ্টা করে না। তার হাসিতে কিছুটা রহস্যের আভাস কিছুটা অনুগ্রহ বিতরণের ভাব। 'তা জানি, আপনি একটা নতুন কারণ দেখিয়ে আবার দরখাস্ত দিন, এবার কারো আপত্তি হবে না।'

প্রীতম কাওর অনুলেখার কথায় বাচনিক অনাস্থা প্রকাশ করে না, চুপ করে বসে থাকে, যেন কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ।

প্রীতম কাওরের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেও তা আমল না দিয়ে অনুলেখা বলে, 'তাহলে যা বললুম তাই করে দেখুন।'

এবার প্রীতম কাওর ঘাড় নাড়ে, 'কালেক্টারের অফিসে দু'শ-র ওপর দরখাস্ত পড়ে আছে, এখন কারো দোকান খারিজ না হলে নতুন লাইসেন্স দেওয়া হবে না—আমি খবর নিয়েছি। আপনি যদি কোনো এক সুযোগে কালেক্টারের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেন, তাহলে আমি নিজে তাঁকে একটু অনুরোধ কবব।'

অনেক কষ্টে অনুলেখার ভাষা ও শব্দোচ্চারণ অনুশীলন, কণ্ঠস্বরেই কয়েক পুরুষের আভিজাত্যলক্ষণ প্রতীয়মান, কর্কশতার মধ্যেও মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য শ্রোতার কানে তার পরিশীলিত ও উচ্চতর সামাজিক ধারায় অবগাহিত জীবনের ব্যাখ্যান করে। অভিজাত সংযমে বেঁধে রাখা স্বভাব প্রবৃত্তির রূঢ়তা ও অকৌলিন্য আজ কিন্তু সে ঢেকে রাখতে পারল না। মনে হল প্রীতম কাওর তার মুখে চাবুক মেরেছে যেন, আচম্বিতে এবং অকারণে। তাই সে কতকটা জ্বালাময়

স্বরে বলে উঠল, 'কালেক্‌টারের সঙ্গে আপনি দেখা করতে চান, এর জন্যে আমার মধ্যস্থতা কেন? আমি কি—'

এ বিষোদগার অনুলেখা কেন, যে কোনো নারীর পক্ষেই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ কার্যোদ্ধারের পন্থা যেখানে নিজের রূপ ও উচ্চশ্রেণীগত লীলালাস্য প্রদর্শন। প্রীতম কাওর কি নিজেকে অনুলেখার চেয়ে সুন্দরী মনে করে? তার চেয়ে শিক্ষিত এবং অধিক কলা-সৌষ্ঠবের অধিকারিণী? অনুলেখা যেখানে ব্যর্থ হবে ঠিক তাব পরের ধাপ থেকে যাত্রা সুরু করবে প্রীতম কাওর?

প্রীতম কাওর হকচকিয়ে ওঠে, অনুলেখা কি তার কথার ভিন্ন অর্থ করেছে, নয়তো হঠাৎ এ উত্তাপ কেন? এমন কিছু বলেনি সে, শুধু জানিয়েছে ছ'শ' দরখাস্তের ভিড়ে আর একটি প্রসারিত করে দেওয়া অর্থহীন প্রয়াস। তাই সে কালেক্‌টারের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার চায়। তাছাড়া—তাছাড়া, অনুলেখার যা সম্পদ সে ঐশ্বর্যে সে নিজেও পরিপূর্ণ, পরিণত এবং অনুলেখার মতো এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার নিজেরও আছে—তবে এটুকু প্রাথমিক পরিচয়ের সূত্র প্রয়োজন, যাতে কেউ চিনিয়ে দিতে পারে প্রীতম কাওর কে, এই মাত্র। সে প্রয়াস ইতিমধ্যে করেওছে সে, কিন্তু ধরে এগিয়ে যাওয়ার মতো সভ্য-সম্ভ্রান্ত খুঁটি পাওয়া যায়নি, তাই অনুলেখার মধ্যস্থতা প্রার্থনা।

প্রীতম কাওর ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলে, 'আমি নিজে চেষ্টা করেছি, সুবিধে করতে পারিনি। আপনার মতন একজন বিশিষ্টার সুমুখে যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি সে দেখা-সাক্ষাতের ওজন অনেক বেশি হবে। তখন আমি নিজের আবেদন পেশ করতে পারব, আপনিও অনুগ্রহ করে সেই সময় আমার জন্যে একবার বললে কাজটা হাতে হাতে হয়ে যাবে। আমি যদি কোনোরকমে একটা ইনটারভিউ যোগাড় করে তাঁর সঙ্গে দেখা করি তিনি হয়তো আমার কথা শুনেও শুনবেন না, কিন্তু আপনার উপস্থিতিতে আমার আর্জি কোনোমতেই বাতিল করতে পারবেন না।'

প্রীতম কাওরের সবিস্তার এবং সকারণ অনুরোধ শুনতে শুনতে অনুলেখার ক্রোধনির্বাণ হয়ে ভেতরটা ভিজে এসেছিল, বরং এক ধরনের গৌরববোধ হচ্ছিল তার। প্রীতম কাওরের সুপ্রসারিত বক্তব্য শেষ হতে সে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু মিস্টার লালের সঙ্গে আমার ততটা আলাপ নেই যে যখন খুশি তাঁকে বিরক্ত করতে পারি। পরশু মামার বাড়িতে দেখা হয়েছিল, কথা প্রসঙ্গে আপনার কথা বলেছিলুম, তিনি অবশ্য না বলেননি।' বলতে বলতে অনুলেখা শেষের দিকের কথায় কিছুটা জোর দেয়, 'পরশু-তরশু নাগাৎ আমার বার্থডে পার্টি, আপনিও আসবেন, তখনই মিস্টার লালকে বলা যাবে।'

প্রীতম কাওর বাস্তবিকই বিস্মিত হয়, কবে অনুলেখার জন্মদিন, পরশু, না তার পরের দিন! 'আপনার জন্মদিন কবে, পরশু, না তার পরে?'

'সেটা কাল স্থির হবে।' অনুলেখা গম্ভীরভাবে বলে, 'দশ-পনেরো জনের মতো চলতি রকম ডিনারের ব্যবস্থা করতে দু-একদিন সময় লাগবে তো! আপনি কাল সন্ধ্যের দিকে এসে খবর নিয়ে যাবেন। আমি যদি না-ও থাকি, আপনার জন্যে আয়ার কাছে স্লিপ ছেড়ে যাব। প্লিজ কাম এ বিট্ ডিসেণ্টলি ড্রেসড্ ইন দ্য ডিনার ইভনিং। আপনি কত দূর লেখা-পড়া করেছেন?'

অনুলেখার কথার প্রথমাংশ শুনে প্রীতম কাওরের বিস্ময় আরো বেড়ে গেছে। জন্মদিনের কথাটা কি মিথ্যে, একটা উপলক্ষ্য রচনা শুধু? সম্ভবত তাই, কিন্তু তার জন্য অনুলেখা হঠাৎ এতখানি উদার হয়ে গেল কেন—অন্তত দু-তিনশ' টাকার একটা ঐচ্ছিক ঝুঁকি? প্রীতম কাওরের বিস্ময়ের ওপর খানিকটা কৃতজ্ঞতার ভাব সঞ্চারিত হয়, দৃষ্টিতে সেই আবেশ নিয়ে সে অনুলেখার দিকে তাকিয়ে থাকে, অনুলেখার প্রশ্নটা অনুধাবন করতে কিছু দেরি হয়ে যায়। তারপর সেটি তার মস্তিষ্কে কিলবিলিয়ে ওঠে, এই প্রশ্নের সূত্র ধরে বিগত দিনের অনেক কথা স্মরণ হয়।

অন্যমনস্কতার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে প্রীতম কাওর জবাব দেয়, 'আই. এ. পড়তে পড়তেই তো সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলে

সব গুলিয়ে গেল।' আরো কিছু বলত সে, কিন্তু অনুলেখার কথার জবাবমাত্র দিয়েই ছেদ টেনে দিল।

'আচ্ছা—'

অনুলেখার অসমাপ্ত কথায় বিদায় দেওয়ার ইঙ্গিত, প্রীতম কাওর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, অনুতপ্তের মতো বলে, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম, তাছাড়া নিজের বোঝা অনেকখানি আপনার ওপর চাপিয়ে রেখেছি, সেজন্যে আমায় ক্ষমা করবেন।'

'না-না—'

'আমি যাই তাহলে, নমস্কার!'

অনুলেখা ঘাড় নেড়ে প্রীতম কাওরের নমস্কারের জবাব দেয়। প্রীতম কাওর চলে যাওয়ার পরও সে চুপ করে এই ঘরে বসে থাকে। প্রীতম কাওরের উপস্থিতি মন্দ লাগছিল না, অনুলেখাকে সর্বক্ষণ তার মূল্য-মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করে রেখেছিল। তাই সে ফস্ করে একটা ডিনার পার্টির প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে ফেলেছে। না না করেও অন্তত আড়াইশ' টাকার ধাক্কা। গৌরী সেন শিলাদিত্য নিজের সাধ্যসামর্থ্য অনুলেখার ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত ও প্রসারিত করে, কিন্তু একসঙ্গে এতটা বোঝা বহনের শক্তি তার আছে কি! তবে আয়োজন সে করবে, কারণ করতে তাকে হবেই। শুধু অনুলেখার ইচ্ছে বলে নয়, সেও তো উঁচুতে উঠতে চায়। মাথায় কলপমাখা বুড়োরা যেমন বয়েসের ষড়যন্ত্র কাটিয়ে যাবার প্রয়াস করে শিলাদিত্যও তেমনি; গণ্যমান্যদের ছায়া গায়ে মেখে নিজের কদর বাড়াতে সদাই ব্যগ্র।

সন্ধ্যাময় নিস্তব্ধ ঘরে বসে থাকতে থাকতে অনুলেখার সমস্ত চেতনায় কম্পন আরম্ভ হয়—অসহায় একান্তবোধ। মনে হয় তার জীবনটা যেন নিঃসঙ্গ ও ক্রূর দুর্বিপাকে আবর্তিত হচ্ছে, অথচ বেঁচে থাকার নির্লজ্জ আকুলতা। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বাঁচা নয়, মাটি থেকে অনেক উঁচুতে আকাশের প্রায় কাছাকাছি মাথা তুলে বেঁচে থাকা।

তিন

বাড়িখানি ছোট। ছাপরা ছাওয়া, কিন্তু সামনে পেছনে মাটির পাঁচিল ঘেরা জমি অনেকখানি। তাছাড়া হাতের কাছেই জাতীয় সড়ক। আর যে রাস্তার ওপর বাড়ি তার রোড বা সরণি গোছের কোনো নাম না থাকলেও সেটি মাঝারি ধরনের সড়কের পর্যায় পড়ে।

সবদিক বিচার করে বলা চলে এমন বাড়ি সর্দার সুজন সিং প্রায় জলের দরেই কিনতে পেরেছে।

প্রাক্তন মালিক পলাতক, দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে চলে গেছে, অথবা অন্য কোথাও, তার নাম-নিশানা নেই। দেশত্যাগী ব্যক্তিবর্গের সম্পত্তি রক্ষাকারী অফিসারের রক্ষণাধীনেই বাড়িটি পড়ে ছিল—স্বত্ব খরিদ করেছে সর্দার সুজন সিং। মূল্য নামমাত্র। এখন তবু মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই, হাত-পা ছড়িয়ে চলাফেরা করার মতো নিজস্ব পরিবেশ।

লাহোর শহরে সর্দার সুজন সিংকে অনেক কিছুই ত্যাগ করে আসতে হয়েছে। তিন পুত্রের ছুটি, তুই পুত্রবধূ, পত্নী রাজ কাওর আর পাঁচটি পৌত্রপৌত্রী। প্রাসাদোপম সুজন-ভিলা মোটর পরিবহন ব্যবসা মেরামতি কারখানা থোক কাপড়ের কারবার আর লাহোর ব্যাংকে গচ্ছিত টাকাকড়ি—এ সবের যথাযথ হিসেব আজ মনেও পড়ে না।

দেশ ছেড়ে চলে আসার সময় গো-যান মোটর-লরি আর রেলগাড়ি সর্দার সুজন সিংকে তার অবশিষ্ট পরিবার সমেত কোন্ পথ কোন্ নগরী ও প্রদেশ-প্রান্তর ঘুরিয়ে এই শহরে এনে ফেলেছে সে তথ্য তার অজ্ঞাত। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী ট্রেনের জন্য পাঁচদিনব্যাপী অপেক্ষা করতে করতে সুজন সিংএর হঠাৎ মনে হল, যাত্রার গতি যখন আর কখনো শহর লাহোরের দিকে ফিরবে না, তখন বৃথা-মুসাফিরি করে লাভ কি!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। প্ল্যাটফর্মের একধারে একমাত্র তোরঙ্গটি ঠেসান দিয়ে বসে মাটির ভাঁড়ে দেশী সরাব চুমুক দিতে দিতে সর্দার সুজন সিং পুত্র কুলদীপ সিংকে ডাকল, 'কল্‌দীপ সিং, এ মুণ্ডে (পুত্র)!'

কুলদীপ সিং সুমুখে হাজির হতে তার হাতে প্রসাদী পানীয়টুকু তুলে দিয়ে সুজন সিং বলল, 'য়্যঁহা পর ডেরা লাগাও—আওর আগে নঁহী বাঢ়েংগে।'

হুকুমটা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয় তবু যেন কুলদীপ সিং ঠিক-মতো বুঝতে পারেনি; সর্বপ্রথম পিতৃদত্ত সরাব পান করে মাটির ভাঁড়টা রেললাইনের দিকে সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'মতলব—?'

'মতলব, আর এগিয়ে লাভ নেই। বিহার মুল্‌কে আমরা এসে পড়েছি, এরপরই তো বাঙ্গাল। বাঙ্গালের দরবাজায় পাঞ্জাব একশ' বছর ধরে হানা দিচ্ছে, ওখানে ভিড় বাড়িয়ে বিশেষ লাভ হবে না। তাছাড়া দেশী সরাব, যা আজ চল্লিশ বছর পরে আবার মুখে তুলতে হচ্ছে, তা এখানেই তবু চলনসই! একবার সাহস করে মুখে ঢালতে পারলে পেট অবদি পৌঁছে যায়, গা বমি করলেও উগলে আসে না!' বলতে বলতে থেমে গেল সুজন সিং। তারপর আবার বলল, 'আকাশের দিকে তাকাতে হঠাৎ একসঙ্গে পাঁচটা তারা চোখে পড়ল, আমার পক্ষে সুলক্ষণ। পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় বর্ধমানের কাছাকাছি জি. টি. রোডের ওপর দাঁড়িয়ে ভাবছি, কি করি, কোথায় যাই, কলকাতায় ফিরি, না নিজের মুল্‌কের দিকেই এগিয়ে যাই! সন্ধ্যে হয়েছে, ঠিক আজকের মতনই একটা সন্ধ্যে, হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ পড়ল। তারা ফুটে উঠেছে, এক নজরে পাঁচটা তারা দেখলুম—তারপর আর কোনো ফিক্‌র নয়, দ্বিধা-সংশয় নয়, জি. টি. রোড ধরে টানা পশ্চিম, পশ্চিম আর পশ্চিম, একেবারে নিজের ওয়াতন, মুলক্‌-ই-পাঞ্জাব।'

সুজন সিং চুপ করল। দাড়ির প্রসাধন উঠে গেছে একরকম, সর্দারীণ রাজ কাওর ঘাতকের গুলিতে নিহত হওয়ার পর দাড়ি আঁচড়ানো হয়নি আর। সযত্ন পারিপাট্যে সর্দার সুজন সিংএর বয়ঃপ্রশান্ত শ্বেতশুভ্র দাড়িতে জাল জড়িয়ে দেয়নি কেউ। সর্দার সুজন সিং বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ি ঝাড়তে গেল। দাড়ির জঙ্গলে আঙুল জড়িয়ে যায়, তবু সেগুলোকে নিচে পর্যন্ত টেনে আনতে গিয়ে বুকের মাঝামাঝি এসে ঝপ্ করে তার কোলের ওপর পড়ল, একটু চমকে উঠল সে। তারপর সেই জনান্তিক চমকের লজ্জা কাটাবার জন্যই চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দারুর বোতলের অনুসন্ধান করে হাতে তুলে নিল, এখনো খানিকটা তলানি পড়ে আছে।

বোতলটি নাড়াচাড়া করতে করতে সুজন সিং জিজ্ঞাসা করে, 'মুণ্ডে কলদীপ, হুইস্কি কোথায়?'

হুইস্কি সিং কুলদীপ সিংএর তৃতীয় পুত্র। বড় দুটি স্কুলে পড়তে গিয়েছিল সেদিন, বাড়ি ফিরে আসেনি। তাদের দেহ অথবা দেহাবশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। অবশ্য অনুসন্ধান করার মতো নিশ্চিন্ত অবসর লাহোর শহরে আর প্রত্যাবর্তন করেনি।

পিতার কথার উত্তর না দিয়ে কুলদীপ সিং অদূরে তাকিয়ে পত্নী অমৃত কাওরকে প্রশ্ন করে, 'হুইস্কি কোথায়?'

ছ'গজ কাপড়ে তৈরি অমৃত কাওরের সালোয়ারের ভাঁজে ভাঁজে সুদূর পাঞ্জাব থেকে নিয়ে বিহারের এই সর্বাধিক অপরিচ্ছন্ন শহর পর্যন্ত সর্বস্থানের ধূলিস্বাক্ষর। প্ল্যাটফর্মের বিজলি আলোর নিচে দাঁড়িয়ে সে তার পরিধেয়ের অতিরিক্ত মলিন অঞ্চলগুলো নতুন তৈরি ভাঁজের আড়ালে নির্বাসিত করতে করতে জবাব দেয়, 'হুইস্কি? তাই তো—!'

'কোথায় সে, খুঁজে নিয়ে এস', সুজন সিং সুস্পষ্ট অপভাষায় খানিক গালিগালাজ করে, তারপর বলে, 'এই তো দু'দিন হল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে, এরই মধ্যে সব ছাপমারা বেদিয়া হয়ে গেল দেখছি। যাও, খুঁজে আনো হুইস্কিকে।'

কোথায় খুঁজতে যাবে অমৃত কাওর, নতুন জনারণ্য এখনো তেমন সড়গড় হয়নি, তাছাড়া সে এখন নিজের বেশ নিয়েই ব্যস্ত। প্ল্যাটফর্ম-চারী ভিক্ষুকের মন তার এখনো গড়ে ওঠেনি, তাই যত গণ্ডগোল। সর্বদাই নিজেকে ধূলিমলিন মনে হয়। তবে একটা দিকে সে ইতি-মধ্যে খানিকটা রপ্ত হয়ে গেছে, শ্বশুর রয়েছে কাছাকাছি, কিন্তু বাইরে বেরুবার সর্বাপেক্ষা বড় বাধা এবং গুরুভার উপকরণ লজ্জা ত্যাগ করেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এতখানি দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছে। শ্বশুরের সামনে দাঁড়িয়ে বেশবাস সংবৃতিতে বাধছে না আর। তবু তারই মধ্যে গায়ের ওড়নাটা মাথায় তুলে সে এবার সুজন সিংএর কাছে এসে দাঁড়াল।

সুজন সিং-বলল, 'সন্ধ্যে হয়ে গেছে, যাও খুঁজতে, কোথায় গেল সে?'

অমৃত কাওর হাসল একটু, সুজন সিংএর ব্যস্ততা দেখে না হেসে পারল না সে। তারপর দুশ্চিন্তাহীন স্বরে জবাব দিল, 'কোথায় আর যাবে হুইস্কি? যেখানেই গিয়ে থাকুক এখুনি ফিরে আসবে, হয়তো শহর দেখে বেড়াচ্ছে!'

'শহর দেখে বেড়াচ্ছে, তবে ফিরবে কখন?'

যেমন হঠাৎ হেসে ফেলেছিল অমৃত কাওর তেমনি হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, তারপরই যেন এক অচেনা গলায় বলল, 'পেটের খিদে তার পিঠে চাবুক মারতে মারতে এখানে তাড়িয়ে আনবে, এখুনি আসবে, আপনি ভাববেন না।' অমৃত কাওরের কণ্ঠস্বর থমকে পড়ে, তারপরই সে আবার বলে, 'কিন্তু পাপ্পু, ওকে আর দারু খাওয়াবেন না, আপনার আর আপনার মুণ্ডের রোজের দারুটা যদি অল্পবিস্তর যোগাড় হয়, তাই এখন ঢের।'

সর্দার সুজন সিংএর পৌরুষব্যঞ্জক মুখ কালো হয়ে আসে, কিন্তু বিজলির আলো এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারেনি, তার ওপর শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত মুখ স্বভাবতই দুর্ভেদ্য আড়াল বিশেষ, ভাবের রেখা-সমূহের লীলা প্রদর্শনের স্থান নেই ওখানে; তবু তার মেঘাবৃত

বাক্যাবলী স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'উওটি (বউমা), আমার চুয়াত্তর বছরের পুরনো হাড়ে এখনো এমন তাকাত্ আছে যে, আর কিছু না হোক, মাটি কুপিয়েও রোজ দু-চার টাকা রোজগার করতে পারি।'

অমৃত কাওর কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তা কানে না নিয়ে সুজন সিং বলে যায়, 'আমার জন্ম হয়েছিল মারমুর গ্রামে, লাহোরের কাছেই সে গ্রাম, কিন্তু লাহোরের মানুষও বোধহয় মারমুর নাম শোনেনি; কারণ ওখানে দীন-দলিদ্দার মানুষ ছাড়া অন্য কেউ থাকতই না। সেই গাঁয়ে পয়দা হয়েও সর্দার সুজন সিং নিজের কুবতে কি করেছে কি না, তা তুমি জানো, দেখেছ। সবই তৈরি করেছিলাম সবই চলে গেছে। সর্দারণী গেছে, জোয়ান জোয়ান ছেলেরা গেছে, পুত্রবধূরা, নাতিরা, বিষয়সম্পত্তি, অর্থ-ব্যবসা যা ছিল সবই তো গেছে। আজ হয়তো আমার জীবনে ফিরসে গিন্‌তি করার আর অবসর নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার আফসোস নেই। কি ছিল সেই চিন্তা ভাঙিয়ে খাওয়ার অব্যেস নেই আমার, আমি নিজের গতর ভাঙিয়েই খাব! আর নিজের মুখে দানা তোলবার আগে আমি আমার নাতিদের মুখেই দানা তুলে দেব।' বলতে বলতে সর্দার সুজন সিংএর হঠাৎ খেয়াল হয় সে অমৃত কাওরকে আদেশ দিয়েছিল হুইস্কিকে খুঁজে আনতে, সেই হুকুম অমান্য করে অমৃত কাওর এখানে দাঁড়িয়ে কি করছে, সুজন সিংএর স্বগতোক্তি শুনছে। সুজন সিং কড়া গলায় বলে, 'উওটি, তোমায় বললুম না, হুইস্কিকে খুঁজে আনতে? স্যাম্পেন কোথায়, তাকেও তো দেখছি না!'

অমৃত কাওর আস্তে আস্তে নম্র বিনীত স্বরে জবাব দেয়, 'স্যাম্পেন ঘুমিয়ে পড়েছে, সকাল থেকে ওর একটু জ্বর-জ্বর। হুইস্কি—ঐ, ঐ তো আসছে হুইস্কি!'

সর্দার সুজন সিং ডান দিকে তাকাল, সত্যিই হুইস্কিকে দেখতে পেল সে। এদিকেই আসছে। সাত পূর্ণ হয়েছে গত

মাসে, দেখলে বোধ হয় দশটা বসন্ত দেখেছে অন্তত। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত শরণার্থীর ভিড় কাটিয়ে চলে আসছে। একমাস আগেও বাড়ি থেকে বেরুনোর অব্যেস ছিল না তার, ইতিমধ্যে বেদের জীবনটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। চালচলন বা সুঠাম সপ্রতিভ ভাব দেখে মনে হয় না কোথাও কোনো আকস্মিক বঞ্চনার চিহ্ন আছে।

সুজন সিং ডাকল, 'হুইস্কি!'

হুইস্কি কাছে এল, সুজন সিং হাত বাড়িয়ে তাকে আরো কাছে নিয়ে এসে বলল, 'নিকম্মা ভেঁড়ার মতন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? কাল বাজার থেকে লজেন্স কিনে ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়ে দেব, ইস্‌টিশনে ফেরি করবি, বুঝলি? এখন এটুক খেয়ে নে, খিদে বাড়বে!'

হুইস্কিকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল সুজন সিং, তারপর সে মুখ খুলতে বোতলের অবশেষটুক তার মুখে ঢেলে দিয়ে বলল, 'গিলে ফেল তাড়াতাড়ি। ছ'মাস বয়েস থেকে বিলিতি সরাব খাওয়ার আদত্ তো, এ জিনিস গলা দিয়ে নামতেই চায় না। শরীরটাকে তৈরি করতে হবে, বুঝলি, সেইসঙ্গে মনটাও। দুনিয়ার কলিজায় কৃপাণের খোঁচা দিলে তবেই গেঁহু পায়দা করে—তার জন্যে কুবৎ চাই। ষোল বছর পুরলেই তোকে আমি ফৌজে ভর্তি করে দেব। হয় ফৌজ, নয় ট্রাক ড্রাইভারী। ফৌজে ঢুকলে জেনরল্ পর্যন্ত উঠবি, ট্রাক ড্রাইভারী থেকে সার্ভিস ওনার।'

সর্দার সুজন সিংএর বর্তমান পরিবারের একমাত্র পৌত্রী শেরী—বছর আড়াই হয়েছে তার। শেরীর পিতাকে দেশের মাটি থেকে এদেশে নিয়ে আসতে পারেনি সুজন সিং। সুজন অটো-মোবিলস্‌এর ডিপোয় আগুন নেবাবার সময় সে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল। হুইস্কিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সুজন সিং উঠে দাঁড়াল। জিন আর রাম। তেজী ঘোড়ার মতো ছিল জিন, সর্বদাই যেন যুদ্ধনাদে ফুঁসে ওঠবার জন্য উদ্‌গ্রীব। রামের

স্বভাবও কতকটা তাই। তারা সেদিন স্কুলে গিয়েছিল, ফিরে আসতে পারেনি। মৃত্যুদূতের দখলে সন্ত্রস্ত শহর, সে দৃষ্টি বাঁচিয়ে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব ছিল না। তারা মারা গেছে, এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অসহায় স্বস্তির শ্বাস ফেলতে হয়েছে—দুঃখাশ্রু বিসর্জন করারও সময় হয়নি।

পিতামহী এবং মাতাপিতাহীন শেরী রান্নার জায়গার একপাশে চুপচাপ বসে আছে। সুজন সিং কাছে গিয়ে দাঁড়াল, অদূর থেকে লক্ষ্য কবতে লাগল তাকে। আড়াই বছরে শেরীর সর্বাঙ্গে যেন আড়াইশ' বছরের জাগতিক অভিজ্ঞতার ছাপ। অবাক হওয়ার পালা চুকে গেছে তার, চোখদুটি নির্বাক মনে হয় এখন। পিসি প্রীতম কাওরের রন্ধনব্যস্ত হাতের দিকে তাকিয়ে আছে ঠিকই, বোধহয় খিদে পেয়েছে, কিন্তু চেতনায় ক্ষুধার্ত ভাব নেই আর।

সর্দার সুজন সিং একটু উচ্চস্বরেই ডেকে ফেলল, 'শেরী!'

শেরীর চমকে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তাকে চমকাতে দেখা গেল না, মাথা ঘুরিয়ে সুজন সিংএর দিকে তাকিয়ে সাড়া দিল, 'হুঁ!'

সুজন সিং কিছু আর বলল না, শেরীর কাছে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে অজস্র সোহাগস্নেহাপ্লুত চুমুতে ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা করল। শেরী বাধা দিল না, গ্রহণও করল না তা। সুজন সিং লজ্জাবোধ করে, এইমাত্র সে পুত্রবধূ অমৃতের কাছে বড়াই করে বলেছিল, সব গিয়েও কিছু যায়নি, কারণ মানুষের যা সর্বাপেক্ষা বড় ঐশ্বর্য, হিম্মৎ, তা ষোলআনা বেঁচে আছে, অথচ একটা তৃণতুল্য শিশুর মুখে হাসি ফোটাবার শক্তিটুকুও তার অপহৃত হয়েছে।

নিজের ক্ষুদ্রতা বোধটাকে সুজন সিং প্রীতম কাওরের ওপর দিয়ে কাটিয়ে নেবার চেষ্টা করে, 'সারা সন্ধ্যে বসে বসে করছিস কি, দু'খানা রুটি সেঁকতে রাত কাবার! দে একখানা রুটি আর এক পেয়ালা দুধ, আমি শেরীকে খাইয়ে দি।'

'দুধ তো নেই।' ভিজে কাঠের উনুনে বাতাস দিতে দিতে প্রীতম জবাব দেয়।

সুজন সিং পরুষকণ্ঠে ভেংচে ওঠে, 'দুধ তো নেই! কোথায় গেল কল্‌দীপ সিং, ডাক তাকে, এখুনি একটা গাই কিনে আনবে।'

'পাপ্পুজী!' প্রীতম কাওর পিতাকে ধমক দেয়। সুজন সিংএর তৎকালীন বিরাট পরিবারে এ অধিকার একমাত্র তারই ছিল, আজকের ক্ষুদ্র সংসারেও তা অটুট। কারণ সুজন সিংএর অন্যান্য সন্তানদের আবির্ভাব প্রাকৃতিক নিয়মে হয়েছে, কিন্তু প্রীতম পিতা-মাতার আরাধনালব্ধ কন্যা। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে একটি কন্যার কামনায় ধর্না দিয়েছিল সুজন-পত্নী রাজ কাওর। এবং সুজন সিং স্বয়ং। তারই একবছর পরে প্রীতমের ধরণী দর্শন।

ভর্ৎসনা ও উপদেশমিশ্রিত ভাষায় প্রীতম কাওর বলে, 'আজও কি আমাদের সেই লাহোরের দিন আছে? এ অচেনা দেশ, আমরা অসহায়, এখানে টিকে থাকতে হলে উত্তেজনা আর জিদটাকে কিছু জব্দ করে রাখতে হবে, নয়তো এখনো যেটুকু আছে তা-ও চলে যাবে।'

কিন্তু ততক্ষণে সুজন সিং নিজের গলার পাঁচভরি খাঁটি সোনার গুরুনামা তক্‌মাটা ছিঁড়ে ফেলেছে, ডান হাতে বুকের সঙ্গে শেরীকে বেঁধে বাঁ হাতে তক্‌মাটা নিয়ে প্রীতম কাওরকে দেখায়, 'আজ রাত্তিরের মধ্যেই আমার একটা দশসেরী দুধেলা গাই চাই। কল্‌দীপ সিং—মুণ্ডে কল্‌দীপ!' কণ্ঠস্বর আকাশে চড়িয়ে হাঁক দেয় সর্দার সুজন সিং।

হাতের কাজ ছেড়ে প্রীতম কাওর উঠে আসে, পিতার হাত থেকে সোনার তক্‌মাটা ছিনিয়ে নেয়, তারপর বলে, 'পাপ্পু, তোমার গরু চাই বলেছ যখন, তা হবেই, কিন্তু আজ নয়। সারা জীবন ধরে তুমি যা চেয়েছ সবই হাসিল করেছ, একটা সামান্য গরুর শোক তোমায় রাখতে দেব না। আজকের রাত্তিরটা বাদ দাও, কাল

থেকে তোমার শেরী স্যাম্পেন হুইস্কি দুধ পাবে, মাংস পাবে—শুধু আজকের রাত্তিরটা বাদ দাও।'

প্রীতম কাওরের কথায় সুজন সিং আর প্রতিবাদ করে না, শেরীকে কোলে নিয়েই সেখান থেকে সরে যায়—হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে দূরে। অনির্দিষ্টকে নিশানা করে রেললাইন ধরে এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ এক মনে হেঁটে যাওয়ার পর মনে হয় অনেকখানি চলে এসেছে, আবার প্ল্যাটফর্মের দিকেই ফিরে আসে—নিজের অবশিষ্ট পরিবারবর্গের কাছে।

চার

বিকেল গড়িয়ে সময়ের টান সন্ধ্যার ভাঁটার দিকে, তবে দেরি আছে একটু। উঠনের মাঝে চারপাই পেতে নিজের বিশাল দেহটাকে বসিয়ে রেখেছে সুজন সিং। শীতের পড়ন্ত বিকেলের রোদটুকু যতখানি সম্ভব বয়োপুষ্ট বিশালাঙ্গে শোষণ করে নিচ্ছে। গত বছর আশি পার হয়েছে, পুত্র কুলদীপ সিং আর সর্বোপরি কন্যা প্রীতম কাওর জোর করে তাকে কর্মজগৎ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে তাই, নয়তো তার একাশিপুরিত শরীরে এখনো একত্রিশের কর্মোদ্যম, পূর্ণ যৌবনের কর্মশক্তি। যখন বর্তমান পরিবারের কারো আবির্ভাব এ পৃথিবীতে হয়নি, সেই বিগত কয়েক দশক পূর্বেকার একক বাহুবল।

উঠনের একপাশে গোয়াল, সুজন সিংএর একজোড়া গাভীর একটি সদ্য-বিয়ান, সেটি চরতে যায়নি। ঠিকের রাখাল অপরটিকে এইমাত্র গোয়ালে পৌঁছে দিয়ে গেছে। অন্য বাড়ির গরুগুলিকে যথাস্থানে ফেরৎ দিয়ে সে আবার ফিরে আসবে। দুটি গরু দুয়ে দুধের বালতিটি সুজন সিংএর সুমুখে এনে রাখবে। দুধে আঙুল ডুবিয়ে পরখ করবে সুজন সিং। দুধের তরলতা দেখে খুঁত খুঁত করবে একটু। গাভী দুটির খাদ্যতালিকায় ভূষির সঙ্গে খোলের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতে বলবে। তারপর সুজন সিং মনে করে রাখবে কুলদীপ সিং বাড়ি ফিরলে তাকে ফরমাস করতে হবে ভাল কলাই সংগ্রহ করে আনতে। কলাই খাওয়ার পর গরু যে দুধ দেবে সেই দুধের সর থেকে মোটা দানার ঘি নিষ্কাশন করবে সুজন সিং। হুইস্কি স্যাম্পেন শেরীর খাদ্যতালিকায় সুজন সিং নির্বাচিত সর্বোত্তম সামগ্রী ভিন্ন আর কিছু স্থান পায় না।

'শেরী!'

'পাপ্পু—!'

সাড়া দিয়ে শেরী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাপ্পু বলে সে-ও সুজন সিংকে সম্বোধন করে। স্যাম্পেন হুইস্কিও তাই ডাকে। এর জন্য দায়ী হুইস্কি—তার দেখাদেখি বাকিগুলির শিক্ষা। পুত্রবধূ অমৃত ও কন্যা প্রীতম তাদের সহস্র খোঁচা দিয়েও সংশোধন করতে পারেনি।

সাধারণ শিখ-সমাজে অপ্রচলিত একটি বদভ্যাস আছে সুজন সিংএর। এ তার জন্মস্থান মারমুর গ্রামের প্রভাব। সুজন সিং ধূমপান করে। লাহোরে থাকতে বিলিতি চুরুট খেত, নতুন জায়গায় এসে প্রথমে হুঁকো ধরেছিল, এখন আলবলায় তামাক। কলকেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল সুজন সিং, 'আর একটা সেজে দিয়ে যা।'

শেরী নিরুত্তরে কলকে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। এ শহরে আসার পর সুজন সিং আবার ক্রমশ সবকিছু ফিরে পেতে আরম্ভ করেছে। মানুষ মরলে তার লৌকিক জগতে প্রত্যাবর্তন নেই, যারা নিহত হয়েছে তাদের কথা নয়, বাকি সব, সুজন সিংএর বিলুপ্ত বিষয়-বৈভব আবার ফিরে আসছে। গাড়ির ভিড় আর অনির্দেশ যাত্রার ধকল সহ্য করতে না পেরে যে মূলকৃত্যাগী শরণার্থী বছর সাত আগে তার অজ্ঞাত একটি শহরের রেল স্টেশনে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর ডেরা বেঁধেছিল, সেই শহরটার কাছে সুজন সিং আর অজ্ঞাত-পরিচয় নয়। বাজারেও কিছু কিছু খাতির বিশ্বাস জমেছে। সুজন সিংএর মুখের কথায় নির্ভর করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দু-দশ হাজার টাকার মাল ছাড়তে দ্বিধা করবে না। তবে সর্দার সুজন সিং ওদিকে হাত বাড়ায়নি, কারণ অবুঝ ছেলেমেয়ে দুটি তাকে বুঝি আর ভরসা করতে পারে না, ঠুঁটো করে দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার হাতে, তার ইচ্ছার নিষ্পেষণে তারা কাবু। ব্যতিক্রম শেরী। সুজন সিং নিয়তই অনুভব করে সে বুঝি আজও শেরীর ক্ষতির খেসারৎ দিতে পারেনি। মেয়েটার বিগত শোকস্মৃতি নেই, তবু সদা-বিমর্ষ। হয়তো এ তার স্বভাবজাত

ভাব, কিন্তু সুজন সিংএর ধারণা শেরীর মনোকষ্টের সব দায়দায়িত্ব তার, একা তার নিজেরই।

শেরী আলবলার কলকে বদলে দিয়েছে, গোয়ালা দুধ দুয়ে দিয়ে গেছে, শটকার মুখে টান দিতে দিতে সুজন সিং পশ্চিমাকাশে ঢলেপড়া সূর্যটার দিকে তাকায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে প্রায়, ঠায় বসে থাকতে আর ভাল লাগে না। অন্যদিন হলে সে এতক্ষণ সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত, আজ প্রীতম নিষেধ দিয়ে গেছে, 'আমি বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত বেড়াতে যেও না পাপ্পু।'

'কেন?'

'আমার হুকুম; হুকুমের পেছনে কেন-র যুক্তি থাকে না পাপ্পু। তুমি যখন হুকুম দিতে, তখন কি আমরা জিজ্ঞেস করেছি, কেন?'

হাস্যেলাস্যে জবাব দিয়ে গেছে প্রীতম কাওর। প্রথম দারিদ্র্যের সংঘাত ও পীড়নে সে খানিকটা ম্রিয়মাণ হয়েছিল, তার জীবনবসন্ত কিছুটা দূরায়িত হয়ে পড়েছিল, আবার সে সবের সক্রিয় প্রত্যাবর্তন হয়েছে। নিজের সন্তান বলে নয়, সুজন সিংএর মনে হয় প্রীতমের অঙ্গ-অবয়বে পশ্চিমী রুক্ষতার ছাপ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সম্ভবত অনেকখানি পুব-উজানে এসে প্রকৃত যৌবনোদগম হয়েছে বলেই।

প্রীতম বারণ করে না গেলে এতক্ষণে সুজন সিং বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। সকালবেলা কুলদীপ সিং পিতার হাতে দৈনিক পকেট খরচের পাঁচটা টাকা দিয়ে গেছে, সেটি নিঃশেষ করে ফিরত। বেড়াতে বেড়াতে বড় মাঠ পেরিয়ে ছোট ইসলামপুর পি. এল. রিফ্যুজি ক্যাম্পে চলে যেত। ওখানে এককালে সুজন সিংএর জন্যও ডেরা নির্দেশিত হয়েছিল, কিন্তু যায়নি সে। বিনম্র প্রত্যাখ্যানে সরকারী বদান্যতা ফিরিয়ে দিয়েছিল, 'আমার বেটা মুণ্ডে কল্দীপ সিং বেঁচে আছে হুজুর, সে মোটর চালাতে জানে, চাকরি জুটিয়ে নেবে। নাতিদের মধ্যে যেটা বড় সে পথে-ঘাটে লজেন্স ফিরি

করতে পারবে ; আর আমিও বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেওয়া মিঠাই বেচতে পারব।'

সুজন সিং পি. এল. ক্যাম্পের আওতায় গিয়ে পড়েনি, কয়েকটি পাঞ্জাবী পরিবার গিয়েছিল অবশ্য—সুজন সিংএর মতো মনোবল তাদের ছিল না, কিন্তু তারাও দু'এক বছরের মধ্যে ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে। রিফ্যুজি ক্যাম্প এখন ষোল আনা বাঙালীটোলা। সরকারের স্থায়ী দায়ের মোহর গায়ে নিয়ে ক্যাস ডোলের ভরসায় দিন গুজরান করছে তারা। যারা সত্যিকার অক্ষম নয় তারাও। সুজন সিংএর মনে হয় দ্বিতীয় কোনো বড় রকমের রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হওয়া পর্যন্ত পি. এল. ক্যাম্পের বর্তমান অধিবাসীরা স্থানত্যাগ করবে না।

ইসলামপুর রিফ্যুজি ক্যাম্পের সকলেই প্রায় সর্দার সুজন সিংএর পরিচিত, তন্মধ্যে ঘনিষ্ঠ একজন—ঠাকুরবাবা। বাংলা নাম সুজন সিংএর সব সময় মনে থাকে না। মনে থাকলেও মুখ দিয়ে বার হতে চায় না। লোকটির নাম কৃপাচরণ দেবরায়। এ নামটা উচ্চারণ করতে সুজন সিংএর জিভের যতখানি কসরৎ হয়, তদনুপাতে ফলং নাস্তি। ঠাকুরবাবা পর্যন্ত হাসে, 'পিতৃদত্ত নামটাই তো শুধু সঙ্গে এনেছি সর্দারজী, তা-ও ভুলিয়ে দেবে ?' তাই সুজন সিং কৃপাচরণের নামকরণ করেছে, ঠাকুরবাবা। পি. এল. ক্যাম্প ছাড়াও তা শহরের অন্যত্র প্রচলিত হয়েছে। নামও প্রসঙ্গানুগ। ঠাকুরবাবা জ্যোতিষচর্চা করে। কোষ্ঠী ও হস্তরেখা বিচার। নিজে সে চিররুগ্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কিন্তু তার বাচনিক প্রতিশ্রুতিতে মৃত-বিমর্ষ মানুষও বেঁচে ওঠে। ঠাকুরবাবা সুজন সিংএর হাত দেখে ছ'বছর আগে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল, আকাশে মাত্র একটা সূর্য সর্দারজী, কিন্তু তোমার হাতে দুটো স্পষ্ট সূর্যচিহ্ন। একটা অস্তমিত, অন্যটার এখন বাল্যাবস্থা, দ্বিতীয় কিস্তির ভাগ্যোদয় তোমার সুরু হয়েছে।'

হা হা করে সুজন সিং হেসেছে, 'ঠাকুরবাবা, আমার যে হাত দেখে তুমি সূর্য ওঠার কথা বললে সে হাতখানা আমি কেটে ফেলে

দিলেও আবার ভাগ্য তৈরি করে নিতে পারব। আমি বেশি লেখাপড়া শিখিনি ঠাকুরবাবা, আমার হাতের দস্তখত্ নিতে পুরনো খবরের কাগজও লজ্জা পায়। এটুকু শুনেছি দুর্ভাগ্যের রক্তনদী থেকেই শিখ জাতের জন্ম। দাবানলে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু আমরা ঐ আগুন থেকেই জন্মেছি।

ঠাকুরবাবার সঙ্গে সর্দার সুজন সিংএর দোস্তী। সুজন সিং প্রায়ই যায় তার কাছে। গল্প-সল্প করে, খবরাখবর নেয়। ঠাকুরবাবা নাকি একদা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিল, তার কাছ থেকে এর-তার নামে সুজন সিং খুঁটো প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে নিয়ে যায়। বৈদ্য ও পুরোহিতের কাছে খালি হাতে স্বাস্থ্য এবং ধর্মপুণ্য গ্রহণ করতে নেই, তাই তাকে কিছু-কিছু দক্ষিণাও দিয়ে আসে সে। আজ সুজন সিংএর ইচ্ছে ছিল পাঁচটা টাকাই ঠাকুরবাবাকে দিয়ে আসবে, কিন্তু প্রীতম বলে গেছে তাই সে বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না। চারপাইর ওপর প্রতিষ্ঠিত সুজন সিংএর ভারি দেহটা ছট্‌ফট্ করতে থাকে। বাল্যাবধি তার অব্যেস, যে কোনো ইচ্ছের উদ্রেক হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূরণ করা, প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিরাট তুচ্ছ এ সব বাতুল সংলাপে মনকে ব্যতিব্যস্ত না করে চিন্তাটাকে কার্যকরী করে তোলা।

যা হোক সুজন সিংকে বেশিক্ষণ ধৈর্য ধারণ করতে হল না, সটকায় একটা টান দিয়ে বাড়ির প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে গোঁফদাড়ির জালে ছেঁকে নেওয়া নির্মল পবিত্র ধূম উদ্‌গিরণ করতে করতে দেখল প্রীতম বাড়ি ঢুকছে। তার দু'হাত জোড়া; এক হাতে মেয়েলী ব্যাগ, অপরটিতে একটি কারুকার্য করা রেশমী থলে।

প্রীতম কাওর সুজন সিংএর কাছে এসে দাঁড়াল, থলেটা তার পাশে চারপাইর ওপরে নামিয়ে রেখে মেয়েলী ব্যাগ খুলে কি যেন বার করল সে। জিনিষটা দেখতে পেল না সুজন সিং। কিঞ্চিৎ কৌতূহল জাগলেও সে প্রীতমকে কোনো প্রশ্ন করল না, প্রীতম তার ইচ্ছাময় সন্ধ্যেটা আজ বরবাদ করে দিয়েছে। কুলদীপ

সিংএর দেওয়া টাকা পাঁচটা তার আজানুলম্বিত কামিজের পাশ পকেটে কোথায় পড়ে আছে, সম্পূর্ণ অস্তিত্বহারা অবস্থায়, কিন্তু সেগুলি যেন কুট্‌কুট্‌ করে কামড়াচ্ছে তাকে।

প্রীতমের মুখ রহস্যময় হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল, গলার স্বরেও তার খানিকটা প্রকাশ, বলল, 'তোমার হাত দেখি পাপ্পু, বাঁ হাতটা ?'

'কেন ?'

'দেখি না— !' প্রীতম যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলে।

অগত্যা সুজন সিং তার সুস্পষ্ট কব্জি সমন্বিত বাঁ হাত প্রীতমের দিকে প্রসারিত করে দেয়। লুকানো জিনিষটা এইবার বার করে প্রীতম। রূপোলী চেনে বাঁধা প্রায় আধপোয়া ওজনের সিলভার-কেসিং হাতঘড়ি সুজন সিংএর হাতে বেঁধে দেয় সে।

'ঘড়ি! হঠাৎ— ?' সুজন সিং এর অতিরিক্ত কথা বলতে পারে না, গলা ভারি হয়ে আসে, যে দুটি শব্দ সে কোনোমতে উচ্চারণ করতে পেরেছে তা-ও অশ্রুবন্ধনে বিপদগ্রস্ত।

চারপাইর প্রায় সবখানি জুড়ে সুজন সিং বসে আছে, তবু সেখানেই একটু জায়গা নেয় প্রীতম। পাপ্পুর প্রায় কোল ঘেঁষে বসে পড়ে সে, 'তোমার কাছে হঠাৎ, কিন্তু আমার কাছে নয়। ঘড়ি ছাড়া তোমার হাত তো আমি দেখিইনি, লাহোর স্টেশন পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা তোমার হাতছাড়া হল। তারপর থেকে আমি রোজ ভেবেছি কবে নিজের রোজগারে তোমায় একটা ঘড়ি কিনে দিতে পারব।' সুজন সিংএর হাতটা প্রীতম আবার নিজের হাতে টেনে নেয়। 'ঠিক এইরকম ঘড়িই তো তোমার ছিল, এখন এ জিনিষ খোলা বাজারে পাওয়া যায় না, স্মাগলড্‌ হয়ে বিদেশ থেকে আসে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুজন সিং, প্রীতম আর কিছু বলে কিনা খানিকটা সময় দিয়ে সেটা উপলব্ধি করে নেয়। প্রীতমের বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে অনুমান করে সে কথা বলতে যায়, ঠিক

সেই সময় প্রীতম হঠাৎ বলে, 'আজ তুমি বেড়াতে বেরুবে না তো ?'

'না কেন, এই তো যাচ্ছি, তোর জন্যেই দেরি হয়ে গেল।' সুজন সিং চারপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আজ তার ঠাকুরবাবার কাছে না গেলেই নয়। সুজন সিং এবং ঠাকুরবাবা দু'জনে এই বিরাট হিন্দুস্থানের দুই প্রান্তের অধিবাসী হয়েও একই তীরের শিকার। কিন্তু সুজন সিং মরে যাওয়ার পর আবার বেঁচে উঠেছে, অপহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার ও প্রত্যাগম দেখতে পাচ্ছে, তার সদ্য প্রমাণ এই হাতঘড়িটা। আর ঠাকুরবাবা, একগ্রস্থ মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পর্যায়ের মরণ-নির্যাতন। ঠাকুরবাবা জীর্ণ নয় আর, জীর্ণতা প্রাপ্তির পর অবসানের অণু-পরমাণু।

সুজন সিংএর মুখ থেকে কিছুটা আনন্দোচ্ছ্বাস আশা করেছিল প্রীতম, সেটুকু দেখতে না পেয়ে সে বিমর্ষস্বরে বলে, 'ঘড়ি কি তোমাব পছন্দ হয়নি পাপ্পু ?'

বহুদিন পবে সুজন সিং তার প্রাচীন অভ্যাস আয়ত্ত করে কব্জি উল্‌টে ঘড়ি ও সময় দেখে, তারপর উত্তর দেয়, 'খু-উ-ব পছন্দ, এ যেন আমার সেই পুরনো ঘড়িটাই !'

সন্ধ্যে হয়ে গেলেও চাঁদ উঠেছে আজ ; পথ-ঘাট মাঠ-ময়দানে অসুবিধে নেই, সর্দার সুজন সিং অকুতোভয় পদক্ষেপে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

পাঁচ

'না, আমার ঠিক আপত্তি নয়—।' ঘাড়টা সারসের মতো বাঁকিয়ে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে মেরুদণ্ডের প্রথম গ্রন্থির কাছটায় চুলকোতে লাগল শিলাদিত্য। মুদ্রাদোষ। বিশেষত দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলেই তার এই আচরণ—এ দুর্বলতা অনুলেখা বহুদিন পূর্বেই ধরে ফেলেছে।

শিলাদিত্যকে বিব্রত দেখে অনুলেখা অধিকতর উৎসাহী হয়ে ওঠে, গলার স্বরে অনাস্থার ভাব ফুটিয়ে বলে, 'বলছ বটে তোমার ওজর-আপত্তি নেই, কিন্তু আমার কোন্ ইচ্ছেটা তুমি সহজে মেনে নিয়েছ? সন-তারিখ তিথি-নক্ষত্র ধরে দিন-ক্ষণ হিসেব করতে পারব না, কিন্তু পাঁচ বছরের কম নয় নিশ্চয়ই—এর মধ্যে একটা দিনের কথাও কি তুমি বলতে পার, যেদিন আমার ইচ্ছেতে খুশিমনে সায় দিয়েছ?'

সোফার ওপর বসেছিল শিলাদিত্য, তার ঠিক সামনাসামনি না দাঁড়িয়ে অনুলেখা একটু আড়ভাবে অদূরেই দাঁড়িয়েছিল। তির্যক চোখের দৃষ্টি হানার পক্ষে স্থান নির্বাচন নিখুঁত। অনুলেখার বাঁকা দৃষ্টি ও ঠোঁটের ফাঁকে কাঁপা হাসি দেখে শিলাদিত্যর সর্বাঙ্গে অসহায়তার ছাপ ফুটে ওঠে, এ অবস্থায় অনুলেখার সামনে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বসে থাকা সম্ভব হয় না আর। কিন্তু এ দুরবস্থা গোপন রেখে সে উত্তরদিকের দেওয়ালের কাছে উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা অকারণেই টেনে দিল। আড়াল করার মতো কিছু নেই ওদিকে, নিরাবরণ আকাশ শুধু—হাল্কা মেঘের সচলতা ছাড়া বাকি সবই নীরব নিশ্চল। অকৌতূহলী নিস্পৃহ।

অনুলেখা সবই লক্ষ্য করে। শিলাদিত্যর মতো আপাত-সুদর্শন সৌম্য-সুঠাম নায়কের নিঃসম্বল রূপ দেখতে বেশ লাগে তার, তাই

প্রয়োজন না হলেও সে ঐ ব্যক্তিত্বহীন সত্তাকে রগড়ে-নিংড়ে আনন্দ-লাভ করবার চেষ্টা করে। এ ভিন্ন উপায়ই বা কি, বিয়ের পর থেকে জীবনটা এত ছোট্ট আয়োজন ও পরিসরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, এত বেশি সুখবৈচিত্র্যহীন, যে ক্ষুদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার করা ছাড়া সে অনন্যোপায়।

শিলাদিত্য আর একবার তার মুদ্রাদোষ পুনরাবৃত্তি করে, সারসের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে মেরুদণ্ডের প্রথম গ্রন্থি চুলকে নিয়ে মুখে হাসি টেনে আনে, 'তুমি বড় শিগ্‌গীরই চটে ওঠ, লেখা ; কবে কোন্ অসাবধান মুহূর্তে বলে ফেলেছি, অনুরাগের চেয়ে রাগের রূপেই তুমি আরো সুন্দরী, তারপর থেকে—'

অনুলেখা হাসে। এবং সে হাসিটা যে ষোলআনা মেকি শিলাদিত্যকে তা বুঝিয়ে দেবার জন্যই দ্বিতীয়বার হাসল সে, তারপর বলল, 'জীবনটাকে তুমি চিরদিন স্বপ্নের মতন ভাসিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ, বাস্তবের মধ্যে ডুব দিয়ে তার প্রকৃত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করনি তো? দূর থেকে আগ্নেয়গিরি দেখায় তোমার মতো প্রাণীরা অভ্যস্ত, আমাকে কাছে আনার স্পর্ধাই তোমার ভুল হয়েছিল। বিয়ের আগে মেয়েদের যে জিনিষটা পুরুষকে আকর্ষণ করে, পরে তাই সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দাঁড়ায়, এ বুঝি কোনো শুভানুধ্যায়ী বুঝিয়ে দেয়নি?'

'আমার আবার শুভানুধ্যায়ী!'

সঙ্গে সঙ্গে অনুলেখা বলে, 'অতটা অকৃতজ্ঞ হয়ো না। কেন, তোমাব বাবা, তোমার মা—তাঁরা তো সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী ছিলেন? তোমার মা আজও তাই আছেন। তোমায় আকাশের চাঁদ পেড়ে এনে দিতে তাঁরা তো গাফিলতি করেননি?'

শিলাদিত্যর সমস্ত প্রাণ যেন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজে, তাই সে অনুলেখার কথায় বিরতি পড়ামাত্রই বলে, 'যাক্, ও-সব কথা যেতে দাও।'

অনুলেখা জবাব দেয়, 'কোন্ কথাটা যাবে, কোন্‌টা থাকবে, তা তুমিই ভাল বোঝ, জানো। আমি জানি কোন্ কাজটা

হবে, বা হতে হবে, কিংবা যা হবে না, বা হতে পারে না। আমি কথার চেয়ে কাজেরই বেশি পক্ষপাতী।'

'বেশ তো—'

এবার অনুলেখা শিলাদিত্যর একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। আবার কি একটা বলতে গেল শিলাদিত্য, ততক্ষণে অনুলেখা বলল, 'আমি জানি আমায় এম. এ-তে ভর্তি হতে হবে, পাশ করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে ; তোমার মতো একটা হ্যাগার্ডকে নিয়ে আমি চিরকাল কাটাতে পারব না। অনেকদিন ধরে শূন্যে ভেসে রয়েছি, স্বপ্ন ধুয়ে খাচ্ছি, আর নয়।'

এবার আব শিলাদিত্য জবাব দিল না, প্রতিবাদ বা সমর্থন কিছুই নয়। অনুলেখার এম. এ. পড়তে চাওয়া এমন কোনো বাতুল প্রস্তাব নয়, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার উদ্রেকই আশ্চর্যের। প্রথমত সে যেমন চড়বড়িয়ে বাংলা ইংরেজির ভাষাবন্যা ছোটাতে পারে তাতে তার মগজ সম্বন্ধে খানিকটা ভুল সম্ভ্রমবোধ সাধারণের মনে জেগে ওঠা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যতগুলি পরীক্ষা পাশ করছে সবই তিনদাঁড়ি। দু-একটি পরীক্ষায় আবার সেই যোগ্যতা প্রদর্শন করতে কয়েকটি বিরাম দিতে হয়েছে। এ অবস্থায় এম. এ. ক্লাশে সে সীট পাবে কিনা সন্দেহ। এর জন্য শিলাদিত্যকে আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের সূত্র ধরে অনেকের পদলেহন করতে হবে। তা'ও হয়তো করবে সে, আবার প্রয়োজন না হতেও পারে, কারণ অনুলেখার নিজের সুপারিশের জোর অনেক বেশি এবং যথেষ্ট পরিমাণে নির্ঘাৎ।

কিন্তু অনুলেখার একটি ব্যাপারে শিলাদিত্যর স্বামিসত্তা সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক ডক্টর স্মৃতিময় সেনশর্মা। তরুণ তিনি, আজকাল চল্লিশ বছর বয়েসে মানুষ তরুণই থাকে। আর কো-এজুকেশন ক্লাশের অধ্যাপকদের অনেকেই ষাট-পঁয়ষট্টি বছরেও তারুণ্য অতিক্রম করেন না। সেদিক দিয়ে ডক্টর সেনশর্মার তারুণ্যের পরিচিতি এই শহরে সুবিদিত। যে বিভাগে তিনি

অধ্যাপনা করেন, পরীক্ষার চরম ফলের শাঁসালো উর্ধ্বাংশ সেই বিভাগের দু'একটি তরুণী ছাত্রীর জন্য মৌরসী-প্রথায় সংরক্ষিত থাকে। স্নাতক পরীক্ষার সাগর ছেঁকে গেঁড়ি-গুগুলি তুলে যারা কোনোরকমে পরপারে এসে দাঁড়ায়, তাদেরই দু'একজন ডক্টর সেনশর্মার বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ সম্মানের মণিমুক্তো আহরণ করে নিয়ে যায়।

কোন্ ঘটনাসূত্রে সেনশর্মার সঙ্গে অনুলেখার পরিচয় তা শিলাদিত্যর ঠিক জানা নেই, তবে মাসখানেক যাবৎ সে প্রায়ই তাঁর নাম করছে, সাধারণত যা করে না। স্তাবকের পর্যায়ে ফেলে-রাখা পুরুষকুলকে অনুলেখা একটি সাধারণ সুতোয় গেঁথে রেখেছে, তার মধ্যে গুটিকয় বড় এবং তা-বড় অফিসারও, কিন্তু তাদের কাউকে নিয়ে সে বিশেষভাবে মাথা ঘামায় না। অনুলেখার উঁচু পর্যায়ের চালচলন ও পুরুষঘেঁষা স্বভাব দেখে বিয়ের বছরখানেক পরে শিলাদিত্য একবার সহজ পন্থায় লক্ষপতি হবার বাসনায় তাকে চার হিসেবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অনুলেখার শিথিল মনোভাবের জন্য সে পরিকল্পনা সফল হয়নি।

অনুলেখার জীবনে পুরুষের ব্যষ্টিসত্তার প্রভাব যত প্রবলই হোক, কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি বলে শিলাদিত্য খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিল, কিছুদিন যাবৎ তার তরঙ্গহীন নিশ্চিন্ত ভাবপুকুরে বিক্ষুব্ধ চিন্তার ভাব প্রবাহিত হচ্ছে।

একই কথা অনুলেখা বোধহয় পাঁচবার বলেছে, 'ডক্টর সেনশর্মার সঙ্গে তোমার আলাপ নেই, আশ্চর্য, কোন্ দেশে থাক তুমি! হি ইজ স্মার্ট, পোলাইট এ্যাণ্ড ডিসেন্ট। তাছাড়া ডেপথ্ অফ লার্নিং আর ডেপথ্ অফ থট্, দুই-ই আছে। এদিকে কিন্তু খুব অমায়িক, দেখে বোঝা যায় না তিনি কত উঁচুর মানুষ।' তারপরও সে বলেছিল, 'ক'দিন থেকে ভাবছি, তাঁকে নেমন্তন্ন করে এনে তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই—এ্যাটলিস্ট ইউ উইল লার্ন ফ্রম হিম হাউ টু বিকাম এ ম্যান। কিন্তু ঠিক এইসময়

তোমার মা অসুখ বাধিয়ে বসলেন, আর আমার চক্ষুলজ্জা—ঐ চক্ষুলজ্জার জন্মে বলতে পারিনি।'

কি সব ভাবছে শিলাদিত্য, অনেকক্ষণ ধরেই ভাবছে, তবে তাকে কিছুটা সুযোগ এবং অবসর দিতে অনুলেখা কোনোদিন কার্পণ্য করেনি। অক্ষম মানুষ অপরের উন্নতির সিঁড়ি আড়াল করে দাঁড়িয়েই থাকে, সিঁড়ির কোণে কোণে খানিকটা খেদের বাষ্প নিঃসরণ করে শেষাবধি পথ ছেড়ে দেয়, ঐ পর্যন্তই। এটুকু বিরোধের সুযোগ না দিলে ব্যর্থতা ও আত্মগ্লানির বিষে জর্জরিত মানুষটা হার্টফেল করে মারা যাবে যে!

শিলাদিত্যর চিন্তার অবসরে অনুলেখা হঠাৎ বলল, 'ক'দিন থেকে দেখছি তোমার চেহারা একটু শুকিয়ে গেছে!'

একটা যেন কূল পেল শিলাদিত্য, তার জবাব যদি অনুলেখার মনঃপূত হয় এবং তথাকথিত চক্ষুলজ্জাবশত পি. জি. ক্লাশে ভর্তি হওয়ার বাসনাটা কিছুদিন স্থগিত রাখে তাহলে এ যাত্রা ফাঁড়াটা কেটে যেতে পারে। এক-দেড় মাস, তারপর ভর্তির সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ডক্টর সেনশর্মা দূরের কথা তাঁর নিয়োগকর্তার পক্ষেও অনুলেখাকে ভর্তি করা অসম্ভব। এমনিতেই তার বি. এ. পাশের মহিমা এতই সমৃদ্ধ যে, খোলা-মেলা স্বাভাবিক পথে পি. জি. ক্লাশে প্রবেশাধিকার সে পাবে না।

নিজের শুকনো মুখটা—অনুলেখার নিষ্ঠুর দৃষ্টিতেও যে বিশুষ্কতা ধরা পড়েছে—আরো করুণ করে স্তিমিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বরে শিলাদিত্য জবাব দেয়, 'মার অসুখ বেড়েই চলেছে, কখন যে কি হয়!'

কণ্ঠস্বর কর্কশ করতে চায়নি অনুলেখা বরং এ বিষয়ে সততই সে সাবধান। কিন্তু তার শিক্ষিত মনের অভ্যস্ত অনুজ্ঞা অগ্রাহ্য করে দুটি কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল, 'তাই নাকি!' এবং শব্দদুটি যখন তার মানখাতির মাড়িয়ে দিয়েই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে তখন আর সে বাকিটুকু গ্রাহ্য না করেই বলল, 'তাঁর অসুখের কথা আমি কি

জানি না? দেখ, তুমি প্রায়ই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর, যেন আমি এ বাড়ির কেউ নই, এ্যান আনওয়ানটেড্ গেস্ট। দু' বেলা দু' মুঠো খেতে পাওয়া ছাড়া আমার মতন গেস্টএর বোধ হয় আর কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই? যতক্ষণ আমরা স্বামী-স্ত্রী আছি ততক্ষণ এ ধরনের চিন্তা দয়া করে মন থেকে বাদ দাও তুমি—ইট ডিসক্রেডিটস্ য়্যু।···কিন্তু আমি বলছিলুম, পৃথিবীতে যে আগে আসে বিদায় নেবার অগ্রাধিকার তারই, এই প্রাকৃতিক নিয়ম; অথচ দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন তোমার মায়ের সঙ্গে বাজি রেখেছ, কে আগে যায়!'

এত সব কথা বলবে অনুলেখা, তা সে নিজেই ভাবেনি। বাস্তবিকই না। জগতে অনেক আবিলতা আছে, অনেক মালিন্য আবর্জনা, কিন্তু তা নিয়ে সে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না। সম্ভবত এই অপ্রিয় এবং নোংরা ইঙ্গিতটুকু সে এই পরিবারের একজনে রূপান্তরিত হওয়ার দরুনই দিতে পারল। এ তার নিজস্ব মানসিক গঠনের পরিচয় নয়, জন্মগত কৌলিন্য থেকে নির্বাসিত হওয়ার ফল। ধর্মত্যাগের শাস্তি।

শিলাদিত্য তার ব্যক্তিগত ভঙ্গির আত্মমর্যাদাবোধহীন ভাষার জবাব অথবা কৈফিয়ৎ দেয়, 'তা নয়, তবে বাড়িতে কারো অসুখ হলে সব সময়েই তো একটা ভাবনা থাকে।'

কাটা কাটা বিদ্রূপের সঙ্গে অনুলেখা বলে, 'তা বটে, কিন্তু তোমার সেই পূজনীয় পিতৃদেব আজ ধরাধামে না থাকলেও তাঁর জীবনকালে অপর যে ব্যক্তিটি তোমার মায়ের প্রতি পতিকৃত্য করতেন তিনি তো আজও বহাল তবিয়তেই আছেন।'

আজ ক'বছর ধরে অনুলেখাকে বহুভাবেই দেখছে শিলাদিত্য। অনেক সময় সন্দেহ হয় সে কি সত্যি সত্যিই জীবন্ত আত্মা-সমন্বিত নারী একজন! নিজের নিয়ত আঘাতপ্রাপ্ত মনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সে একটা আপস করে নিয়েছিল, আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সহনশক্তি বাড়িয়ে ফেলেছিল অনেকখানি; আজ কিন্তু সে অনুলেখার ভাষা

ও ভঙ্গির এতটা উলঙ্গ স্বেচ্ছাচার সহ্য করতে পারল না, খানিকটা ক্রোধ ও কাতরোক্তিমিশ্রিত গলায় চিৎকার করে উঠল, 'অনুলেখা!'

গরম লোহা ছেদনের জন্যে ঠাণ্ডা লোহা প্রয়োজন, এ নীতিবাক্য স্মরণ করে অনুলেখা শান্তকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার কুমারব্রতী সেজকাকার কথাই আমি বলছিলুম।'

আকস্মিক উত্তেজনায় শিলাদিত্যর মস্তিষ্কের কোষগুলিতে রক্ত ছুটে আসে, রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো সে নির্জীব এবং স্তব্ধ।

শিলাদিত্যর প্রাণহীন মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অনুলেখা তার ব্যথায় বিমর্ষ হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার সেই মানবিক উদ্যমকে ব্যঙ্গ করে মনের মধ্যে এক ধরনের উল্লাস সঞ্চারিত হয়। সে অনুভব করে এ তার মানসিক সংকীর্ণতার লক্ষণ—যা বিবাহপূর্ব জীবনে তিলমাত্রও ছিল না। বিয়েটা তার ক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়েই জঘন্য পরিণতি লাভ করেছে। এই উপলব্ধি জাগতে সে যেন আরো ক্রূর হয়ে ওঠে, মনের আবিল বীভৎসতা উন্মুক্ত করে দিতে ব্যগ্র হয়। 'তোমায় আমি দোষ বা লজ্জা দিচ্ছি না, এমন ব্যাপার অনেক সংসারেই চলছে। এ সব ঘটনা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু একজনের জন্যে আমার নিজেরটা যখন খোয়া যেতে বসেছে তখন তো আমি অল্পবিস্তর বলবই!'

শিলাদিত্য হঠাৎ বলে ফেলে, 'আর কি বলতে তুমি বাকি রেখেছ?'

অনুলেখা জবাব দেয়, 'না, সব কথা এখনো বলা হয়নি। মেয়েমানুষের হার্ট এ্যাটাক, বিশেষত পলিতকেশ বুড়ির—কোনোকালে তো শুনিনি! তা তাঁর রোগের ব্যাপার তিনিই জানেন। আমার বক্তব্য, একটা পাপ নারকীয় দেহ নিয়ে পরমায়ুর খুঁটি আঁকড়ে বসে থাকার এত সাধ কেন তাঁর? যদি ভাবতেই হয় ভাববেন তিনি নিজে আর তাঁর প্রিয়তম সেজদেওর—তোমার কেন মাথাব্যথা? তবু

তা'ও আমি বলছি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে নিয়তির সুতোয় আমি যে বাঁধা পড়ে গেছি—এর জন্য অনুযোগ আমি করব বইকি।'

না, এসব কথার জবাব দিতে চায় না শিলাদিত্য। মা নীলিমা দেবী আর সেজকাকা জীবনভূষণের নাম অনেকের রসনাস্পৃষ্ট গাথায় একত্রে উচ্চারিত হতে শুনেছে সে—ছেলেবেলা থেকেই শুনছে। এমনকি নারী ও পুরুষের মাঝে এক বিশেষ সম্পর্ক থাকতে পারে এ তথ্যও সে সর্বপ্রথম ঐ কথিকা থেকে আবিষ্কার করে। কিন্তু নিজের চোখে কখনো কিছু দেখেনি। সকলের অলক্ষ্যে শোনবার জন্যে আড়ি পেতেছে, ওৎ পেতেছে দেখবার জন্য, কিন্তু সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হবার মতো কোনোদিনও কিছু শোনেনি। বা দেখেনি। সেজকাকা চিরকুমার, মা তাঁকে ঠাট্টা করে ডাকতেন কুমারী কন্যা। এখনো মাঝে সাঝে ঐ নামে সম্বোধন করেন। এবং বলতে বাধা নেই সেজ-কাকা এই দুনিয়ায় একমাত্র নীলিমা দেবীরই অনুরক্ত। তাঁর ইচ্ছায় সেজকাকা খোলা বাজারের মাঝে গিয়েও যে কোনো মানুষের কাঁচা মাথা কেটে আনতে পারেন। কিন্তু এক পক্ষের স্নেহ এবং অপর পক্ষের অসাধারণ আনুগত্য, এইটুকু দিয়েই কি দুটি নারী-পুরুষের একান্ততম সম্পর্ক নির্ণীত হয়?

তাছাড়া শিলাদিত্যের বাবার তরফ থেকে তো এ ব্যাপারে তিলমাত্র দুশ্চিন্তা বিক্ষোভ বা অনুযোগ দেখা যায়নি! অমূল্যভূষণ জীবনভূষণকে দেখতে পারতেন না, অকর্মার ঢেঁকি বলে সম্বোধন করতেন, বলতেন ভাইএর সংসারে আগাছা, এ ছাড়া অন্য অভিযোগ ছিল না তাঁর।

কিন্তু এতগুলি নিঃসন্দেহতার মাঝেও একটা সন্দেহের কাঁটা আছে—শিলাদিত্যের কনিষ্ঠ ভাই অর্ণব। অর্ণবাদিত্য। হাবভাব চালচলন কথাবার্তা সবই যেন সেজকাকার প্রমাণিত প্রতিলিপি। লোকে বলে, ও নাকি তাঁরই! অর্ণব জন্মাবধি জীবনভূষণের জীবন-সম্পদ। অমূল্যভূষণের ধারে-কাছে ঘেঁষত না সে, তিনিও বড় একটা আমল দিতেন না। এসব দেখে শিলাদিত্যের একটু-আধটু

সন্দেহ না হত, তা নয়, কিন্তু সে সন্দিগ্ধ মনোবিকার বেশিক্ষণ টিকত না। তার নিজের পিতৃপরিচয় নিয়ে কোনো সন্দেহ কখনো দেখা যায়নি। আঠারো-আনা স্বতঃসিদ্ধ, শিলাদিত্য সেই পিতারই সন্তান যাঁর নাম সে সর্বত্র গৌরবের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারে, স্কুল-কলেজের খাতাতেও তার পিতৃপরিচয়ে নাম ছিল যে ব্যক্তির। অথচ পুত্র শিলাদিত্যের চেহারা মেধা স্বভাব আচরণ কোনোকিছুর সঙ্গেই পিতা অমূল্যভূষণের তিলাণু সঙ্গতি সামঞ্জস্য ছিল না। বরং এই শহরের অপর একটি লোক, যে তার চেয়ে বছর পঁচিশ ত্রিশ বড়, তাকে দেখলে এক বয়স্ক শিলাদিত্য মনে হতে পারে ; কিন্তু এ বাড়ির সঙ্গে তার কস্মিনকালের পরিচয় বা সম্পর্ক উল্লেখ করে না কেউ।

শিলাদিত্যের চেহারার বিমর্ষ ভাব ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে দেখে অনুলেখা আবার কি একটা বলবার চেষ্টা করে, ঠিক সেইসময় দরজার পর্দাটা দু'হাতে ঠেলে দুর্গা—অনুলেখা যাকে ব্যঙ্গ করে নাম দিয়েছে শ্রীমতী বঙ্গললনা—ঘরে ঢুকল। দুর্গার পক্ষে এ এক অভাবিত আচরণ। অনুলেখা ঘরে একা থাকলেও সাড়া না দিয়ে সে আসে না, এবং সে ও শিলাদিত্য দু'জনে একত্র আছে বুঝতে পারলে শত প্রয়োজনেও চৌকাঠ মাড়ায় না, যতখানি সময়ের জন্যেই হোক প্রয়োজন স্থগিত রাখে।

একটা কঠোর বাক্যবাণে দুর্গাকে সিধে করে দেবে বলে ভাবছিল অনুলেখা, কিন্তু তৎপূর্বেই দুর্গা কথা বলল। অনুলেখার দিকে না তাকিয়ে, সম্ভবত তার প্রতি খানিকটা নীরব মৌন তাচ্ছিল্য উগলে দিয়েই সে শিলাদিত্যকে বলল, 'মা বোধ হয় আর বাঁচবে না, কেমন যেন করছে !'

দুর্গার সন্ত্রাসকৃষ্ণ মুখ আর বে-নিয়মের উপস্থিতি থেকেই শিলাদিত্য খানিকটা কারণ অনুমান করতে পেরেছিল, তাই তার কথা

শুনে সে বিশেষ চমকিত হল না, তাছাড়া মা'র পরমায়ুর অবশিষ্টাংশই যে এখন ব্যয়িত হচ্ছে এও নিশ্চিত। উপরন্তু একটা বড় কথা, ইদানীং সে যেন চাইত না মা আর বেশিদিন বেঁচে থাকেন। অনুলেখা এ সংসারে আসার পর থেকে এবং মা'র দিকে তার মাঝে-সাঝে বিষদৃষ্টিতে তাকানো থেকেই—অবশ্য মা'র অলক্ষ্যে, কিন্তু শিলাদিত্যকে দেখিয়ে—সে ভাবত, অনুলেখার ঘৃণিত দৃষ্টির আঁচে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে চিতার আগুনে ভস্মীভূত হওয়াই তাঁর এবং শিলাদিত্যর নিজের পক্ষে অধিকতর সম্মানের।

দুর্গা যে সংবাদ নিয়ে এসেছে তার জন্যে শিলাদিত্য কিছুমাত্র ব্যস্ততা বা দুশ্চিন্তা দেখাল না, বরং স্বস্তিপূর্ণ স্বরে বলল, 'আচ্ছা, তুমি মা'র ঘরে যাও আমি আসছি, দেখছি গিয়ে কি ব্যাপার।'

দুর্গার প্রস্থানের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত ওপর পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট টিপে অনুলেখা দাঁড়িয়ে রইল। তার অনুদার মনটা অপমানের মোচড় খেয়ে উঠল। আর তারই বহিঃপ্রকাশ একপ্রস্থ ঝড়ের মতো প্রবাহিত হয়ে এল, 'বাঃ, তোমার যে এতটা উন্নতি হয়েছে তা তো জানতুম না আমি, ঝিকে দিয়েও আমায় অপমান করাতে শিখেছ?'

'অপমান—!' কি যেন বলতে গেল শিলাদিত্য।

ঠোঁটের কোণ ও চোখের কানা উপচে যথাসাধ্য ব্যঙ্গ ঢেলে দিয়ে অনুলেখা বলল, 'থাক্, আর কথা বাড়িও না, মা'র কোলের কাছটিতে শেষ বারের মতো গিয়ে বস, কিন্তু তিনি দেহরক্ষা করার পর আমাকেও অশৌচ পালন করতে হবে তো?'

'তা তো—!'

শিলাদিত্যর মুখের কথা কেড়ে নিল অনুলেখা, 'তা তো হবেই —এই তো? কিন্তু কেন, তোমরা কি আমায় বাড়ির বউ মনে কর?'

'নয়তো কি মনে করা হয়?'

'কথাটা তোমার উপযুক্তই বটে,' অনুলেখা তার বাঁকা চোখের বক্রতা প্রসারিত করে, 'তা না হলে দুর্গা অবধি জানে এ বাড়ির

মাইনে করা ঝির যা দাম, আমার তা নেই। নয়তো বাড়ির গিন্নী মরছেন, আমায় আড়াল করে দাঁড়িয়ে কথাটা সে শুধু তোমাকেই বলে!'

মা'র মৃত্যুসম্ভাবনার জন্য শিলাদিত্যর তিলমাত্র দুঃখ পরিবেদনা নেই, কিন্তু এটাই সে আপাতত নিজের আত্মরক্ষার বর্মস্বরূপ ধারণ করবার চেষ্টা করে, 'এখন কি এইসব আলোচনার সময় লেখা, আমি মা'র ঘরে যাচ্ছি, ইচ্ছে হয় তুমিও আসতে পার।'

হঠাৎ কিসের শক্তিতে এতখানি দুঃসাহসী হয়ে উঠল শিলাদিত্য, অনুলেখা স্তব্ধ বিস্ময়ে সেই কথা চিন্তা করে। শিলাদিত্যর মা মৃত্যুমুখে, প্রায়-আকস্মিক এই দুঃসংবাদই কি তাকে আচম্বিত আঘাত দিতে গিয়ে তার মধ্যে ভুলক্রমে খানিকটা শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছে! তার শান্ত-কঠিন স্বরে উচ্চারিত একটিমাত্র কথায় এতখানি স্পর্ধার দর্শন সম্ভব, অনুলেখার ধারণার অগোচর ছিল। শিলাদিত্যর ঐ একটা কথা, এককলি বেত্রাঘাত, তাকে তখনকার মতো অনড় করে দেয়। সে জবাব দিতে পারে না, পাল্টা আক্রমণ করতে ভুলে যায়।

শিলাদিত্যর কথার বিষ অনুলেখা শিলাদিত্যর জন্যেই কিছুটা নিজের রসনা ও কিছুটা মস্তিষ্কে সঞ্চয় করে রাখে, প্রয়োজনের সময় জিভ যেন ভাষাহীন দেউলিয়া হয়ে না পড়ে, মস্তিষ্ক স্মৃতিভ্রষ্ট না হয়।

ছয়

অন্নুলেখাকে দেখিয়েই শিলাদিত্য খানিকটা উত্তেজনা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, বস্তুত তার মনে কোনো বিষাদবিকার নেই। একটা অভিপ্রেত মৃত্যুর প্রতীক্ষা, তার জন্যে একটি প্রার্থনা। না, ঈশ্বর নয়, ভগবানের কাছে মা'র মরণকামনা করা বড় বেশি বাড়াবাড়ি। শিলাদিত্য চায় মা যথাশীঘ্র জাগতিক সম্পর্ক-বন্ধন ছিন্ন করে চলে যাক। জাগতিক অর্থে সেজকাকা জীবনভূষণ।

শিলাদিত্য এসে মা'র ঘরের সুমুখে দাঁড়াল, দরজার কপাটজোড়া ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েও দরজার গা থেকে হাত তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। অন্নুলেখাকেও সঙ্গে আনলে হত। এক-আধটা সাহস দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা সোজা, কিন্তু অফুরন্ত দুঃসাহস নিয়ে অন্নুলেখার সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়। শত্রুতা ও সহাবস্থান দুটি শব্দ পাশাপাশি বসানো তার সাধ্যাতীত। পারবার হলে তা সে অনেকদিন আগেই পারত। এতখানি অধঃপতনের পর এ চিন্তা চলে না। অন্নুলেখা এখানে একা আসতে পারবে না, তা নয়, কিন্তু তাকে মা'র মৃত্যুশয্যার পাশে নিয়ে আসা শিলাদিত্যের তরফেরই কর্তব্য হওয়া উচিত ছিল।

ফিরে যাবে বলে ভাবছিল শিলাদিত্য, অন্নুলেখাকে গিয়ে বলবে, 'তুমিও সঙ্গে এস লেখা, আমার একা মা'র ঘরে গিয়ে ঢুকতে সাহস হল না।' কিন্তু ফিরে যেতে গিয়েও সে যেতে পারল না, এই হয়তো শেষদিন, এরপর মা ও সেজকাকার মাঝে স্থির-অস্থির সন্দেহের রহস্যটা অনন্তকালের রহস্যে পর্যবসিত হবে। যদি শেষ মুহূর্তেও সত্যটুকু উন্মোচিত হয়—কি মনে করে শিলাদিত্য একবার বারান্দার চারিদিক দেখে নিয়ে দরজার গায়ে সেঁটে এসে কপাটের ওপর কান পাতল। অতি সন্তর্পণে, যেন প্রায় নিস্তব্ধতার সঙ্গে অঙ্গ মিলিয়েই

কপাটজোড়া একটু ফাঁক করল সে। দুটি কপাটের মাঝের ঐ সংকীর্ণ ব্যবধান দিয়ে দৃষ্টি চলে না, কিন্তু সতর্ক ও একাগ্র কানে মৃদুতম শব্দও ভেসে আসা সম্ভব।

ঘরের ভেতরটা স্তব্ধ, শিলাদিত্যর বুক বিস্ময়ে হতবাক্—মুমূর্ষু মা'র ঘরে আড়ি পেতেছে। অপর কেউ হলে এ ব্যাপারে সেই লোকটিকে যতখানি ঘৃণা দেখাত ঠিক ততখানি ঘৃণায় সে নিজেকে নিমজ্জিত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঘৃণ্যপ্রয়াসে বিরতি দেয় না।

শিলাদিত্যর কান এখন তীরতীক্ষ্ণ, নয়তো এইমাত্র যে শব্দটুকু সে শুনতে পেল সাধারণ অবস্থায় তা ঘরের বাতাসেই মিলিয়ে যেত। মা'র কণ্ঠস্বর। জীবনের অধিকাংশ চেতনাকে যে ভাবটি আচ্ছন্ন করে রাখে এবং কণ্ঠাগত প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বীকারোক্তির মতো মুখ দিয়ে আপনা আপনিই বেরিয়ে আসে, সেই ধরনের অচেতন ভাষাক্ষেপণ।

'কুমারী কন্যা!'

'বল ?' সেজকাকা জীবনভূষণের কণ্ঠস্বর নির্দ্বিধা ও সজাগ।

কানটাকে আরো একাগ্র ও প্রবল করে শিলাদিত্য দরজার কপাটের ফাঁকটুকুর ওপর চেপে ধরল, কিন্তু আর শুনতে পেল না। মনে হল দুর্গাও বোধহয় ঘরে আছে, কিন্তু তার এখন থাকবার দরকার কি ; পরক্ষণেই মনে হল, না, সেজকাকা তাকে কোনো অছিলায় ঘর থেকে সরিয়ে রেখেছেন, বোধ হয় ডাক্তারের বাড়ি—নয়তো তার উপস্থিতির আভাস কোনো না কোনো মতে বাইরে থেকে টের পাওয়া যেত। ঘরের মধ্যে এখন দুটি মানুষই উপস্থিত, একটি বিদায়ী প্রাণ, অপরটি বিচ্ছেদ-বিধুর হৃদয়—মা নীলিমা দেবী ও সেজকাকা জীবনভূষণ।

সময়ের গতি মন্থর, সুমুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পিছুটানই বেশি যেন। পুরনো দিনের কথা শিলাদিত্যর মনে পড়ে যাচ্ছে।

উপস্থিত ঘটনার চেয়ে সেই বুঝি অধিক উজ্জ্বল। হাল্কা রঙের ছবি-গুলো সুদীর্ঘকালের আলোবাতাস পেয়ে আরো ঘন রেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'এই যে কুমারী কন্যা, এস, তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি।'

মা নীলিমা দেবীকে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছিল শিলাদিত্য। নিজের ঘরটিতে তিনি মিষ্টির থালা নিয়ে বসে আছেন। তখনো এ পরিবারের বিরাটত্ব বিশেষ খণ্ডিত হয়নি। কৃষ্ণভূষণ দত্তর ছয় পুত্র—পাড়াপ্রতিবেশী শহরবাসী যাদের নামকরণ করেছিল ষড়্‌রিপু—বলতে গেলে এক বাড়িতেই বসবাস। শিলাদিত্যর দুই কাকা, মেজ ও ন' বাইরে চাকরি করেন, উঁচু সরকারী পদে অধিষ্ঠান, তাঁরাও সপরিবারে পূজোর ছুটিতে বাড়ি আসেন এবং সর্বজ্যেষ্ঠা বধূ হিসেবে নীলিমা দেবীর প্রভাব তখন অপ্রতিহত। প্রাচীন যৌথ পরিবারের রীতি অনুযায়ী সম্মান-সমীহ অনন্ত। উপরন্তু তাঁর আপন-করা স্বভাব। সদাহাস্য প্রকৃতি। যদিও সে সময় নীলিমাজীবনকথিকা নিঃসন্দেহ সত্যের মতো সর্বত্রই বিরাজমান।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নীলিমা দেবী মিষ্টির থালা নিয়ে নিজের ঘরটিতে বসে আছেন। প্রণাম নিচ্ছেন, মিষ্টান্নসহ আশীর্বাদ বিতরণ করছেন। মেজকাকা নীলিমা দেবীর চেয়ে বয়েসে দু-চার বছরের বড়, তিনিও পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

মা'র কণ্ঠস্বর শুনে শিলাদিত্য ঘরে না ঢুকে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল, বুঝল মা ও সেজকাকা ভিন্ন ভেতরে আর কেউ নেই এখন। সেজকাকার উত্তরটা সে কান ভরে গ্রহণ করল।

'শুধু আমারই পথ চেয়ে বসে আছ বৌদি, আর কারো নয়?'

'এখনো আমার দুটো পাওনা প্রণাম বাকি রয়েছে—তুমি আর আদিত্য; অন্য সকলে দায় চুকিয়ে গেছে। আদিত্য বোধ হয় বারোয়ারি পূজোর ভাসান দেখে ফেরেনি?'

সেজকাকা বললেন, 'না দেখিনি তো তাকে। কিন্তু বারোয়ারি ভাসান দেখতে গেছে, কি এই বছরে শেষবারের মতো সাজগোজ-করা

মেয়েগুলোকে আশ মিটিয়ে দেখে নিতে গেছে, তা বলতে পারি না। মেয়েছেলে দেখলে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্ঞান থাকে না!'

'না থাকারই কথা, তোমারই তো ভাইপো।'

'কেন, আমিও কি নারী-দর্শক?'

'আর মুখ নেড়ে কথা বোল না কুমারী কন্যা, তোমার জুড়ি ভূ-ভারতে নেই। তা তোমার ধর্ম তোমার কাছে, কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমার যা ধর্ম তাই এখন পালন কর!'

'তোমার সম্পর্কে আমার কি ধর্ম, তার একটু ইঙ্গিত দাও?'

'পা বাড়িয়ে বসে আছি, দেখতে পাচ্ছ না?'

'বাঃ, একেবারে নতুন কথা! তোমার সঙ্গে তো আমার প্রেমালিঙ্গনের সম্বন্ধ; প্রণাম আশিসের সম্পর্ক নাকি?'

'ওঃ, কুমারী কন্যা!'

নীলিমা দেবীর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কিছু শুনতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, হঠাৎ গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে দুটি কৌতূহলী চোখের জন্ম ও জিজ্ঞাসা সার্থক হয়। শিলাদিত্যর কিন্তু আবিষ্কারের বাসনা যত প্রবলই হোক অসাধ্য-অপনোদন লজ্জা তার পা-দুটোকে কিছুতেই ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল না, সেখান থেকে পেছিয়ে এল সে এবং সে বছরের মতো মা'র প্রাপ্য বিজয়া দশমীর প্রণামটা অনাদায় রেখেই।

এককালে কুষ্ঠী-ঠিকুজী নিয়ে শিলাদিত্য মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছিল। নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গণনা করাবার জন্যে বহু জ্যোতিষী ও অর্ধজ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়েছে সে। এ যেন তার নেশায় দাঁড়িয়েছিল। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উঁচু মানের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর বাড়ির আর সকলের কোষ্ঠীর দিকেও সে গুপ্ত হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মা, সেজকাকা আর ছোট ভাই অর্ণবের ছক দেখিয়ে নেওয়া। সেজকাকারটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। মা ও অর্ণবের কোষ্ঠী একজন বড় জ্যোতিষীকে দেখিয়েছিল সে। তাদের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক ব্যক্ত না করে ঠিকুজীদুটি জ্যোতিষী সপ্ততীর্থের

সম্মুখে একটি একটি করে এগিয়ে দিয়েছিল। সে ঘটনার প্রতিটি অংশ সন্থ আকাশ থেকে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার মতো স্মৃতিসমৃদ্ধ।

'দেখুন তো এই কুষ্ঠীটা।'

সপ্তুতীর্থ চোখে চশমা এঁটে কুঞ্চিত-বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ছকটার দিকে তাকালেন, মুহূর্ত কয়েক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ তো কোনো মহিলার ছক?'

নামধাম লেখা নেই, জাতকজাতিকা উল্লিখিত নেই কোথাও, তবু নীলিমা দেবীর কোষ্ঠীর ছক দেখেই সপ্তুতীর্থর মন্তব্য, কোনো মহিলার ছক—জ্যোতিষবিছায় আনাড়ি ব্যক্তির বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে এই-ই যথেষ্ট।

কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব ফুটিয়ে শিলাদিত্য বলল, 'হ্যাঁ, এর স্বভাব-চরিত্র কেমন?'

কোষ্ঠীর ছকে শনির অবস্থান দেখে সপ্তুতীর্থ প্রশ্নের আকারে মন্তব্য করেন, 'বয়েস তো বিশেষ কম নয় এঁর, চল্লিশ অন্তত?'

শিলাদিত্য শুধু একখণ্ড কাগজে ছকটাই লিখে এনেছে, সন-তারিখও নয়: সে গভীর বিস্ময়ে হতবাক, 'কুষ্ঠীতে লেখা না থাকলেও আপনি ছক দেখে বয়েস বলতে পারেন?'

টালি-ছাওয়া বারান্দায় পূর্বমুখী হয়ে সপ্তুতীর্থ বসেছেন, বেলা দশটার সূর্যরশ্মি তাঁর চশমার কাচের ওপর পড়ে আবার ঠিকরে যাচ্ছে, চোখছুটি স্পষ্ট দেখা যায় না; শিলাদিত্যর আশ্চর্য ও বিস্ময়স্তম্ভিত প্রশ্ন শুনে তিনি উত্তর দিলেন, 'পারি কি? পারি বোধ হয় অল্প বিস্তর।'

মা'র শোনা বয়েসটা শিলাদিত্য হিসেব করে, 'হ্যাঁ, চল্লিশই।'

'কে ইনি আপনার?'

প্রাসঙ্গিকভাবে এ প্রশ্ন উঠবেই তা শিলাদিত্য জানত, তাই জবাবও সে স্থির করে রেখেছিল; প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি বা দ্বিধা করল না, বলল, 'কেউই নয়; বাংলাদেশ থেকে এসেছে, আমাদের বাড়িতে কাজ করে। দেখাতে দিয়েছে, কতদিন বাঁচবে আর?'

সন্দিগ্ধকণ্ঠে সপ্ততীর্থ জিগ্যেস করেন, 'তবে স্বভাব-চরিত্রের খোঁজ কেন ?'

অম্লান বদনে শিলাদিত্য বলে, 'আমার সেজকাকা অবিবাহিত, তাঁর সঙ্গে এর একটা—'

'বুঝেছি,' সপ্ততীর্থ আর শিলাদিত্যকে এগুতে দিলেন না, বললেন, 'গণ্ডগোল হওয়াটা খুব অসম্ভব নয়, জাতিকার কুষ্ঠীতে পাপযোগ প্রবল। রবি মঙ্গল রাহু শনি একই ঘরে রয়েছেন, এঁদের ওপর কোনো শক্তিশালী শুভ গ্রহ, অর্থাৎ বৃহস্পতি বা শুক্রের দৃষ্টি নেই, এ ক্ষেত্রে জাতিকার চরিত্রহীনা হওয়াই সম্ভব। তবে একটা আশার কথা, লগ্নের দশমে বৃহস্পতি অনেক দোষ খণ্ডন করছেন, একেবারে বাজারের পতিতা করে দেবেন না।'

অর্ধতুষ্ট শিলাদিত্য আবার প্রশ্ন করে, 'ঠিক কি দেখলেন ?'

'প্রকৃত জন্মসময়টা পেলে বিচার করে দেখা যেত—বৃহস্পতির প্রেক্ষা ভাল থাকলে এইমাত্র যে ফলাদেশ করা হল তার বিপরীতই হতে পারে। অর্থাৎ জাতিকা অত্যন্ত গুণবতী সুশীলা ও সুরসিকা হওয়াও অসম্ভব নয়। সুরসিকা বললাম এইজন্যে যে, পঞ্চমস্থ শুক্রের অবস্থান মন্দ নয়।'

এ ছকটি সপ্ততীর্থের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে শিলাদিত্য এবার ছোটভাই অর্ণবের ঠিকুজী এগিয়ে দেয়, 'এর জন্মের কোনো দোষ আছে ?'

'এটা তো পুরুষের ঠিকুজী—বয়েস আঠারো-উনিশ ?'

'হুঁ।'

'প্রশ্নটা কি আপনার—জারজযোগ ?'

'হুঁ।'

ছকটি বহুক্ষণ ধরে দেখলেন সপ্ততীর্থ। চোখের চশমা ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি কোষ্ঠীর ছকের প্রতিটি ঘর লেহন করতে লাগল যেন। রুদ্ধশ্বাস শিলাদিত্য তাঁকে লক্ষ্য করে। মা'র কুষ্ঠীর ছক দেখে সপ্ততীর্থ প্রথমটা যা বলেছিলেন তা ঠিক। তারপর বৃহস্পতির

প্রেক্ষা না কি বললেন যেন, ওটা তাঁর বিচার করার প্রয়োজন নেই—শিলাদিত্য নিঃসন্দেহ, মা'র কুষ্ঠীতে বৃহস্পতির প্রেক্ষা ভাল নয় মোটেই। থাকলে সেজকাকা বিজয়ার প্রণাম করার বদলে প্রেমালিঙ্গন চাইতেন না।

'না, জারজযোগ নেই।' মনে মনে অনেকক্ষণ বিচার করার পর সপ্ততীর্থ মন্তব্য করেন।

শিলাদিত্য অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, 'আপনার এ বিচার মোটেই ঠিক হল না।'

অনাহত কণ্ঠস্বর, স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে সপ্ততীর্থ উত্তর দেন, 'আপনি জাতককে জানেন, চেনেন, আমি জানি না বা চিনি না। আমার বিচার যদি ভুল বলে আপনার মনে হয় সে অপরাধ আমার নয়। কোষ্ঠীর ছকই ভুল তাহলে। কারণ জন্মলগ্নে ঘড়ি দেখায় অনেক সময় প্রমাদ থাকে। তাছাড়া যে জাতক ঠিক লগ্ন পরিবর্তনের সময় জন্মায়, যথার্থ মুহূর্ত নির্ধারণ করে তার কোষ্ঠী-প্রণয়ন খুবই কঠিন। লগ্ন বদ্‌লে গেলে কোষ্ঠীর ছকে সব গ্রহের অবস্থানও বদ্‌লে যায়, সে ক্ষেত্রে প্রতিটি ফলাদেশই প্রমাদযুক্ত হবে। এ কোষ্ঠী হয়তো সেই শ্রেণীর!'

সপ্ততীর্থের মত শিলাদিত্যের সমর্থনযোগ্য বলে মনে হল। দত্তবাড়ির একুশটা ঘড়ি একরকম চলেনি কোনোকালে, এ ক্ষেত্রে কোন্‌টা দেখে অর্ণবের জন্মসময় লেখা হয়েছিল তা কে জানে! শিলাদিত্য বলল, 'তাই বোধ হয় হবে, জন্মসময়টা ঠিক লেখা হয়নি —কারণ ছেলেটিকে আমি জানি, এর পিতৃপরিচয় সন্দেহের।'

ভাসমান মনটাকে শিলাদিত্য আবার বর্তমান পরিস্থিতির ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড় করায়। অন্যমনস্ক চিত্ত একাগ্র করে নিভৃত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, কিন্তু তার কান বা কল্পনা মা'র ঘরের প্রকৃত চিত্র আহরণে সক্ষম হয় না। সবকিছু যেন এক সন্দেহশংকুল

জায়গায় জড়ের মতো স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আজই শেষ, এরপর অবকাশ থাকবে না। মা'র শেষ মুহূর্ত আসন্ন, অতঃপর তাঁর পাপ-পুণ্যের যত হিসেব-নিকেশ পরলোকের খাতাপত্র থেকেই আবিষ্কার করতে হবে—আর ইহলোকবাসী শিলাদিত্যকে চিরদিনের মতো বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে।

কিছুদিন আগে মা বলেছিলেন, 'আমার অসুখের কথা জানিয়ে অর্ণবকে একটা চিঠি দে—আসতে লিখিস।'

'লিখেছি, অর্ণবকে তো লিখেইছি, কাকাদেরও চিঠি দিয়েছি।' একটা মিথ্যে জবাব এবং উপযাচক হয়ে আরো খানিকটা মিথ্যে বলেছিল শিলাদিত্য।

তারপর দিনকয়েক কেটে গেছে, মা আর তাঁর সন্তানদের, অর্ণব এবং তাঁর একমাত্র কন্যা ছন্দাকে শেষ দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি। তিনি এখন সেজকাকাতেই বিভোর হয়ে আছেন। এই আচরণই তাঁর স্বাভাবিক, এ মহিলার সমগ্র সত্তা তো জীবনভূষণেই নিবেদিত।

দরজার দুটি পাল্লা আচম্বিতে হাট করে শিলাদিত্য ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। কতক্ষণ সে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তা ঘরে আসার পরই অনুভব করে। দুর্গা যখন তাকে ডাকতে গিয়েছিল তখন বিকেল। ঘরের মধ্যেটা এখন প্রায়ান্ধকার। প্রথম নজরে স্পষ্ট কিছু চোখে পড়ল না। অন্ধকার সয়ে আসতে মা'র খাটের দিকে দৃষ্টি একাগ্র করল সে। গাদাকরা বালিসের স্তূপে সুদীর্ঘ রোগে শীর্ণতাপ্রাপ্ত মা'র ছোট্ট শরীরটি প্রায় হারিয়ে গেছে। সেজকাকা জীবনভূষণের প্রৌঢ় ডানপিটে দেহটা কিন্তু স্পষ্ট প্রতীয়মান। তাঁর মুখটাই কেবল দেখা যাচ্ছে না, মা'র দুটি পায়ের পাতার মাঝে সেটি অবলুপ্ত। কাঁদছেন তিনি।

শিলাদিত্যর উপস্থিতি জীবনভূষণ টের পাননি। শিলাদিত্যও তাঁকে আর বিরক্ত করল না। সেদিনকার বিজয়া দশমীর মতো মা'র আজকের প্রাপ্য শেষ-প্রণামটা তাঁর পা পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়েই সে নিভৃত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সাত

বাড়ির ভেতর কোন্‌খানে কতদূরে কুকুরটা বাঁধা আছে, কিন্তু তার রুগ্ন আর্ত চিৎকারে ড্রইংরুমের আবহাওয়া ব্যতিব্যস্ত। ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু আর ডক্‌টর স্মৃতিময় সেনশর্মা, দুই জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তির অন্তরঙ্গ আলাপে কুকুরের ডাক ব্যাঘাতের চিড় ধরিয়ে দিচ্ছে যেন।

প্রথমটা সয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন ডক্‌টর সেনশর্মা, কিন্তু শেষাবধি স্থির থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, 'এই বোধ হয় তোমার বাড়িতে আমার শেষ আসা।'

বিনা প্রসঙ্গে এবং অপ্রতিবাদ বিষয়ের আলাপ-সালাপের মাঝে এ ধরনের কথা শুনে ত্রিদিব বাসু ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন, 'হঠাৎ ফেটে পড়লে কেন, হোয়াট রং য়্যু ফাউণ্ড উইথ মি ?'

'দোষ!' ডক্‌টর সেনশর্মা বিরক্ত ও উত্তেজিত, তাই প্রথম কাঠিটা সম্পূর্ণ জ্বলে যাওয়া সত্ত্বেও মুখের সিগারেট ধরাতে পারেননি। দ্বিতীয় একটা কাঠি জ্বালার পর তাঁর মনে হল, প্রথমবার যখন দেশলাই জ্বেলেছিলেন সিগারেটটা মুখে ছিল, কিন্তু সেটার প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল না, টানতে ভুলে গিয়েছিলেন। প্রথমবারের গাফিলতি এবার পুষিয়ে নিয়ে একগাল ধোঁয়া উগ্‌লে কাছাকাছি খানিকটা জায়গা অন্ধকার করে তুললেন তিনি। তমোময় পরিবেশে ত্রিদিব বাসুকে পৌঁছে দিলেন যেন।

ধোঁয়ার উপদ্রব থেকে মুখ আড়াল করবার চেষ্টা করতে করতে ত্রিদিব বাসু হাঁফধরা গলায় বললেন, 'তোমায় বার বার বলেছি আমার মুখের সামনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়বে না, কিন্তু তুমি—'

'আমিও তোমায় হাজারবার বলেছি ঐ কুকুরটাকে তাড়াও, ওটাকে আমি সহ্য করতে পারি না।'

'আই অলসো কাণ্ট স্ট্যাণ্ড টু য়োর স্মোকিং লাইক এ ষ্টীমার চিমনি।'

'তুমি কুকুর বিদায় কর—ছাট মংরেল।'

'লাকি নেড়ি-গেঁড়ি নয়, পিওর স্প্যানিস। লাকি আমার তোমার চেয়ে ঢের বেশি সুখাদ্য ভোজন করে।'

'স্পেনের রাজা বোধ হয় সম্রাট সাজাহাঁকে ওটি উপঢৌকন দিয়েছিলেন, না আর কেউ অপর কাউকে?'

ত্রিদিব বাসু হেসে ফেলেছিলেন, কিন্তু হাসি চেপে নিয়ে মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'স্পেনের রাজা আর সম্রাট সাজাহাঁর উপাখ্যান বোধ হয় লাকির দু-চারশ' পুরুষ আগেকার কথা। আমি যতদূর জানি, বছরদুই আগে আমার কোনো উচ্চাভিলাষী ছাত্র ওটি আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল—ইমপ্লায়েড কানডিশান, তাকে অন্তত সেকেণ্ড ক্লাশ দিতে হবে। হি গট্ ইট।'

হাসলেন ডক্‌টর সেনশর্মা, 'তবে তো লাকির আবির্ভাব একেবারে পাপের পথে, অতএব পলমাত্র দেরি না করে তাড়িয়ে দাও।'

আমেরিকান সাময়িকী জাতীয় কোনো একটি চক্‌মকে মলাটের পত্রিকা হাতে তুলে নিয়ে ত্রিদিব বাসু বললেন, 'তাহলে আদালতে একটা ডিভোর্স স্যুট দাখিল হবে।'

হাস্যকৌতুকময় কথার মাঝে ডক্‌টর সেনশর্মার কণ্ঠস্বর হঠাৎ বদলে গেল, অনিচ্ছাকৃত কর্কশ বিকৃতির সঙ্গে বলে ফেললেন, 'তাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি, তুমি তো ইমপোটেণ্ট।'

একটা সত্যিকার ক্ষতস্থানে ঘা পড়তে ত্রিদিব বাসুর মুখ হর্ষহীন বিমর্ষতায় আচ্ছন্ন হল, তিনি ধীর স্তিমিতস্বরে উত্তর দিলেন, 'সব সত্য সর্বদা হজম করা কঠিন স্মৃতিময়। যা হোক, আমি বোধ হয় এই কারণেই কুকুর বিদায় করতে পারি না যে, আমার মতো জাতহীন স্বামীর স্ত্রীর পশুপক্ষী সম্বন্ধে বিশেষ মোহ থাকতে পারে। আমার চেয়ে লাকির কদর এ বাড়িতে অনেক বেশি—বাড়ি অর্থাৎ রমা।'

ডক্‌টর সেনশর্মা আর সোজাসুজি ডক্‌টর ত্রিদিব বাসুর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। উপস্থিত দু'জনের মাঝখানে একটা আড়াল রচনা করবার জন্যেই বোধ হয় অধিকতর তীব্রবেগে ধূম উদ্‌গিরণ করতে লাগলেন, তারপর বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোর না ত্রিদিব, ঠাট্টা করতে গিয়ে কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।'

ত্রিদিব বাসুও ডক্‌টর সেনশর্মার দিকে তাকাতে পারছিলেন না, পত্রিকাটার চকচকে মলাটের ওপরই দৃষ্টি আটকে রেখে জবাব দিলেন, 'না, না—।'

হঠাৎ চকিত-ত্রস্ত চোখে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন ত্রিদিব বাসু, তাঁর অনুসন্ধানী চোখ অনুসরণ করে ডক্‌টর সেনশর্মা প্রশ্ন করলেন, 'ঘড়ির মতন একটা যান্ত্রিক জীবের দিকে তাকানোর বদভ্যাস তো তোমার বিশেষ নেই, আজ কোনোখান থেকে সময়ের তাগিদ পেলে না কি, না আমিই তোমায় বিরক্ত করছি?'

ডক্‌টর সেনশর্মার কথার ভাবে ত্রিদিব বাসুর মনে হল তাঁর লজ্জার রেশ এখনো খানিকটা রয়ে গেছে, সেটুকু মুছে নেবার জন্য তিনি গালভর্তি হাসি হেসে বললেন, 'জাস্ট দ্য রিভার্স, মানে তোমার নিজের সম্বন্ধে দীন উক্তিটা। আমি মনে মনে একটা মতলব ভাঁজছিলুম, লাকিকে ইনজেকশন দেওয়াতে ভেটিরিনারি হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে, তুমিও সঙ্গে চল।'

'পশু হাসপাতাল? রাদার আই শ্যাল বি য়্যোর গুড কমপ্যানি ফর যমালয়—চল, দু'জনে একসঙ্গে সেখানে যাই। না, তুমি তোমার গন্তব্যস্থানে যাত্রা কর, আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

ডক্‌টর সেনশর্মার মনের বিষাদ ত্রিদিব বাসু নিবিয়ে দিয়েছেন, সেই আনন্দে নিজের স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-তরল ভাষায় বললেন, 'হাসপাতাল যাবে না, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে গিন্নী আবার কিবা চাই কিবা না-চাইর ফর্দ নিয়ে তোমায় তাড়া করবে, হাসপাতাল যাওয়ার চেয়ে সে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ।

বরং আমার সঙ্গে পশু হাসপাতাল গেলে তোমার সময় আরো ভালোভাবে কাটবে।'

বেশ কঠিন আপত্তিই জানালেন ডক্‌টর সেনশর্মা, 'না, আমার এ্যানিম্যাল-এ্যালার্জি আছে, ওসব সহ্য হয় না।'

ঘাড় নাড়লেন ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু, অবিশ্বাসের আন্দোলনে তাঁর মাথা নড়তে লাগল, কথা বলবার সময়ও বিরতি এল না, 'আমার বিশ্বাস হয় না, তাহলে শিক্ষা ব্যবসায়ে না এসে অন্য কিছু করতে। স্টুডেনট্ কমিউনিটি ইজ নো বেটার ছ্যান এ্যানিম্যাল ফোক্!'

ডক্‌টর সেনশর্মা সিগারেটে পর পর ছুটি টান দিলেন, তারপর নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের মতো করে বললেন, 'এই ভরসায় আছি, এদেরই কেউ কেউ ভবিষ্যতে জাত-গোত্র বদ্‌লে তোমার আমার মতন আদর্শ মানব হবে।'

ত্রিদিব বাসু হেসে ওঠেন, তারপর বলেন, 'চল, কুকুরটাকে একবার হাসপাতাল ঘুরিয়ে আনি, নয়তো আমাকেই শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাসপাতালের এমারজিয়ানসি ওয়ার্ডে নাম লেখাতে হবে—রমা দেবীর মেজাজ তোমার অজানা নয়?'

'চল তাহলে, তোমার এতবড় অমঙ্গল আমি কামনা করি না।' ডক্‌টর সেনশর্মা ত্রিদিব বাসুকে সঙ্গদান করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু ত্রিদিব বাসু বসেই রইলেন, ড্রইংরুম থেকে অন্দরে যাবার যে দরজাটা আতঙ্কিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গেলেন তিনি, কিন্তু তাঁর মুখের কথা বাইরে ফুটে বেরুল না।

ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী রমা বসু, ডক্‌টর সেনশর্মার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে ত্রিদিব বাসুকে ভ্রুকুটিবিদ্ধ করলেন।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে ডক্‌টর সেনশর্মা জিগ্যেস করলেন, 'এই যে রমা, এতক্ষণ পরে—কেমন আছ?'

রমা বসু ঘট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে স্মৃতিময়কে তাকিয়ে দেখলেন

এবার, 'দেখতেই পাচ্ছ, আমার মুখ থেকে জানবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?'

ডক্‌টর সেনশর্মা কৌতুক ও বক্রতা মিশিয়ে বললেন, 'চোখে দেখেই যদি সবকিছু বুঝতে পারা যেত—'

'বলতে বলতে থেমে গেল কেন, বল?' তারপর ত্বরিতে প্রসঙ্গ ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বদলে রমা বসু ত্রিদিব বাসুকে বললেন, 'আকাশে মেঘ দেখে তোমায় আমি বলেছিলুম লাকিকে আমার শোবার ঘরে বেঁধে রেখে এস, ওর নিজের ঘর নোংরা হয়ে আছে, এখনো মেথর আসেনি। তুমি চাও অসুস্থ প্রাণীটা জলে ভিজে মরে যাক? মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সে খেয়াল তোমার আছে কি?'

ডক্‌টর সেনশর্মা ও ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু দু'জনেই একসঙ্গে পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। মুষলধার নয়, মনে হল এক-আধ ফোঁটা পড়ছে বোধ হয়—গা ভেজানো, মাটি ভেজানো নয় মোটেই।

সেই কথা জানিয়ে ত্রিদিব বাসু নিজের অপরাধহীনতা প্রমাণ করতে যাচ্ছিলেন, 'তেমন বৃষ্টি তো পড়ছে না, ওতে কেউ ভেজে নাকি?'

রমা বসু খিঁচিয়ে উঠলেন, 'টি. বি. (ত্রিদিব বাসু), আই ওয়াণ্ট মাই পেট বি কেপ্ট ইন মাই লিভিং রুম ইনস্‌টেড অফ য়্যোরসেলফ্, দ্যাটস্ এনড্ অফ দ্য ম্যাটার। আমি এই মাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছি, এখনো ঠাকুরঘরে যাইনি, ডু য়্যু লাইক টু সী মি স্পয়েলিং দ্য ফিউচার এ্যাজ দ্যাট অফ্ দ্য প্রেজেণ্ট?'

ত্রিদিব বাসু অনুজ্ঞা পালনের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রমা বসুর মনে পড়ে গেল, বললেন, 'আচ্ছা, একটা কথা, তোমায় কি আমি সাতসকালে জানিয়ে দিইনি আজ দশ মিনিট জল এসেই কল বন্ধ হয়ে গেছে, স্নানটানগুলো গোধূলি লগ্নের জন্যে মুলতুবি না রেখে ভোরবেলাই সেরে নিতে?'

ত্রিদিব বাসু কিন্তু কিন্তু করে জবাব দিলেন, 'আমি তো আজ স্নান করব না, একটু সর্দির মতন হয়েছে, গা ম্যাজ-ম্যাজ করছে!'

রমা বসুর প্রশ্নে সন্দেহাভাস, 'তখন তো বলনি ?'

তখন তো ডক্‌টর ত্রিদিব বাসুর আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়বে বলে মনে হয়নি, এখন তিনি জবাবদিহি করলেন, 'বলিনি, মানে তোমায় সর্ব বিষয়ে চিন্তায় ফেলে রাখতে—'

'তাই নাকি !' রমা বসু ব্যঙ্গ করেন, তারপর বলেন, 'এস, ওষুধ দিচ্ছি—একটা কোসাভিল আর একটা স্যারিডন একসঙ্গে খেয়ে নাও, তারপর লাকিকে ইনজেকশন দিইয়ে আনো।······এত করছি, কিন্তু ওর পেটের ওয়ারম্‌স যাচ্ছে না কেন ?'

রমা বসুর প্রশ্ন স্বগত, কিন্তু তাই থেকে ডক্‌টর সেনশর্মা কথা বলার মতো একটা অবসর খুঁজে পেলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিঃশব্দ দ্রষ্টার মতো অহি-নকুল ক্রীড়া দেখছিলেন, যদিও কিছুটা অস্বস্তি লাগছিল তাঁর। রমা বসুর আত্মগত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'কুকুরকে তার যোগ্য খাবার না খাইয়ে মানুষের মতন ভাল-মন্দ খাওয়ালে অসুখ তো লেগেই থাকবে।'

এক ধরনের জ্বালাময় হাসি হাসলেন রমা বসু, 'কিন্তু কে কুকুর আর কে যে মানুষ তা তো আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। হাত-পা আর ডিগ্রি-ডক্‌টরেট দিয়ে যদি পশু-মানুষের পার্থক্য বোঝা যেত তাহলে আমার জীবনে কোনো দুর্গতির সম্ভাবনা ছিল না, স্মৃতিময় !'

স্মৃতিময়, বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী এবং বর্তমানে প্রায় সহকর্মী স্মৃতিময়ের সুমুখে হলেও এবং তাঁর কাছে নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ক অণুমাত্র গোপন না থাকলেও রমার এই কথাটার পর ত্রিদিব বাসুর মুখ নিরুপায় গ্লানিতে কালো হয়ে উঠল। ডক্‌টর সেনশর্মাও যেন অপ্রস্তুতের একশেষ। কি বলে আবহাওয়া হাল্‌কা করবেন ভেবে না পেয়ে তিনি বললেন, 'চল্‌ ত্রিদিব, তোর সঙ্গে হাসপাতাল যাই, আমারও ওদিকে একটু কাজ আছে, ফেরার পথে সেরে আসা যাবে।'

ডক্‌টর সেনশর্মা ও ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু চিরকালই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, কিন্তু একটা ঘটনার পর তাঁরা নীরবেই খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়েছিলেন, তারপর তুই সম্বোধন উভয়পক্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তুমি দিয়ে দূরত্ব-নির্মাণ। ক্রমশ সে তিক্ততা ঘুচে গেছে, কিন্তু সম্বোধনে পরিবর্তন আসেনি। আজ ত্রিদিবের অপমানে স্মৃতিময় যেন নিজেই দগ্ধ হয়ে প্রাচীন সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁকে সম্বোধন করে কথা বললেন।

উপস্থিত পরিস্থিতির বাইরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চান ত্রিদিব বাসু, যদিও আবার তাঁকে এখানেই ফিরে আসতে হবে। আবার রমা তাঁকে ছলে-বলে-কৌশলে ছোট ও অপমানিত করার সুযোগ খুঁজবে এবং চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব বাইরের লোকের সুমুখেই এ ক্রিয়া সম্পন্ন হোক। তবু ত্রিদিব বাসু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি তৈরি হয়ে লাকিকে নিয়ে আসছি। তুমি সঙ্গে যাবে ভালই হল, আমার গাড়ি সার্ভিসিংএর জন্যে কাল গ্যারাজে পাঠিয়েছি, তোমার গাড়িতেই যাব।'

গম্ভীর স্বরে ডক্‌টর সেনশর্মা বললেন, 'যেতে চাও চল, কিন্তু আমার গাড়ির জাত যাবে তাহলে।'

'কেন?' ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও ত্রিদিব বাসু ফিরে দাঁড়ালেন।

রমা বসুর দিকে তাকালেন স্মৃতিময়, কিন্তু জবাব যেন ত্রিদিবেরই প্রশ্নের দিলেন তিনি, 'কারণ কুকুর চিরদিনই কুকুর, আর মানুষ চির-দিন মানুষই, রমার মতন খুব গভীর তথ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে আমি দিশেহারা হতে চাই না।'

ত্রিদিব বাসু উত্তর দিলেন না, রমাই দিলেন জবাব, 'এ ধরনের কথা তোমার পক্ষেই বলা সম্ভব স্মৃতিময়, কারণ জীবনের খুব গভীরে প্রবেশ করার দুর্ভাগ্য তোমার কোনোদিন হয়নি। সাদা চোখ দিয়ে তুমি সাদাটাই দেখতে পাও, ভেতরের কালোটা নজরে পড়ে না। তোমার যেখানকার যা পাওনাগণ্ডা তা তুমি ওপর থেকেই কুড়িয়ে নিতে পারছ, জলের সন্ধানে তোমায় মরুভূমির বালি খুঁড়তে খুঁড়তে তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরতে হয় না।'

ত্রিদিব বাসু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, পোশাক বদ্‌লে

লাকিকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ডক্‌টর সেনশর্মা ভর্ৎসনাময় দৃষ্টিতে রমা বসুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একজন অক্ষম ব্যক্তিকে ক্রমাগত আঘাত করে চলা মানুষের শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় নয় রমা!'

'আমায় অমানুষ বলছ তাহলে?'

'কতকটা।' ডক্‌টর সেনশর্মা অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন না।

রমা বসু দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা না করে ত্রিদিব বাসু কিছুক্ষণ আগে যেখানে বসেছিলেন তাঁর সেই পরিত্যক্ত সোফাটিতে বসে পড়লেন। স্তব্ধ তিনি। ডক্‌টর সেনশর্মা বুঝলেন রমা এখন এখান থেকে সহজে নড়বে না, নীরবতার আড়ালে শক্তি সঞ্চয় করছে। খানিকটা নিষ্ফল উত্তেজনা প্রকাশ করে কিছুটা মনের দহন নিভিয়ে তারপর শান্ত হবে। রমা ব্যর্থতাবোধের শিকার। তার প্রতিরক্ষার তূণে হতাশা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু এ যে তারই জীবনের বিশেষত্ব, তা নয়। এ যুগের প্রকৃত অনুভূতিই তো ব্যর্থতাবোধ। প্রতিটি নৈরাশ্য-চিহ্নিত দিনের বেড়া অতিক্রম করে সম্পূর্ণ জীবনের কালাতিপাত। আপাতদৃষ্টিতে যে সার্থক-জন্ম তারও মর্মে মর্মে ব্যর্থতার আলোড়ন। ব্যবহারিক জগতে যে গুটিকয় মানুষ সাফল্যের সৌভাগ্য নিয়ে আসে ডক্‌টর সেনশর্মা তাদের অন্যতম। কিন্তু বাইরের সিদ্ধিলাভ বুঝি অন্তরের দৈন্যময় অন্ধকার আরো বেশি প্রকটিত করে তোলে, আরো গভীর ব্যর্থতাবোধ। হয়তো বর্তমান যুগের অস্থির মনোবৃত্তিই এর জন্যে দায়ী, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য এ যুগের যুগচিহ্ন। সর্বাংশে ব্যর্থ নারী রমা বসু, সার্থক সিদ্ধপুরুষ ডক্‌টর স্মৃতিময় সেনশর্মা, নিষ্ফল জীবনের প্রতিভূ ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু সকলেই যেন একটি বিশেষ ভাবক্ষেত্রে একাত্মা।

ডক্‌টর সেনশর্মা জানলার বাইরে তাকালেন। দু'তলার ঘরের জানলা দিয়েও গাছটা দেখা যায়। এতখানি উচ্চতা ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে উঠে গেছে। অতবড় গাছে সচরাচর সুগন্ধী ফুল ফোটে না। ছোট ছোট কল্‌কে ফুলের মতো শ্বেতবর্ণের পুষ্পসম্ভার। ডক্‌টর

সেনশর্মার প্রায়ই মনে হয়েছে ত্রিদিব বা রমাকে জিগ্যেস করবেন কি গাছ ওটা, কিন্তু ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সে কৌতূহল বিস্মৃত হয়েছেন। আজ এ বাড়িতে ঢোকবার সময় তিনি দেখেন গাছের ডাল ভেঙে ফটকের প্রায় আধখানা জুড়ে পড়ে আছে, তাই গাড়িটা ভেতরে ঢোকাতে পারেননি, গেটের বাইরে রেখে এসেছেন। এখন একবার জানলার বাইরে তাকানোর জন্মেই হোক বা গাছটাকে কেন্দ্র করে খানিকটা অঘটন ওখানে ছড়িয়ে থাকার ফলেই হোক তাঁর পুরনো কৌতূহল চাড়া দিয়ে উঠল।

'ওটা কি গাছ রমা, ঐ গাছটা ?'

'কর্ক।' অন্যমনস্কের মতো রমা বসু বললেন।

'কর্ক—ছিপি ?'

'হ্যাঁ, ছিপি।' রমা বসু ঈষৎ ব্যঙ্গময় সুরে জবাব দিলেন, তারপর আরো সজাগ হয়ে উঠে বললেন, 'তবে যা দিয়ে শিশি-বোতলের ছিপি তৈরি করে সে কর্ক নয় ; বলতে পার, এ এক ভিন্ন স্পিসিস্।'

'ও, কিন্তু ফুলের গন্ধটা বড় মিষ্টি !'

রমা বসু স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন, বললেন, 'তোমার বন্ধু টি. বি. একদিন বলছিল, কত লোকের বাড়িতে তো জুঁইফুলের গাছ থাকে, কিন্তু এতবড় গাছ কোথাও দেখিনি। তোমরা দু'জনেই প্রায় সমান —তফাৎ এইটুকু তুমি অনেক বিষয়ে অবোধ, আর সে সর্ব ব্যাপারে চরম অপদার্থ।'

যে দিকটা বাদ দিয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা চলতে চাইছেন রমা বসু সেই দিকেই ঘুরছেন। ডক্‌টর সেনশর্মা তাড়াতাড়ি বলেন, 'তোমার ঐ ছিপিগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে গেটের অর্ধেকটা জুড়ে শুয়ে আছে দেখলুম।'

'তাই নাকি, আমি তো জানি না, কাল রাত্তিরে একটু ঝড় হয়েছিল, বোধ হয় তাতেই। কিন্তু টি. বি. সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা চক্কোর দিয়ে এসেছে, হৃত স্বাস্থ্য-সামর্থ্য পুনরুদ্ধারের খোঁজে রোজ যেমন যায় ; তার স্থূলদৃষ্টিতে কি ঐ

স্থূলতর বস্তুর পতন-সংহার ধরা পড়ল না? সত্যি স্মৃতিময়, আমি ভাবি যেদিন আমার মৃত্যু হবে সেদিন ঐ হতভাগ্য ক্রিচারটার কি যে হবে? আমার লাকিকে নিয়ে যাবার জন্য অনেক লোক আসবে, বাট হু উইল কাম টু টেক ছাট হিউম্যান-লাকি? মানুষের মতো চেহারা নিয়ে জন্মানোর অনেক বিপদ-আপদ, জানো? সত্যি, আমার বুকে মাঝে মাঝে এমন একটা যন্ত্রণা হয় যে, মনে হয় এই বুঝি শেষ, কালকের সূর্য আর আমায় দেখতে হবে না. —কিন্তু তারপর টি. বি-র কি হবে!'

ডক্টর স্মৃতিময় সেনশর্মা মনে মনে হাসেন, ভাবেন, তাহলে তো টি. বি. বেঁচে যায়! কিন্তু সে ভাবটাকে দু'চারটে মিথ্যের পাকে ঘুরিয়ে মুখটা করুণ করেন তিনি, 'রমা, এসব কথা আমার সামনে না বলাই ভাল। তুমি যা ভাবছ তোমার আয়ু অবশ্য ততটুকু নয়, ইউ হ্যাভ মাইলস টু গো অন দ্য ওয়ে অফ্ লাইফ— কিন্তু তবু আমার মরা-টরার কথা শুনতে ভাল লাগে না। এদিক দিয়ে আমার মনোভাব খানিকটা প্রাচীনতা ঘেঁষা।'

রমা বসু হাসলেন, 'একথা তোমার মুখে একেবারে আনকোরা নতুন। একদিন, যখন কারো মৃত্যুসংবাদ পেতে, তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতে, যাক্ বাঁচা গেল! কথাটা তোমার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছিল।'

ডক্টর সেনশর্মা স্বীকার করেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি। তখন ভাবতুম আমার সুমুখে অনেক মানুষের ভিড়, তাদের পতনের পরই আমি এগুতে পারব, তাদের ঠেলে ফেলে দিয়েই আমায় নিজের রাস্তা তৈরি করে নিতে হবে—নয়তো কোথায় থাকবে আমার অস্তিত্ব? আজ নিজে কোনোমতে করে খাচ্ছি, অনেকেরই পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছি, হয়তো তারা ভাবছে লোকটা সরছে না কেন, মরছে না কেন? এগিয়ে যাওয়া মানেই পশ্চাৎবর্তীকে ঠেকিয়ে রাখা, কিন্তু তা ক'দিনের জন্যেই বা?'

'অর্থাৎ আমরা এবার বুড়ো হচ্ছি, তাই না?'

ডক্‌টর সেনশর্মার দৃষ্টি বাঁচিয়ে রমা বসু বিজের উন্মুক্ত বাহু-দুটির দিকে তাকালেন। দেহ-ত্বকে এখনো প্রবীণতার কুঞ্চন দেখা দেয়নি, বরং তা স্বাস্থ্যের স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। যদিও চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন। স্মৃতিময়, ত্রিদিব ও তিনি সমবয়সী। বোধ হয় তিনিই বয়েসে অল্পাধিক বড়। ত্রিদিব, সে তো ধর্তব্যের মধ্যে নয়, অক্ষম পঙ্গু নপুংসকের বয়েস হিসেব না করাই সমীচীন। কিন্তু স্মৃতিময়, তাকে দেখেও বোঝা যায় না উত্তর-চল্লিশ। অথচ তার মনে বার্ধক্যের স্পর্শ, জীবন সম্বন্ধে ভীতির উদ্রেক। সম্ভবত জীবনের যা কিছু কাম্য তা সে পেয়েছে, জীবনস্পৃহার চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি লাভ করেছে, তাই যা পরবর্তী নিয়ম, অবসাদ, তারই রূপান্তরে তার মানসিক প্রবীণতা—যার নাম বার্ধক্য। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি, শ্রীমতী রমা বসু, আজও অতৃপ্ত, জীবনের প্রকৃত আস্বাদলাভে বঞ্চিত। জীবনের মূল তথ্যে প্রবেশ করতে পারেননি, তাই বয়েসটা যৌবনের উন্মেষসীমায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এ যেন শাপে বর। বঞ্চনার জ্বালার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার দুরাশা মিশে তাঁর মনের স্তরে স্তরে সম্ভাবনাময় নবীনতা ফুটিয়ে রেখেছে—যে কোনো দিন সফল হতে পারে, পরিতৃপ্তির সার্থকতায় ফুটে উঠতে পারে।

হঠাৎ যেন দুজনেরই একসঙ্গে খেয়াল হল, ত্রিদিব বাসু এখনো আসছেন না কেন। ডক্‌টর সেনশর্মাই আগে কথা বললেন, 'ব্যাপার কি বল তো রমা, ত্রিদিব গেল তো গেলই! তুমি একটু দেখবে, যদি ওর দেরি থাকে তো আমি যাই—ও নিজের সুবিধে মতন বেরুবে ?'

অন্যমনস্কতার স্তর থেকে রমা বসু কিছুক্ষণ আগেই নেমে এসেছিলেন, ব্যঙ্গমিশ্রিত ভাষায় তিনি জবাব দিলেন, 'এ বিষয়ে আমি যদি কোনো মন্তব্য করি তুমি বন্ধুর পক্ষ থেকে আমায় আক্রমণ করবে; কিন্তু বলতে পার, এই ধরনের মানুষকে নিয়ে কি সমাজে বাস করা চলে ? তুমি জানো না, ও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'যা অনুচিত আর অসম্ভব সেই সব কাজই তো তোমার বন্ধুটি করতে ভালবাসে। টি. বি. স্ট্যানডস্ ফর ট্রাইবাল ব্রুট।'

রমা বসু উঠে ভেতরে চলে গেলেন। লাকিকে ইনজেকশন দিইয়ে আনা খুবই দরকার। তিনদিন অন্তর একটা। আজ বাদ পড়লে কোর্স নষ্ট হয়ে আবার সুরু করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তাছাড়া আকাশ আরো ঘোর হয়ে এসেছে, হয়তো বৃষ্টির জোর বাড়বে। ত্রিদিবের ধড়ের ওপর মুণ্ডু বলে একটা বস্তু আছে যদিও, কিন্তু তার মধ্যে মস্তিষ্কের নামগন্ধ নেই। যেমন একজন সুস্থ পুরুষমানুষের মতো দেহ ধারণ করলেও সে পুরুষত্বহীন। ওটা রক্ত-মাংসের শরীর না হয়ে কাঠ-পাথরের মূর্তি হলেও কোনো তারতম্য থাকত না। লাকির গায়ে ফেল্টের কভারটা যে এঁটে দেওয়া দরকার সে কথা তার মনেই পড়বে না। মনে পড়বে না নয়, ত্রিদিবের ঈর্ষা। কুকুরটাকে রমা ভালবাসে এ তার সহ্য হয় না। তার ভাব-ধারণা লাকি বুঝি রমার শয্যাসঙ্গী, পতিবিকল্প! সন্দেহটা এমনই নিম্নমানের যে, ত্রিদিন তা মুখ ফুটে বলতে পারে না। আর অনুরূপ কারণে রমাও এ নিয়ে খোঁটা দিতে পারে না।

প্রায় বছরদশ হল রমা বসুর সাত্ত্বিক ভাবাবির্ভাব হয়েছে। তাঁর মন ক্রমশ ঠাকুর-দেবতা জপ-তপ পুজো-পাঠের দিকে চলেছে। এককালে এই নিয়ে কতজনকে কত ঠাট্টাই না করেছেন তিনি। ছুটিছাটাতে বাবার কর্মস্থল থেকে রমা বাড়ি গেলে তাঁর ভয়ে ঠাকুমা ঠাকুরঘরে ঢুকতে পারতেন না। 'সত্যি কথা বল তো ঠাক্ মা, আমার কেমন সন্দেহ হয়, সামনে ঐ কেষ্টবিষ্টুকে বসিয়ে তুমি তাদের আড়াল দিয়ে ঠাকুর্দার অরুণ-তরুণ মূর্তিটি ধ্যান কর কিনা! ফ্রয়েড বলেন বুড়োবুড়ির জপ-তপ ধ্যান-ধারণা সবই ফেলে আসা জীবন-যৌবনের স্মৃতিমন্থন।'

রমা বসু নিজে কিন্তু এ ধরনের চিন্তা কখনোই করেন না, ত্রিদিবকে ধ্যান করেন না তিনি, বা ঐ ডক্টর স্মৃতিময় সেনশর্মাকেও

না। স্বামী শ্রীশ্রীবিজয়ানন্দজী মহারাজ তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, কানে ত্যাগের বীজমন্ত্র, সেই মন্ত্রই নিঃশব্দ কায়মনোবাক্যে জপ করেন। সুমুখে কোনো দেবপ্রতিমূর্তি নেই, স্বামীজীর ফোটো, তাও নিত্যদিন চন্দনলেপনে বিলুপ্ত-প্রতিকৃতি।

ঐটুকুই, তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধশুচি থাকার বাসনা। এটা দোষের নয়, বরং সুরুচিসম্মত। ত্রিদিবের ধারণা এ রোগ—শুচিবায়ু। ধারণাটা সে স্পষ্টত প্রকাশ করে না, একটু ঘুরিয়ে বলে, শুচিবায়ুগ্রস্তা রোগিনীকে দেখে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না, হাত-পায়ে হাজা ঘা থাকবেই থাকবে। রমা বসুর হাতে বা পায়ে হাজা ঘা নেই অবশ্য, কিন্তু ত্রিদিব যেন বলতে চায় এই তার অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ। ত্রিদিব কোনো কথাই স্পষ্ট বলতে পারে না, কারণ তা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রমা বসুর নারীত্ব নিজের পৌরুষের জোরে অধিগত করতে পারেনি বলেই সে কোনোদিন তাঁর সুমুখে স্পষ্ট হতে পারে না।

ত্রিদিব ক্লোকরুমে নেই। রমা বসুর নজর পড়ল, বাথরুমের দরজা বন্ধ, 'তুমি কি বাথরুমে আছ?'

ভেতর থেকে ত্রিদিব বাসু সাড়া দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কি করছ ওখানে, এতক্ষণ ধরে?'

'স্নান—'

'তার মানে!' এবার রমা বসু সরবে ব্যস্ত হলেন, 'এই না বললে সর্দিজ্বর হয়েছে, চান করবে না?'

খুট্ করে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ শোনা গেল, পরক্ষণেই ত্রিদিব বাসু বেরিয়ে এসে কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'মুখ-হাত ধুতে গিয়ে মনে হল মাথাটাও ধুয়ে নিই। মাথা ধুতে গিয়ে গা ভিজে গেল, তবে স্নান করিনি, মানে তেল-সাবান কিছুই মাখিনি।'

'অর্থাৎ শুধু শুধু খানিকটা অপরিষ্কার অবস্থায় থেকে আজকের দিনটা কাটিয়ে দিলে?'

ত্রিদিব বাসু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'সিতু চলে

গেছে নাকি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল, দাড়ি কামালুম কিনা।'

'না, এখনো যায়নি, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, কারণ তোমার ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে তার ধারণা সুস্পষ্ট।'

'আমি ঠিক একমিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি, তুমি ততক্ষণ লাকিকে এনে দাও তো!'

ত্রিদিব বাসুর কথা শুনে রমা বসু স্তম্ভিত হয়ে যান, 'তোমার দেখছি ভীমরতি ধরেছে, সকাল থেকে উঠে অবদি তোমারই ফরমাস খাটছি, এখনো পুজোর ঘরে ঢুকিনি, কুকুর ছুঁয়ে কি দ্বিতীয় দফা চান করে, তার পর—'

ত্রিদিব বাসু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না, আমিই সব করছি, আমার খেয়াল ছিল না তোমার পুজোপাঠ এখনো হয়নি।'

'নিজের স্বার্থ ছাড়া তোমার কোন্ বিষয়ে খেয়াল থাকে? যা হোক, লাকির গায়ে কভারটা দয়া করে বেঁধে দিয়ে তারপর বাইরে নিয়ে যেও।'

উত্তর দিলেন না ত্রিদিব বাসু, পোশাক পরিবর্তনের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত বাড়িখানায় সর্বপ্রকার আধুনিকতা, কিন্তু রমার প্রতিটি আয়োজনে ত্রিদিব বাসু এক ধরনের নিষ্ঠুরতার খোঁজ পান —যা শুধু বিশ্লেষণের ভেতর দিয়েই অনুভব, নয়তো তার ওপরকার রূপটা অত্যন্ত নিরীহ এবং পরম রুচিতৃপ্তিদায়ক। এ বাড়ির সাজসজ্জা আচার-আচরণ ধরন-ধারণ যেন ব্যর্থ জীবনের প্রতিকল্প সুখান্বেষা। প্রকৃত প্রাপ্তির অভাবে কতকগুলো মিছে ঐশ্বর্য নিয়ে দিনযাপন। ত্রিদিব বাসুর ইচ্ছে হয় সব ছেড়েছুঁড়ে অনির্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দেন, উদ্দেশ্যহীন দিনক্ষয়ের ভেতর দিয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

আট

আজ যেন ডক্‌টর সেনশর্মা ফাঁদে পড়ে গেছেন। ইচ্ছে করলে অবশ্য অনুমতি না নিয়েই চলে যেতে পারেন, কিন্তু পারছেন না। ত্রিদিব আর রমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বৈঠকখানার শিষ্টাচারেই সীমাবদ্ধ নয়। তবু চুপচাপ বসে আছেন অন্য একটি কারণে, প্রায় দুপুর পর্যন্ত এদিক-ওদিক কাটিয়ে তবেই বাড়ি ফিরবেন। ছুটির দিন তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফিরলে অপর্ণা হয়তো ম্যাটিনি শো-এ সিনেমা দেখার আব্দার ধরে বসবে। আর তা এমনই একটা বই যা মগজ বাদ দিয়ে, বুদ্ধিযুক্তির পূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে, শুধু চোখজোড়া দিয়েই দেখতে হয়। মাথা-মুণ্ডহীন হিন্দি ছবিই দেখতে চায় অপর্ণা। ছবি দেখতে দেখতে সিনেমা হলের ভেতরই খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে, তার পর নিজেকে ছিঃকার দেয়, 'সত্যি, এমন সব ছবি করে, হাসি চেপে রাখা যায় না—অন্য লোকরা কি ভাবল বল তো!' 'এমন বিপদ তো তোমার ইতিপূর্বেও হয়েছে, তবু এরকম বই দেখতে আসা কেন?' 'একে তোমায় নিয়ে আমার সর্বদাই দুশ্চিন্তা, তারপর কি আবার বাঙলা ছবির প্যানপ্যানানি ভাল লাগে!' 'তাহলে তোমার হাসির জন্যে সর্বতোভাবে আমিই দায়ী?'

এরপর অপর্ণা হয়তো চুপিচুপি হাত বাড়িয়ে ডক্‌টর সেনশর্মার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিতে চাইবে। কিন্তু স্মৃতিময়ের তা ভাল লাগবে না। জীবনে একটিমাত্র হাতই তিনি পরিপূর্ণ আগ্রহ ও বাসনার সঙ্গে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, আজ অবশ্য সে হাতের প্রতি তাঁর সামান্যতম স্পৃহাকর্ষণ নেই—কিন্তু তার পর কোনো হাতই তাঁর ভাল লাগেনি। কিছুটা নারী সাহচর্য গ্রহণ করে নিজের মনঃপীড়ার ভার লাঘব করা ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না। সেদিক দিয়ে অপর্ণা তাঁকে অতৃপ্ত রাখেনি। কিন্তু একই স্বাদের আহার সত্যি কি স্বাস্থ্যকর—পুষ্টি তাতে যতই থাকুক না কেন। স্বাদ

বদলের সুযোগ না থাকলে স্বাস্থ্যসঞ্চয় ব্যাহত হবে। অপর্ণা তো নিত্যসঙ্গিনী, তবু ডক্‌টর সেনশর্মা মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়েন কেন, দেহমনের খাঁজে খাঁজে বার্ধক্যতুল্য জড়তা অনুভব করেন কেন —একটু নতুন স্বাদ পেলে সে অবসাদ বিতৃষ্ণা ঘুচেই বা যায় কেন? দেহের পুষ্টি অপর্ণা যেমন তাঁকে যুগিয়ে চলেছে, তেমনি অনেকের কাছ থেকেই তিনি তা আদায় করে নেন। নিতে হয় তাঁকে, নৈতিকতার দোহাই দিয়ে উপবাস করা চলে, কিন্তু তাতে অপমৃত্যু ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

'মে আই কাম ইন?'

ডক্‌টর সেনশর্মার অন্যমনস্ক মন যথাস্থানে ফিরে আসে, 'কাম ইন, ইয়েস কাম ইন!'

'ওঃ, স্যার আপনি, আমি ভাবলাম—'

ডক্‌টর সেনশর্মা ভ্রূ-কুঁচকে গাম্ভীর্যময় দৃষ্টিতে তাকালেন 'তোমায় কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে, পি. জি-তে পড় তুমি?'

'হ্যাঁ স্যার?'

'কোন্ ডিপার্টমেণ্ট?'

'পলিটিক্যাল সায়েন্স।'

'ও, ডক্‌টর বাসুর ছাত্র, বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ছেলেটি কিন্তু কিন্তু করে ডক্‌টর সেনশর্মার সামনের কৌচটিতে বসে পড়ল, 'স্যার, স্যার কি বাড়ি আছেন?'

'আছেন।'

ছেলেটি আবার দাঁড়িয়ে উঠল, 'আমি তাহলে তাঁর একতলার স্টাডিতে গিয়ে বসছি, নিচে কারো দেখা না পেয়ে ওপরে চলে এসেছিলাম।'

'পড়তে এসেছিলে বুঝি?' ডক্‌টর সেনশর্মার মুখে অতিশয় সূক্ষ্ম হাসির রেখা, কারো নজরে পড়ার মতো নয়, কিন্তু তাঁর মনের ভেতরটা প্রচণ্ড শব্দে হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কালে কালে অনেক কিছুই দেখতে হল! ত্রিদিব ডক্‌টরেট—স্নাতকোত্তর বিভাগে

রাজনীতি শাস্ত্রের রিডার পদে উন্নীত হয়েছে, আগামীকাল প্রফেসর, অবসরপ্রাপ্তির পর জাতীয় অধ্যাপক। দেশের শিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাসম্মানিত ব্যক্তিত্ব। ত্রিদিবের বাড়ি বয়ে ছাত্র পড়তে এসেছে। ছেলেটিকে দেখে তো মনে হয় পঠন-পাঠন জাতীয়—যার ভবিষ্যৎ কোনো গ্রাম্য বিদ্যালয়ের নিরীহদুর্বল শিক্ষক বা জীবনের প্রতি পদে ঘা খাওয়া উগ্র ঈর্ষায় জর্জরিত একটি আঠারো আনা ব্যর্থ মানবরূপে নির্ধারিত হয়ে আছে।

ছেলেটি ডক্টর সেনশর্মাকে নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিল, তিনি বললেন, 'তুমি পড়তে এসেছিলে নাকি, বইপত্তর কোথায় ?'

'সাইকেলের ক্যারিয়ারে বাঁধা আছে স্যার।'

ডক্টর সেনশর্মার পদোপযুক্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ খানিকটা নরম হয়ে গেল, 'তুমি নিচে গিয়ে কতক্ষণ একা বসে থাকবে, এখানেই বস, ডক্টর বাসু এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেমন ব্যবস্থা হয় হবে।'

ডক্টর সেনশর্মার আদেশ এবং অনুমতি পেয়ে ছেলেটি আবার জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। ডক্টর সেনশর্মা নীরব বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। চেহারা মন্দ নয়, তবে ভীরু। এ যুগের উত্তপ্ত আবহাওয়া থেকে কোনোমতে গা বাঁচিয়ে আছে যেন। পোশাক-আসাকে দৈন্যকলঙ্ক, তাও স্বাধীনতাপূর্ব যুগের। ধুতি আর হাতকাটা কামিজ। পায়ের কাবলিজুতোয় রঙ পালিশের বুভুক্ষা।

ছেলেটিকে কিন্তু ডক্টর সেনশর্মার ভাল লাগল, সম্ভবত উষ্ণ-উগ্রপ্রকৃতি ছাত্রসমাজের একটি স্নিগ্ধনম্র ব্যতিক্রম বলেই। তার সঙ্গে নিজেকে কতকটা একাত্মা বোধ হল তাঁর। ডক্টর সেনশর্মার নিজের ভেতরও খানিকটা দীন অসহায়তা এবং অনন্ত বুভুক্ষা লুকিয়ে আছে, বর্তমান জীবনের সর্বাঙ্গীণ এবং আশাতীত সার্থকতা ও প্রাপ্তি তাঁর এ দীনতা দূর করতে পারেনি।

ডক্টর - সেনশর্মা সিগারেট ধরালেন; তারপর প্রশ্ন করলেন 'তোমার নাম কি ?'

'কল্যাণব্রত পালিত স্যার।'

'এখানেই বাড়ি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বি. এ. কোন্ কলেজ থেকে পাশ করেছ?'

'বিশপস্ কলেজ।'

'অনার্স ছিল নাকি?'

পরবর্তী প্রশ্ন কি হতে পারে অনুমান করে কল্যাণব্রত ঈষৎ লজ্জামাখা সুরে বলল 'ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলাম স্যার।' কথাটা বলেই মাটির দিকে নজর নামিয়ে নিল।

বলতে চান না, বলতে চান না, অথচ বলে ফেললেন ডক্টর সেনশর্মা 'বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া আর এম. এ-তে পাওয়ার যোগ্যতায় অনেক তফাৎ, জানো বোধহয়?'

কল্যাণব্রত উত্তর দিল না, ডক্টর সেনশর্মার মুখের দিকে সরল জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রইল। তার চোখের অনুসন্ধিৎসু উজ্জ্বলতায় ডক্টর সেনশর্মার চোখজোড়া অস্থির হয়ে উঠল, তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেতে হলে লেখাপড়া ছাড়াও আরো কিছু দরকার তা বোধ হয় জানো? ডিগ্রি কোর্স পর্যন্ত পরীক্ষার রেজাল্টের মধ্যে যাদের প্রকৃত অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তাদের কেউ কেউ এম. এ-তে চমক লাগিয়ে যায়—লক্ষ্য করেছ কি? এর জন্যে কিছু বিশেষ গুণ আয়ত্ত করা দরকার যা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নয়।'

একজন প্রখ্যাত অধ্যাপকের মুখে এ ধরনের কথা শুনে কল্যাণব্রত হঠাৎ যেন অকূলে ভেসে যায়। বিশেষ গুণের ব্যর্থ অনুসন্ধানে নিজের মনের চতুর্দিক হাতড়ে শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে প্রশ্ন করে, 'কি বিশেষ গুণ স্যার? আমার পরীক্ষার ছ'-সাত মাস বাকি, কিন্তু পুরো কোর্সই দু'বার রিভাইজ করা হয়ে গেছে। আজকাল বহুকষ্টে বিদেশ থেকে বই-পত্রিকা আনিয়ে পড়ছি। এমন অনেক বই কিনেছি যা পড়া দরকার অথচ আমাদের য়ুনিভারসিটি লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়

না। পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে চীনের ভারত বিদ্বেষের কারণানুসন্ধান করে একটা থিসিস আমি লিখতে আরম্ভ করেছি— এম. এ. পাশ করার পর ওটাই আমার ডি. লিট-এর বিষয় হবে।'

ডক্‌টর সেনশর্মা লক্ষ্য করেন কল্যাণব্রত নিজের কৃতিত্বের গাওনা গাইছে বটে, কিন্তু কণ্ঠে অসহায় ভগ্নাশা, অগত্যা তিনি তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন, অর্থাৎ যখন বুঝলেন একমাত্র ব্যর্থতার শিকার হওয়া ছাড়া এ ছেলেটির বিশ্বসংসারে আর কোনো মূল্য নেই, তখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললেন, 'ওঃ, আমি ভাবছিলুম তুমি বুঝি যেন-তেনভাবে বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়েছিলে, তাই—না, তুমি এম. এ-তেও ভাল রেজাল্টই করবে।'

'কিন্তু আপনি যে বিশেষ গুণ-যোগ্যতার কথা বললেন স্যার?' ডক্‌টর সেনশর্মার এখনকার স্তোকবাক্যে ভরসা না পেয়ে কল্যাণব্রত অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে।

'ও কিছু নয়।'

ডক্‌টর সেনশর্মা কল্যাণব্রতর সুমুখে নিজেকে আর উন্মুক্ত করলেন না। কি লাভ তাতে! এ যুগ ভেসে যাবারই যুগ, বর্তমান কালের স্রোত আজ বড় বেশি চঞ্চল। স্থিতি ধৈর্য নিষ্ঠা সততা বিশ্বাস অনুরাগ, যা আয়ত্ত করা সময়সাপেক্ষ তার কদর নেই। প্রাচীন তালিকাভুক্ত আত্মধ্বংসী অস্ত্র সব। ওগুলির সাহায্যে জীবনের লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয় আর। কল্যাণব্রত পালিত তো একটিমাত্র দৃষ্টান্ত। এমন কত শত কল্যাণব্রত ক্রিমিকীটাণুর মতো প্রতি মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কল্যাণব্রত করজোড়ে নমস্কার করল, 'প্রণাম স্যার!'

পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা দেখলেন, ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু ঘরে ঢুকছেন। সঙ্গে সারমেয় লাকি। লাকির গায়ে দামী ফেল্‌টের গাত্রাবরণ, গলায় নিকেল-বোল্‌ট আটকানো সুদৃশ বকলস।

'কি ব্যাপার, হঠাৎ ?' একটু বিরক্ত অপ্রসন্ন স্বরে ডক্টর বাসু প্রশ্ন করলেন।

কাঁচুমাচু মুখ করে কল্যাণব্রত জবাব দিল, 'আজ আমায় আপনি ডেকেছিলের স্যার, মার্কসএর থিয়োরি এ যুগে কেন অচল বুঝিয়ে দেবেন বলেছিলেন।'

সামনে এগিয়ে আসতে আসতে ডক্টর বাসু বললেন, 'বলেছিলুম ? যাক্, তুমি এসে পড়ে ভালই করেছ, একবার পশু হাসপাতাল গিয়ে লাকিকে ইনজেকশন দিইয়ে আনো তো—এই নাও প্রেসক্রিপশন।'

যদিও এ ধরনের যুগোপযোগী আচরণে ডক্টর সেনশর্মা নিজেও অভ্যস্ত, বরং তিনি এর চেয়ে অনেক গর্হিত কাজ সগর্বে সম্পাদন করেন তবু যেন কেমন আশ্চর্য হয়েই আজ ডক্টর ত্রিদিব বাসুকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। আর মাঝেমাঝে আড়চোখে তাকালেন কল্যাণব্রতর দিকে—যে তার জীবনের চরম পরীক্ষার সাতমাস আগেই প্রস্তুতিপর্ব চুকিয়ে রেখেছে। এম. এ. পাশ করার পর থিসিস রচনা করবে, এখন থেকে তার উপাদান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে। তবু এক ব্যাপারে প্রীত হলেন তিনি। পরীক্ষা সাফল্যের জন্য বিশিষ্ট গুণটি কি বস্তু তা তিনি কল্যাণব্রতর কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেননি—সেই বিশিষ্ট গুণার্জনের শক্তি-পথেই অভিষেক হচ্ছে তার। কল্যাণব্রতর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠছে, মানুষ হবার অধিকার লাভ করছে সে।

ভয়ে ভয়ে কল্যাণব্রত জিগ্যেস করে, 'কুকুরটা কামড়াবে না তো স্যার ?'

সবার অলক্ষ্যে ডক্টর ত্রিদিব বাসুর চোখদুটি ধক্ করে জ্বলে ওঠে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকছেন রমা বসু, কতকটা যেন তাঁকে শুনিয়েই তিনি বলেন, 'কুকুরের গলার চেন যার হাতে থাকে তাকে কখনো কামড়ায় না—এটুকুও জানো না তুমি! ধর, ভয় নেই।'

কল্যাণব্রত ভীত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে লাকির গলার শেকলটা ধরল।

ডক্টর বাসু বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস।'

'হ্যাঁ স্যার।'

কল্যাণব্রত চলে যাওয়ার পর রমা বসু জিগ্যেস করলেন, 'কে ওটি, ছাত্র?'

'হ্যাঁ'।

'তাকে তুমি পাঠালে কুকুরকে ইনজেকশন দেওয়াতে, কি ভাবল বল তো!'

ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু হাসলেন, 'ছেলেটি খুব এ্যামবিশাস, ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট হতে চায়। কিন্তু যার হাতে তিনটি পেপারের কলকাঠি, তার কুকুরকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে না, অথচ ফার্স্ট-ক্লাশ ফার্স্ট হবে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশ তেমন সোনার পাথরবাটি নয় রমা।'

রমা বসু জবাব দিলেন না। কল্যাণব্রত চলে যাওয়ার পরও ঐ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটি পিঠের দিক থেকে অনেকটা ত্রিবিদের মতো দেখতে। আগেকার তরুণ ত্রিদিব। এ হয়তো ত্রিদিবের চেয়ে ঈষৎ খর্বাকৃতি, কৃশ ও মলিন, তবু অনেক মিল আছে। সম্ভবত এই বয়সের ছেলেটি আর সেই বয়েসের ত্রিদিব বলেই একটা মিল চোখে পড়ছে রমার, শ্রীমতী রমা বসুর।. অতীতের বয়েস দিয়ে বিচার করলে এ দৈহিক সঙ্গতি বোধ হয় স্মৃতিময়ের সঙ্গেও খুঁজে পাওয়া যায়। তাহলে কি বয়েসটাই শুধু এক-এক ধরনের রূপপরিচায়ক, একটি বিশেষ ভঙ্গির চরিত্রস্রষ্টা? তাহলে কি একদিন ঐ ছেলেটির মধ্যেও আজকের ত্রিদিব স্মৃতিময়ের শঠ জীবনপদ্ধতির প্রতিরূপ ফুটে উঠবে!

রমা বসু শিউরে উঠলেন, নির্বাক বিমর্ষতা নিয়ে এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি, ত্রিদিব ও স্মৃতিময়কে অস্পৃশ্যতাময় একান্তে রেখে গেলেন যেন।

নয়

একবার চুপি চুপি বেরিয়ে পড়া, তারপর সর্দার সুজন সিংকে পায় কে! ক'দিন ধরে সদর দরজার মুখটাতেই সুজন সিংএর সুযোগ্য এবং কাবিল পুত্র সর্দার কুলদীপ সিং মূর্তিমান পাহারার মতো থাবা গেড়ে বসে ছিল। একটু জ্বরভাব হয়েছিল কুলদীপের, কি এক দুর্বল মুহূর্তে সুজন সিং তাকে বলে ফেলেছিল, 'এটা বুখার বিমারীর সিজিন, দু'দিন আরাম নিয়ে ভাল করে সেরে উঠে তারপর আবার কাম-ধাম।'

এমন ছেঁদো কথা সর্দার সুজন সিংএর মুখ থেকে বেরুনো একেবারেই উচিত ছিল না। সম্ভবত পাঞ্জাবের তুলনায় বিহারের মতো কাফি নরম পানির দেশে এসে পড়ার ফলেই তার মনে এ ধরনের দুর্বলতা প্রশ্রয় পেয়েছে। কিংবা হয়তো বয়েসটা আচম্‌কা বাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে বলেই। কিছুদিন যাবৎ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে ওঠবার সময় কোমরটা একটু টন্‌টন্‌ করে, হাত-পায়ের গ্রন্থিগুলো খিল্‌ধরা মনে হয়। জোর করে সে অবসাদ ছিঁড়ে বিছানা থেকে ওঠে সে, তারপর সর্বক্রোধ গিয়ে পড়ে পুত্র পুত্রবধূ আর কন্যা প্রীতমের ওপর। তারাই নিয়ত বলে, 'পাপ্পূজী, তোমার বয়েস হয়েছে, এবার ছুটি নাও, আরাম কর।'

কুলদীপ সিং নিয়মিত পাঁচ টাকা জেবখরচ দেয়। দৈনিক। যখন দেখছে বাপটা কাজকর্মের চাপে পড়ে ক্ষয়ে মরবার নয় তখন তাকে মরচেপড়া নিষ্ক্রিয়তার পেষণে মেরে ফেলার আয়োজন। তবু সুজন সিং মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছিল। হুইস্কি স্যাম্পেন শেরীর সঙ্গে খুনসুটি করে, তাদের লেখাপড়া আহার-বিহারের তলাশ তদারক করে নিষ্কর্মার মতো দিনাতিপাত। কিন্তু তার মনের মধ্যে এক নৈতিক সুযোগান্বেষণ চলছিল।

আজ খুব ভোরে কুলদীপ সিং বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, পাপ্পুর দৈনিক বরাদ্দের টাকা দিয়ে যায়নি। তার এই বিস্মৃতিকে সুজন সিং অবহেলা বলে ধরে নিল। সে নয় তখনো নিজের ঘর থেকে বেরোয়নি, কোমর আর পিঠের ব্যথার দরুন আজকাল একটু বেলা করেই বিছানা ছাড়ে, তাই বলে তো মরা লকড়ি বনে যায়নি, যে কুলদীপ সিং তাকে ডেকে তুলে পাঁচ টাকাটা হাতে গুঁজে দিয়ে যেতে পারত না! রাগে ফোঁস-ফোঁস করে সুজন সিং। যে আওলাদ সামর্থ্য থাকতেও পিতার হাতখরচ হজম করে নেবার চেষ্টা করে তার ওপর আস্থা রাখার প্রবৃত্তি কার বজায় থাকে? সুজন সিংএর মতো অতিশয় সজ্জন পিতার পক্ষেও তা সম্ভব নয়। সর্দার সুজন সিংএর এলেম না হয় গুরমুখী ভাষার 'হিন্দ্' আকবার পর্যন্ত। আর টুটা-ফুটা হিন্দি। কিন্তু কল্দীপ সিং, তুই বা এমন কি 'এল. এ. বে. এ' পাস— তোরই বা কি এলেম? সর্দার সুজন সিং যত লক্ষ টাকা পয়দা করেছে আর খেয়াল-খুশির নালা-নর্দমায় বইয়ে দিয়েছে, সারা দেহের ঘাম রক্তের মতন বইয়ে তার এক পাই-ভর তুই কামাতে পেরেছিস? চল্ বে মুণ্ডে, তুই বেটা বাপকে অবহেলা করিস, কিন্তু এ বোধ তোর নেই, বাপের কতবড় অযোগ্য আওলাদ তুই—সোনার চাঁদের গর্ভে কালি মিট্টি! সর্দারীণ রাজ কাওর তোর মতন সন্তান পায়দা করার শোক বোধ হয় তার ইন্তেকালের কাল পর্যন্ত ভোলেনি।

রাগে গর্গর্ করতে করতে সর্দার সুজন সিং ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুমুখেই পড়ে গেল হুইস্কি, তার কান ধরে গালে চড় কষিয়ে দিয়ে বলল. 'উল্লুকা পাঠা, এখনো পর্যন্ত একসের দুধ হজম করার কুবত নেই, আর আমার সামনে ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—হট্ যা গধ্ধে কা বাচ্চা!'

হুইস্কি হক্চকিয়ে যায়। ওদিকে পিতামহের শয্যাত্যাগের সময় অনুমান করে শেরী আলবলার কল্কে সেজে এদিকে নিয়ে আসছিল, পিতামহের চেহারা থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকোতে দেখে কল্কেটা উঠনে নামিয়ে রেখেই সরে পড়ে সে।

প্রীতম তখন রান্নাঘরে, প্রাত্যুষিক জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত। সদ্য-দোয়া দুধ গরম করা হয়ে গিয়েছিল তার। একটা কড়াতে আধসের পরিমাণ সুজি নিয়ে ভাজতে বসেছে, পিতার উচ্চগ্রামের কথা কানে যেতে কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল, 'কি হয়েছে পাপ্পু?'

'কল্‌দীপ, মুণ্ডে কল্‌দীপ আমায় বেইজ্জৎ করে গেছে।'

'কখন?'

'বাড়ি থেকে বেরুবার সময়।'

'তখন তো তুমি কামরায় ছিলে, দরজা বন্ধ!'

'হাঁ, তখনই। সামনে দাঁড়িয়ে আমায় অপমান করবে অতটা ছাতির মাপ তার কোনোদিনই হবে না।' এতটা বলার পর সর্দার সুজন সিং হঠাৎ অভিমানে ফেটে পড়ে যেন, 'আর আমি এ বাড়িতে থাকব না প্রীতম, তোরা আমায় চাস না। আমার কতই বা উমর, ঐ যে তালগাছটা, ওটা আমার দু'চারগুণ বড়, অথচ কেমন সটান দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তোরা আমার হাত-পা বেঁধে রেখে হাড্ডিতে বাত ধরিয়ে দিয়েছিস—খুন করেছিস আমাকে।'

প্রীতম কাওর আর কথা বাড়ায় না, অনেক কাজ তার পড়ে আছে; সংসারের নৈমিত্তিকতা শেষ করে নিজের ধান্দায় বেরুতে হবে। পিতার ক্রোধ ও অভিমানের কারণ যে বিশ্রামবিমুখতা, এটুকু বুঝতে পেরে সে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাচ্চাগুলো সামনে থেকে পালিয়ে গেছে, আলবলায় কল্‌কেটা চড়িয়ে নিয়ে সুজন সিং আবার ঘরে চলে এল। নীরবে ধূমপানের নিয়মরক্ষা করল সেদিন। অন্যদিন বাড়ির উঠনে বসে এই প্রাত্যুষিক কর্মটা সম্পন্ন করে সে। সেই অবসরে পৌত্র-পৌত্রীর জলযোগের তদারক। কিন্তু আজ তা করল না। তারা যেমন সুজন সিংকে অকর্মা করে তোলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে, তেমনি সে-ও আজ থেকে তাদের এড়িয়ে চলবে। এ নিমকহারাম দুনিয়ার মাঝে কে কার, তোমার মুণ্ডু আমার ধড়ে বসবে না কোনোদিনই। তোমার ভালমন্দ

স্বাস্থ্য-সামর্থ্য নিয়ে তুমি নিজের, তেমনি আমিও আমার নিজের। আরে, সর্দার সুজন সিং এখনো গেঁহু পিষে এ পরিবারের সবক'টা মানুষকে খাওয়াতে পারে। এখনো এই হাতের কব্জি বাঘের মুখে গুঁজে দিলে তার চোয়াল ভেঙে যাবে। সুজন সিং তোদের মতন বিল্লী-চুঁহার পরোয়া করে না। শুকনো গায়ে কাঁথা জড়িয়ে এক গা ময়লা মেখে সে মরে পড়ে থাকবে না, যেদিন যাবার সেদিন আকাশের তারা খসে পড়ার মতন আচানক চলে যাবে।

'ঠাকুরবাবা!'

রাগের মাথায় কখন যেন সর্দার সুজন সিং বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বড় মাঠ পার হয়ে দু'তিনটি সড়ক অতিক্রম করে গলি মাড়িয়ে ইসলামপুর রিফ্যুজি ক্যাম্পে চলে এসেছে।

'তোমার নিজের মুল্‌কে তোমার কি-কি ছিল, ঠাকুরবাবা?' সুজন সিং হয়তো কৌতুক করে, অনুকম্পা ভরে বিগতকালের বিষয়-বৈভবের খবর নেয়, তারপর নিজের মনেই বলে, 'ঠাকুরবাবা, আমার প্রথম জোয়ানী বাংলা মুল্‌কে কেটেছে, খাস শহর কলকাত্তায়। কি জানি বোধ হয় সেখানকার মাটিতেই প্রথম পয়সার স্বাদ-গন্ধ পেয়েছিলুম বলেই বাঙালী জাতটাকে আমি ভালবাসি; কিন্তু আমার বড় দুঃখ হয় ঠাকুরবাবা, বড় আফসোস হয়, তোমাদের বাঙালীরা শুধু ছিল-তেই আছ, আছে-তে নেই।'

কৃপাচরণ দেবরায়, পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী তথাকথিত জ্যোতিষী কৃপাচরণ দেবরায় জবাব দেয়, 'দেশে আমার একটা কুঁড়ে ছাড়া আর কিছুই ছিল না সর্দারজী। আর ছিল ডাকে আনানো একটা হোমিওপ্যাথির সার্টিফিকেট—সেটার সুবাদে দু'-মুঠো জুটে যেত, এই পর্যন্ত। তবে বউ ছিল একটা, মৃতবৎসা—মরা সন্তানের জন্ম দিতে দিতে সে নিজেই একদিন মরে গেল, এই রক্ষা। নয়তো আজ—'

সর্দার সুজন সিং বলে, 'দেখছি এদের মধ্যে একমাত্র তুমিই সত্যিকার গরীব ছিলে, আর যাদের সঙ্গে কথা বলি, তাদের

সকলেরই ছোট-বড় তালুক-মুলুক, কল-কারখানা উঁচু চাকরি, নিদেন ছু'-চারশ' বিঘে ধানজমি, দশ-বিশ একর সুপুরি নারকেলের বাগান, বড় দিঘির মতন মাছ-ভরা পুকুর দু'-চারটে—এসব কি সত্যি ঠাকুর-বাবা? তা যদি হয়, তাহলে এই নওজোয়ানগুলো সরকারী ভিক্ষের আশায় বসে আছে কি করে!'

'জানি না, সর্দারজী।' এর বেশি কৃপাচরণ আর কিছু বলে না। প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে ইতি দিতে চায় সে।

তখন সর্দার সুজন সিং নিজেই বলে, 'এতবড় মগজওয়ালা জাতটা ধ্বংস হয়ে যাবে ঠাকুরবাবা, এই আমার আফসোস। এই তো ক'বছর হল আমরা সকলেই ভিখিরীর মতন এখানে এসে জুটেছিলুম, কিন্তু শহরের মাথায় মিনারের মতন আমরাই আজ বসে আছি, অথচ তোমরা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছ! কেন এমন হচ্ছে?'

'আমি সত্যিই এর কোনো কারণ জানি না, সর্দারজী! যে জানে না, যার কিছু করার উপায়ও নেই, তার কাছে এসব কথা বলে তোমার লাভ কি?' কথা শেষ করে কৃপাচরণ তার পঙ্গু দেহটাকে পাশ ফেরাবার বৃথা চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে।

কিন্তু সর্দার সুজন সিং তাকে অব্যাহতি দেয় না, নিজের মনের খেদটুকু ঠাকুরবাবা ছাড়া আর কার কাছে উজাড় করবে সে, নিজের সমাজের লোকের কাছে বলা যায় না, এ সংবাদ সেখানে খুশির কারণ; তাই সে কৃপাচরণ দেবরায়কেই বলে, 'ঠাকুরবাবা, তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। তোমাদের বাঙালীদের রয়েছে একটা পা ফেলে আসা দিনের ওপর আর অন্য পাটা একেবারে খোয়াবী দুনিয়ায়, মাঝখান দিয়ে সময় বয়ে যাচ্ছে সুযোগ চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখতে চাও না। তোমরা সকলে পৃথিবী-সেরা মানুষ হতে চাও, কিন্তু সত্যি মানুষ হতে কেউই রাজি নও!'

সর্দার সুজন সিং মাথার পাগড়িটা দু'হাতে ধরে নাড়াচাড়া করে, প্রীতমের দেওয়া ঘড়িতে সময় দেখে, মুখভর্তি দাড়িতে আঙুল চালায়, তারপর আবার বলে, 'ঠাকুরবাবা, কাঁদতে যারা ভালবাসে ভগবান

তাদেরই বেছে বেছে কাঁদায়। তোমরাও কাঁদতে ভালবাস। ছুনিয়ার নক্সা বদলে যাচ্ছে, কাল আমার যে পাঞ্জাব মুলুক ছিল তা আজ আর আমার নয়, কিন্তু আমি যদি এই শহরে পাঞ্জাবের পত্তন করতে না পারি তাহলে তো প্রাণ থাকতেও আমি মুর্দার সামিল! যে দয়ার পাত্র সে-ই তো মুর্দা! মুর্দাকে যেখানে খুশি ফেলে দাও, জ্বালিয়ে দাও, গোর দাও, সে উজুর করবে না। ঠাকুরবাবা, তোমার জাত আজ মুখে যত বুলিই কাটুক, আসলে সে মুর্দা, তার কোনো কুবত নেই, কদর নেই। আজ বাঙালী পৃথিবীর সবচেয়ে সংকীর্ণ জাত।'

একটা জাতকে এতখানি প্রাণ খুলে গালাগাল দেওয়ার পর সর্দার সুজন সিংএর মনে হয় তার বলার মধ্যে ভুল আছে, দেখার চোখ অন্ধ হয়ে রয়েছে। সর্দার সুজন সিং বাংলা মুলুকের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল যোগসম্পর্ক রহিত, কিন্তু আজও তার মনে হয় কোথায় যেন এক নাড়ির টান থেকে গেছে, তাই প্রাণভরে গালাগাল দিয়েও তার স্বস্তি হয় না।

'ঠাকুরবাবা, আমার হাতটা একবার দেখ তো?' সর্দার সুজন সিং আজ মাথাভর্তি রাগ নিয়ে কৃপাচরণের ঘরে প্রবেশ করেছে। জীবন্ত শবদেহের মতো কৃপাচরণ দেবরায় তার মলিন শয্যাটিতে শয়ান, মুখের চিত্রে মুমূর্ষুতা মাখানো, চোখছুটি অবশ্য খুবই উজ্জ্বল। শুধু ঐ ছুটিই যেন তার দৈহিক সজীবতার সাক্ষ্য।

সর্দারজীকে দেখে ও তার কথা শুনে কৃপাচরণ হাসবার চেষ্টা করে, 'ব্যাপার কি সর্দারজী, অনেকদিন পরে—তা'ও আবার ভোর না হতেই? তুমি তো বিকেল ছাড়া হাজির হও না?'

কৃপাচরণের শয্যার পাশে একটা শতছিদ্রযুক্ত বরিশালী শীতলপাটি, সর্দার সুজন সিং তার ওপর বসে পড়ে, 'বললুম না, হাত দেখাতে এসেছি।'

'তা শুনেছি, কিন্তু তোমার মুখে এ তো নতুন কথা।'

'কেন, আমি কি আগে কখনো তোমার কাছে হাত দেখাইনি?'

'সে তো একটা ছলছুতো করে আমায় সাহায্য করে যাওয়া। তবে আমার ব্যাপারটা তুমি একটু ভিন্ন চোখে দেখ সর্দারজী, ভগবান আমার শেষ জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি লিখেছেন—ওটা বাঙালী জাতের দোষের মধ্যে গণনা কোর না।'

সর্দার সুজন সিংএর মস্তিষ্ক আজ সবিশেষ উত্তপ্ত, তার ওপর ঠাকুরবাবা যেন একটু বাঁকাভাবেই কথা বলল। সর্দার সুজন সিং খানিকটা অপ্রস্তুত ও বিরক্ত হয়, 'আজ তুমি আমার সঙ্গে বিলকুল নয়া আদমীর মতন কথা বললে ঠাকুরবাবা, ব্যাপার কি?'

'বোধ হয় আর বেশিদিন বাঁচব না সেইজন্যে।'

'তুমি মরলে কিন্তু সর্দার সুজন সিংএর পাথুরে চোখ দিয়ে জল ঝরবে।'

কৃপাচরণ হেসে ফেলে, 'তাহলে আমি আজই মরি সর্দারজী। পাঞ্জাবীর চোখের জল, সে কেমন জিনিস, কখনো দেখিনি!'

সর্দার সুজন সিং কৃপাচরণের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, 'আজ ফালতু কথা বাদ দাও, ঠাকুরবাবা, আমার হাত দেখে বল, লটারির টিকিট উঠবে কি না।'

কৃপাচরণ সুজন সিংএর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল বটে, কিন্তু হস্তরেখা না দেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বিস্মিত অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, 'আজ তোমার কি হয়েছে বল তো সর্দারজী?'

'বললুম তো হাত দেখাতে এসেছি, তাছাড়া কিছু নয়।'

'আসল কথাটা বল।'

এবার সর্দার সুজন সিং বলে, 'আসল কথা ঠাকুরবাবা, আমার ছেলে মেয়ে মুণ্ডে কলদীপ আর বেটি প্রীতম আমায় পচিয়ে মারতে চায়। আমি কিন্তু আর তাদের পয়সায় খেতে চাই না, এবার নিজের ধান্দা শুরু করব, রোজগার করব।'

'এই যে লটারির টিকিট পাবে কি না জানতে চাইলে সেই রোজগার ?'

'ওটা ফালতু বাত্, তবে আমি এবার লটারির ব্যবসাই আরম্ভ করব। টিকিট বিক্রি করব ইস্টিশন বাজার আর কাছারিতে। সব মানুষের মধ্যে আজকাল তগদীর খোঁজার হিড়িক পড়ে গেছে, এই মওকায় আমি দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চাই।'

'তার জন্যে হাত দেখাবার কি আছে ?'

লজ্জিত সর্দার সুজন সিং তাড়াতাড়ি নিজের হাতটা কৃপাচরণের হাত থেকে মুক্ত করে নেয়, 'তাই তো, লটারির টিকিট বিক্রি করার কথা ভাবতে ভাবতে কখন আবার লটারির টাকা পাবাব কথাই ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছিলুম!' তারপর হা-হা করে হেসে উঠে বলে, 'বিহারের নরম পানিতে এসে পড়ে দেখছি আমি যেন সবদিক দিয়েই নাজুক হয়ে যাচ্ছি। নিজের কুবৎ ভুলে তগদীর আঁকড়ে বসে থাকতে চলেছি।···একটা তাজ্জব কথা জানো ঠাকুরবাবা, এই অবিশ্বাসী যুগ-জমানায় কিন্তু মানুষের ভাগ্য-বিশ্বাসটা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে!'

যেমন হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল তেমনি হঠাৎই সুজন সিং উঠে দাঁড়াল, বদভ্যাসের দরুন হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখল একবার। তারপর কৃপাচরণের দিকে তাকিয়ে আবার হাতের ঘড়িটার ওপরই দৃষ্টি রাখল। সর্দার সুজন সিংএর মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু তা দৃশ্যমান নয়, তার গোঁফদাড়ির ঘন জঙ্গলই এ হাসির স্পর্শ পাচ্ছে।

কৃপাচরণ দেবরায় তার অনড় দেহটাকে যথাসম্ভব বাঁকিয়ে চুরিয়ে সাধ্যমতো ঘাড় ঘুরিয়ে সুজন সিংএর দিকে তাকাবার চেষ্টা করে 'কি সর্দারজী, হঠাৎ এলে আবার হঠাৎই চলে যাচ্ছ যে ?'

'কি করি ঠাকুরবাবা, তুমি তো আমার হাত দেখতে চাইলে না, তাই আমাকেই নিজের তগদীর যাচাই করে নিতে হবে। আজ যাচ্ছি, আবার একদিন আসব।'

'কোথায় চললে, বাড়ি ফিরছ নাকি ?'

'নঁহা', সর্দার সুজন সিং জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে, 'এখন বাড়ি গিয়ে ছেলের হাততলায় ঢুকতে পারব না, সে কাম্‌বকৎ বাপকে পোষা বিলাই বানিয়ে রাখতে চায়। আজ আমি নিজের খরচভর না কামিয়ে বাড়ি ফিরব না। নিজের রোটি-গোস্ত, নিজের তামাকু, নিজের সরাব।'

দশ

ঠাকুরবাবার কুটির থেকে বেরিয়ে সর্দার সুজন সিং চোখের সুমুখে অনেকগুলি রাস্তার নক্সা দেখল। ত্বরিত মনের বিচারে যতদূর সম্ভব আশু উপার্জনের পথটা দ্বিতীয়বার চিন্তা করে নিল। তগদীর তগদীর করে মানুষগুলো ছটফট করে মরছে, প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারও দেশবাসীর হাতে তগদীরের চাবিকাঠি ভিড়িয়ে দেবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। একটাকায় এক লাখ পাঁচ লাখ পর্যন্ত। লটারির টিকিট বিক্রি করবে সুজন সিং। কিন্তু পকেটে দশটাকাও নেই। কুলদীপ সিংএর কাছে চাইলে সে বিনা প্রশ্নে পিতার হাতে পাঁচ সাতশ' টাকা দিয়ে দেবে। প্রীতমও সুপ্রতিষ্ঠিতা, তার র‍্যাশনের দোকান চলছে, ইদানীং কোনো এক উঠতি ঠিকেদারের সঙ্গে ভিড়ে তার সরিকানায় একটা কাজও জুটিয়ে নিয়েছে সে। রোজ সকাল দশটায় নিজের স্কুটার ছুটিয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যের পর। কোনোদিন বা বেশ রাত করেই। সে কোথায় যায়, কি করে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না সুজন সিং। কানাঘুষো শোনা যায়, অবস্থা ও ক্ষেত্রবিশেষে দেহদান করেও সে নাকি কার্যোদ্ধার করে। প্রীতম মদ্যপান করে আজকাল, তবে মাত্রা ছাড়িয়ে নয় বলে সুজন সিং আপত্তি করেনি। বরং তার যে ধরনের কাজ তাতে একটু আধটু অনাচার থাকা স্বাভাবিক। বেশি শুদ্ধাচারী হলে দুনিয়াদারী চলে না। বিশেষত এ যুগটাই যখন এইরকম। প্রীতম যদি ভবিষ্যতে পাঁচের একজন হয়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে তার দ্বারাই সমাজের বহু মঙ্গল সাধিত হবে, তখন কেউ অনুসন্ধান করতে আসবে না তার প্রতিষ্ঠার মূলধন কি।

প্রীতমের দোষগুণ যা'ই থাক, কাজ আদায়ের জন্য যে পথ ধরেই চলুক, কিন্তু কয়েকটি জায়গায় সে অবিচলিত। সংসারের প্রতি আসক্তি, জীবন সম্বন্ধে উচ্চতম ধারণা ও মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ

আছে তার। এই-ই যথেষ্ট। এর বেশি সর্দার সুজন সিং এ যুগের আত্মদগ্ধ মানুষের কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করে না।…কিন্তু ঐ এক দোষ প্রীতমের, বাপকে শিশু সাজিয়ে রাখতে চায়, এই নিয়ে তার সঙ্গে সর্দার সুজন সিংএর বিরোধ।

মাঠ পেরিয়ে সুজন সিং কাছারির কাছে চলে এসেছে। মনে পড়ল সকাল থেকে এক কল্‌কে তামাক ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি। কাছারির কাছে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সর্দার চন্দন সিং পাঞ্জাব হোটেল খুলেছে। সুজন সিংকে দোকানে ঢুকতে দেখে চন্দন সিং সাশ্চর্যে উঠে দাঁড়াল, তারপর অনেকখানি মাথা ঝুঁকিয়ে বিস্মিত পুলকে সম্বোধন করল, 'পাপ্পুজী!'

স্থানীয় গুরুদ্বারা সমিতির সভাপতি সর্দার সুজন সিং এই শহরবাসী শিখ সম্প্রদায়ের অভিভাবকস্বরূপ। চন্দন সিংএর অভিবাদনের উত্তরে তার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর কাউন্টারের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সুজন সিং, তারপর বাজখাঁই কণ্ঠস্বর আরো দরাজ করে আদেশ করল, 'সেরভর চা বানাও চাঁদন। রোটি আছে?'

পরিচারককে নির্দেশ দেওয়া নয়, চন্দন সিং নিজে উঠে গিয়ে পর্দার আড়াল দেওয়া কিচেনে ঢুকল। পরক্ষণেই একটি থালায় দু'খানা তন্দুরী রুটি খানিক হরিৎ-কৃষ্ণ সবজী আর আধখানা করে কাটা একপোয়া পরিমাণ কাঁচা পেঁয়াজ এনে সুজন সিংএর সুমুখে সসম্ভ্রমে রেখে প্রশ্ন করল, 'কোন্‌ দুধের চা বানাবো পাপ্পুজী, গাই না ভৈস?'

'খাঁটি কোন্‌টা?'

চন্দন সিং হাসল, 'দুটোই। খাঁটি দুধ আলাদা রাখি।'

তন্দুরী রুটিতে কামড় দিয়েছিল সুজন সিং। আধখানা পেঁয়াজ সেই সঙ্গে চিবুতে চিবুতে অস্পষ্ট শব্দে বলল, 'ভৈস—।'

একসের খাঁটি মোষের দুধের চা দুটি বড় বড় পিতলের মগে ঢালা ওপড়া করছে চন্দন সিং, দু'খানি হাতের ব্যবধান প্রায় দেড়গজ, কিন্তু

নিশানা ব্যর্থ হয়ে একবিন্দুও ইতস্ততঃ ছিটকে যাচ্ছে না। অথচ এই চন্দন সিংকে নিজের মুল্‌কে থাকতেই চিনত সুজন সিং। একটা লাল রঙের রেসিংকার নিয়ে দিনরাত মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে হয়ে-ছুট্ ছুটে বেড়াত। সক্কর বাঁধ হওয়ার পর বাপ বলবীর সিংএর তিনশ' একর মরুভূমি সদৃশ জমি সোনার খনিতে পরিণত হয়েছিল। চন্দন সিংকে দেখে সুজন সিংএর রিফ্যুজি ক্যাম্পের ছোকরাগুলোর কথা মনে হতে লাগল। ওরা কি সত্যি-সত্যিই মাছি-মশার মতো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে!

আহার এবং চা পানান্তে সর্দার সুজন সিং চন্দন সিংএর প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমীর সিং রোজ কাছারি আসে, না?'

'আসে তো, নাজারাতের বারান্দায় পেয়াদাদের চৌকিতে বসে মহাজনী করে।'

অভ্যাসবশে হাতঘড়ি দেখে সুজন সিং, দাড়ি ঝাড়ে, তারপর জানতে চায়, 'সুদ কি দর?'

'টাকাপিছু একনয়া রোজ।'

'বেশি তো নয়, চলছে কেমন?'

'ভালই।' একটি আসি-আসি খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে চন্দন সিং তাকে আমন্ত্রণ জানায়, 'আইয়ে বাবুজী, যঁহা সব পিওর হ্যায়; পিওর ঘি, পিওর দুধ, আসলী তন্দুরী রোটি।' তারপর সুজন সিংএর উদ্দেশে বলে, 'কাছারির আমলা গোমস্তা আসামী ফরিয়াদী আর অনেক ছোটখাট হাকিমও ওর মক্কেল। তাছাড়া দোকানদার হোটেলওয়ালারা তো আছেই।'

কালেক্টরেট নাজারাত সর্দার সুজন সিংএর অপরিচিত নয়। এ শহরে আসার পর বছর কয়েক পর্যন্ত সরকারী সাহায্যের সন্ধানে ঐ নাজারাতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধর্ণা দিত সব সম্প্রদায়ের শরণার্থীরা। সুজন সিং কখনো সাহায্য নিতে আসেনি, তবে অনেকের সাহায্য ব্যবস্থা করবার জন্যে আসতে হত তাকে।

প্রায় জনাবিশ মক্কেল পরিব্যাপ্ত হয়ে সর্দার আমীর সিং বসেছে। আপিস চলছে তার। সুদের টাকা ও নয়াপয়সার আমদানী, ঋণ বিতরণ। আমীর সিংএর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করে সুজন সিং কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তার ব্যবসাপদ্ধতি লক্ষ্য করতে লাগল।

হঠাৎ এ কি করে বসল আমীর সিং। ও লোকটা তেরো নয়া সুদ ছাড়বার জন্যে একটু আকুতি করেছিল, তাতে সফল না হয়ে বলেছিল, 'যাও সর্দারজী, তোমার সুদ-আসল কিছুই দেব না, সড়কের ওপারে সিভিল কোর্ট, তুমি ওখানে গিয়ে আমার খেলাপ ডিগ্রি করাও।' খাতকের ন্যায়-অন্যায় এ জায়গায় বিচার্য নয়, কিন্তু আমীর সিং অমন বুড়বকের মতো ব্যবহার করল কেন; এ কি কাবলীর মহাজনী, মেরা লাঠি তেরা শর্! সে জামানা গেছে, আজ আর কাবলীকে কেউ তোয়াক্কা করে না। কাবলীরা তাদের মহাজনী ক্রমশ গুটিয়ে ফেলেছে, মেয়াদী দরে পুরনো গরম কাপড়চোপড় বিক্রি করাই এখন তাদের একমাত্র ব্যবসা। তাতেও সবসময় মুনাফা তুলতে পারে না, ভেজাল দেওয়া হিং বিক্রি করে খানিকটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করে।···মক্কেলের চড়া কথা শুনে অমন উত্তপ্ত হল কেন আমীর সিং, কি না বলে বসল, 'তুম নহীঁ দেওগে তো তুম্হারা বাপ সে উসুল কর লেঙ্গে।' চটপট পিতা-পিতামহ তোলা, এই কি কারবারী লোকের লক্ষণ? তোকে চলতে হবে প্রতি পদে তেল ঢেলে ঢেলে, নরম বাত্ মিঠে বুলি আওড়ে শেষ টানে মক্কেলের পিতৃপুরুষের ভিটে-বাড়ি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে হবে—তারই নাম 'বিজনিস'।

এই অন্যায় এবং অপরিপক্ক দৃশ্য সুজন সিংএর সহ্য হল না, উচ্চ-গ্রামে হেঁকে উঠল, 'আমীর সিং!'

আমীর সিং চমকায়, সুজন সিংকে দেখে তৎপর ব্যস্ততায় উঠে দাঁড়ায় সে, 'সর্দারজী!'

সর্দার সুজন সিং কাছে এগিয়ে এল, 'কারোবার নরম কা, সরকার গরম কা। ব্যবসা করতে বসে অত গরমী দেখানো ভাল নয় আমীর সিং; মক্কেল তোমার লছমী, তাকে যদি তেরো নয়া রেহাই দাও

তাতে কি তুমি ফোঁৎ করে যাবে? না হয় হিসেবে পুরো উসুল লিখে নিয়ে তোমার নিজের জেব থেকে তেরো নয়া জমা করে দাও—হিসেবেই বা ভুল রাখতে যাবে কেন?'

তাই করতে যাচ্ছিল আমীর সিং, কিন্তু মক্কেলই বাদ সাধে, 'এঃ, বড় দাতাকর্ণ এসেছে, তেরো নয়া খয়রাৎ দিয়ে আমায় রাজা করে দেবে! আমি চাই না তেরো নয়া। নাও, এই সিকি, এ থেকে আমায় বারো নয়া ফেরত দাও।'

আমীর সিং সুজন সিংএর দিকে তাকায়, সুজন সিং তাকে চোখের ইঙ্গিতে মক্কেলের সঙ্গে সহমত হবার নির্দেশ দেয়। তারপর সর্দার সুজন সিং ওপরপড়া হয়ে আমীর সিংএর মক্কেলকে বলে, 'এ আপুনি বিলকুল ঠিকই করিয়েছেন বাবুজী, তেরো নয়া খয়রাৎ কেনো লিবেন আপুনি? আপনি তো বহুত ধনী আসচেন, আপুনার চাল-চলন পুরোপুরি বাদশাহী, আমীর সিংএর মতুন মুণিলেনডারকে আপুনি খরিদ করিয়ে লিতে পারেন।'

আমীর সিং এবার প্রশ্ন করে, 'আপনি সর্দারজী?'

'বলছি, তোমার একটু ফুরসৎ হোক।'

যথাসময় সর্দার সুজন সিং জানাল, 'আমার ছু'শ' রূপায়া কর্জা চাই আমীর সিং।'

আমীর সিং বিস্মিত হয়, 'আপনার কর্জা চাই, তা-ও মামুলি ছু'শ'! কেন, কল্‌দীপ সিং—'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে সুজন সিং বলে, 'না না, মুণ্ডে কল্‌দীপ কি আমার বেটি প্রীতমকে কিছু জানাতে চাই না।' তারপর ভারি হাতখানা আমীর সিংএর কাঁধের ওপর রাখে সে, 'আমার আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না, তোমার কাছে টাকা কর্জা নিয়ে লটারির টিকিট কিনে বিক্রি করব।'

আমীর সিং দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না, খেরো কাপড়ের থলি থেকে ছুটি শতঅঙ্কের নোট বা'র করে সুজন সিংএর দিকে প্রসারিত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সুজন সিং হাতঘড়ি খোলে, 'ঘড়িটা তোমার কাছে রাখ।'

আমীর সিং জিভ কাটে, 'না-না।'

সুজন সিং হাসে, 'তার জন্যে নয় আমীর সিং, তোমার টাকা আমি মেরে দিতে পারি বলে নয়; যদি হঠাৎ মরে-টরে যাই এই ঘড়িটা বিক্রি করে তুমি নিজের টাকা আদায় করে নিও। কলদীপ বা প্রীতম যেন জানতে না পারে তাদের বাপ কোথাও কর্জা রেখে মরেছে।'

সর্দার সুজন সিংএর চরিত্র আমীর সিংএর সুবিদিত, ওখানে সমমুহূর্তে দ্বিবিধ মত সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। আমীর সিং আর আপত্তি করে না, ঘড়িটা সুজন সিংএর হাত থেকে নিয়ে নিজের খেরোর থলির ধনভাণ্ডারে জমা করে রাখে।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ করে, সন্ধ্যেতারাটিকে আরো অসংখ্য তারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হবার পুরোপুরি সুযোগ দিয়ে সর্দার সুজন সিং বাড়ি ফিরল। আজও জীবনের সেই দুর্লভ সুযোগটা লাভ হয়েছিল, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে একত্রে পাঁচটি তারা দেখার সঙ্গে তার সৌভাগ্য যেন ওতপ্রোত হয়ে আছে। অনেকবার এই চেষ্টা করে দেখেছে সে, কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় একবারও সক্ষম হয়নি। যখন হবার তখন আপনা থেকেই হয়েছে—একসঙ্গে পাঁচটি তারার দর্শন। নয়তো কখনো তার চেয়ে কম, কখনো বা অগণিত তারাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সার্দর সুজন সিংএর মনে পড়ে কিশোর বয়েসে কলকাতায় চাকরির সন্ধানে যাওয়া। তখন পাঞ্জাববাসীদের সঙ্গে বাংলা মুলুকের সম্পর্ক একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আজাদির চোরা-গোপ্তা লড়াই চলেছে বাংলায়—এ্যানারকিজম্। ওদিকে বিহার উত্তরপ্রদেশের মাথা টপকে গুরু নানক গুরু গোবিন্দ আর শের-ঈ-পাঞ্জাব রঞ্জিৎ সিংএর মুলুক-ঈ-পাঞ্জাব বাংলার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিয়েছে। পাঞ্জাব বাংলা একাত্মা। বাঙালীরা পাঞ্জাবীদের বাঁধাকপি বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে না, পাঞ্জাবীরা বাঙালীদের ছাতার বাঁটের মত ছাতি দেখে বিস্মিত হয় না। কিন্তু একদিকে সখ্যতাবৃদ্ধি হলেও অপর দিকে বিপত্তি। চাকরি দিতে তো ধনী শেঠী আর ধনী বাঙালী রাজা-বানিয়া, কিন্তু তারা চিরদিনই রাজভক্ত। কানা ছুছুন্দর যেমন সদাসর্বদা দেয়াল ঘেঁষে চলে, ধনীদের চলৎগতিও অনুরূপ ; রাষ্ট্রশক্তি বা বাদশার পা ঘেঁষে থাকা ছাড়া তারা টিকতে পারে না। তাই পাঞ্জাবী মাত্রেই তাদের সন্দেহ এ্যানারকিস্ট।

সর্দার সুজন সিং যখন কলকাত্তায় পৌঁছেছিল তখন সে প্রকৃত-পক্ষে মুণ্ডে সুজন—বছর বারো-তেরোর কিশোর। মাথায় সুদীর্ঘ কেশ

ছিল বটে, একটা আনার (বেদানা) মাপের খোঁপা বাঁধা যেত, কিন্তু মুখে গোঁফ-দাড়ির সামান্যতম চিহ্নও ছিল না।

অচেনা শহরে চাকরি খুঁজে বেড়াতে সুজন সিংএর ভালই লাগছিল। গুরুদ্বারায় একটা আশ্রয় পাওয়া গিয়েছিল, বিনামূল্যে আহারও। আতিথ্যের মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পর সেইখানেই কর্জা খেত সে। নৌক্‌রী জুটলে ঋণ শোধ দেবে। কবে তার নৌক্‌রী জুটবে, কবে কর্জা-আদা করবে তা নিয়ে গুরুদ্বারা কমিটি মাথা ঘামাত না। বরং তামাশা করত কেউ কেউ, 'মুণ্ডে সুজন, তেরা নৌক্‌রীকা তালাশ য়া ছোকরী কা ?' মুণ্ডে সুজন সিং জবাব দিত, 'জী হাঁ সর্দারজী, দোনো কা, পহলে নৌক্‌রী, পিছে ছোকরী।' কলকাত্তার সর্দারজীরা ঠেট্‌ গুরুমুখী বলে না, তাদের দেখাদেখি সুজন সিংও খিচ্‌ড়ি ভাষা রপ্ত করে ফেলেছিল।

মুণ্ডে সুজন সিং কলকাত্তার পথেঘাটে নৌক্‌রী খুঁজে বেড়াত, আর কলকাত্তাবাসী বাঙালী মুণ্ডেরা, যারা তার সমবয়সীই হবে, চিড়িয়াখানার আজীব জীব দেখার মতো বাচ্চা শিখ দেখত। বাচ্চা শিখ, বাচ্চা শিখ, বলে হৈ হৈ করত তারা। অনেকে সেধে ভাব করতে আসত। কিছুদিন পরে সুজন সিং বুঝতে পেরেছিল, কলকাত্তা শহরের বাড়ি বাড়ি কাবলী হানা দিয়ে বেড়ালেও এখানে যেমন কাবলী মুর্দা দেখা যায় না, তেমনি বাচ্চা শিখও দুর্লভ-দর্শন। কারণ জোয়ান মর্দরাই এ শহরে রূপায়া কামাতে আসে, মোটা পয়সা পায়দা করতে করতে বার্ধক্যের ধারেকাছে এসে পড়ে এখান থেকে উধাও হয়ে যায়।

গুরুদ্বারায় আসা-যাওয়ার পথে সুজন সিংকে দেখে যে বাচ্চা বাঙালীরা বাচ্চা শিখ, বাচ্চা শিখ বলে চেঁচাত তাদেরই একজনের সঙ্গে সুজন সিংএর ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের একটা মস্তবড় ফাটকওয়ালা বাড়িতে থাকত ছেলেটি, নাম মৃণাল। মৃণাল সেধে আলাপ করেছিল।

'তোমার নাম কি ?'

'সুজন সিং। তোমার- ?'

'মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

'এটা তোমার বাড়ি ?'

ঘাড় নেড়েছিল মৃণাল, 'না, আমার বাবা এখানে চাকরি করেন। এ তো জমিদারবাড়ি, আমার বাবা সেরেস্তার হেড গোমস্তা। তুমি কোথায় থাক ?'

'গুরুদ্বারা।'

'কোথায় সেটা ?'

সুজন সিং স্থান পরিচিতি দেয় ; দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'গুরু নানকের মন্দির, গ্রন্থসাহেবের মন্দির।'

'তোমার দেশ কোথায় ?'

যতদূর সম্ভব সবিস্তারে নিজের মুলুকের পাত্তা জানায় সুজন সিং, তারপর এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে 'আমি নৌক্‌রীর খোঁজে এসেছি।'

'তুমি তো ছেলেমানুষ !'

ঘাড় নাড়ে সুজন সিং, 'না, আমার তেরো সাল পুরে গেছে।'

'আমারও তো তেরো বছর চলছে।' জবাব দিয়ে মৃণাল সুজন সিংএর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। সে নিজের চাকরির চিন্তা এখনও করে না, কিন্তু ইচ্ছে করলে একজনের চাকরি করে দিতে পারে। বাবাকে বলে সুজন সিংকে চাকরি দেওয়ানো তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মৃণাল বলে, 'বেশ, এতদিন আমায় বলনি কেন, আমি তোমায় কালই চাকরি করে দেব।'

সুজন সিং যেন আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে, 'কালই—!'

মৃণালের বাবা অঘোর চাটুজ্জে কিন্তু আঁৎকে উঠেছিলেন, 'ওরেঃ বাপ্‌, আমি খাল কেটে কুমীর ঢোকাতে পারব না, এ্যানারকিস্টের ছানা, খবরাখবর নেবার জন্যে এ বাড়িতে ঢুকতে চায়।'

এত কঠিন এবং যুক্তিসম্মত আপত্তি নাকচ করাবার জন্যে ছোট্ট মৃণালকে সুদীর্ঘ চারদিন উপোস করতে হয়েছিল, তাতেই তার বাবার মনিবের প্রাসাদে সুজন সিংএর চাকরি জুটেছিল। গুর্খা দরোয়ানগোষ্ঠীর সহকারী। সুজন সিংএর সঙ্গে তারা বনিয়ে চলতে চাইত না, কিন্তু সুজন সিংএর চেহারায় সেই বয়েসেই অনেক লম্বা-চওড়া ভাঁজ এসে গিয়ে থাকলেও দুনিয়াদারির প্রথম পাঠ তার কণ্ঠস্থ ছিল, নৌক্‌রী নরম কা, হুকুম্মত্‌ গরম কা'। তাই দিল্‌ বাহাদুর ললিত বাহাদুরবর্গের গরম লোহার প্রহার তার ঠাণ্ডা লোহার প্রতিরোধের সুমুখে টিকতে পারত না। শেষাবধি বাহাদুররা তাকে স্নেহই করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। বাঁশী শিখিয়েছিল মঙ্গল বাহাদুর।

জমিদারবাড়ির নৌক্‌রীতে বছর পাঁচ-ছয় বেশ কাটিয়ে দিয়েছিল সুজন সিং। ইদানীং মনে মনে ভাঁজতে আরম্ভ করেছিল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোনো ব্যবসা ধরবে এইবার। ঠিক এই সময়ই দুর্ঘটনা। ডাকাতি হল মালিকের বাড়িতে। সুজন সিংএর রাতের পাহারা ছিল না, উপর্যুপরি পিস্তলের শব্দে তার ঘুম ভেঙেছিল। তারপর বাড়িতে ডাকাত পড়লে যেমন হয়, সাতঙ্ক চিৎকার হুঙ্কার মুহুর্মুহুঃ বন্দুকের আওয়াজ, পুলিশের আগমন এবং সেইসঙ্গে নিঃশব্দে সুজন সিংএর ভাগ্যপরিবর্তন।

পরের দিন সকালবেলা মৃণাল চুপিচুপি ডেকে পাঠাল, 'সর্দারজী, তোমায় একটা কথা বলব।'

মৃণাল কলেজে পড়ছে, সুজন সিংএর সঙ্গে তার প্রাক্তন ঘনিষ্ঠতা বয়সোচিত গাম্ভীর্যের নিচে অনেকখানি তলিয়ে গেছে, সুজন সিং তাকে সমীহ করে। বিনা প্রশ্নে নিজে থেকে কিছুই বলে না, তাই মৃণালের কথা শুনে কিছু জিগ্যেস না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। মৃণালের যা বক্তব্য ত'াই বলুক আগে, তারপর প্রয়োজন হলে সে কথা বলবে।

মৃণাল বলল, 'সুজন সিং, পুলিসের সন্দেহ এ রাজনৈতিক

ডাকাতি, দলে তুমিও আছ। দু'একদিন তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করে তারপর গ্রেপ্তার করবে, তুমি আজই পালিয়ে যাও।'

'কোথায়—!'

'যেখানে তোমার খুশি। তুমি বরং দেশে চলে যাও।'

'কিন্তু আমি তো এর মধ্যে নেই!'

মৃণাল গম্ভীর হয়ে বলে, 'তা আমি জানি, কিন্তু এ-কথা প্রমাণ করবার জন্যে তোমায় সাত বছর হাজতে থাকতে হবে। তাছাড়া এর জন্যে তোমার যত টাকা দরকার তা তুমি আরো বিশ বছর চাকরি করেও রোজগার করতে পারবে না।'

'তাহলে—'

নিজের যা বক্তব্য সুজন সিংকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়ার পর মৃণাল হঠাৎ বলল, 'সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে সুজন সিং, আমিই তোমায় এ বাড়িতে এনেছিলুম, আমিই যেতে বলছি।'

সেই রাতেই সুজন সিং পায়ে হেঁটে জি. টি. রোড ধরল। বর্ধমান পৌঁছুতে দু'দিন। তারপর মন হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে নির্দোষ, তবু চোরের মতো পালিয়ে এল কেন? লেখাপড়া জানা মৃণালই বা তাকে এমন উপদেশ দিল কেন? সুজন সিং দ্বিধায় পড়ে যায়, সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে চিন্তা করে কলকাত্তায় ফিরে যাবে, না নিজের মুলুকের দিকেই এগুবে? ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে পাঁচটি তারা দেখল সে—এ যেন তার মুলুক-ঈ-পাঞ্জাবের হাতছানি। তারপর আর দ্বিধা-সংশয় নয়, নিজের দেশ, নিজের গ্রাম, তারপর সুবর্ণনির্মিত শহর লাহোর।

আজও সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে পাঁচটি তারা সুজন সিংএর নজরে পড়েছে। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে

সারা আকাশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে সে, নাঃ, ঐ পাঁচটাই। সুজন সিংএর পক্ষে এর চেয়ে শুভ নির্দেশ আর নেই কোনো। আজ আবার ঠিক পথই বেছে নিয়েছে সে। ময়দানে নেমে পড়ছে। একদিনের বিক্রি একশ' বাইশ টিকিট, অর্থাৎ প্রায় টাকা পঁচিশ মুনাফা। তার মধ্যে সুদের দরুন দু'টাকা আমীর সিংএর প্রাপ্য। কাল কাছারিতে গিয়ে টাকা দুটি দিয়ে আসতে হবে। কালেক্টারি আপিস থেকে স্টেট লটারির কিছু টিকিটও কিনতে হবে।

কি এমন পরিশ্রম! স্টেশনের মোড়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়া, 'আইয়ে আইয়ে, তকদীর অজমাইয়ে—লিজিয়ে ঢাই লাখ, পাঁচ লাখ, সাত লাখ!'

আজ সুজন সিংএর কাজে অল্পবিস্তর অসুবিধে হচ্ছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিটে নাম-ধাম ঠিকমতো লেখা যাচ্ছিল না। উপরন্তু তার হাতের দেবনাগরী অক্ষর—হাত-পা মেলে কলম ধরতে না পারলে আখর খোলতাই হয় না। এর জন্যে সে একটা মতলব ঠাওরেছে, কাল থেকে গলায় একটা চায়ের ট্রে ঝুলিয়ে তাতেই আপিস খুলবে। মুণ্ডে কল্‌দীপ আর বেটি প্রীতম হয়তো পছন্দ করবে না, তা তাদের জানাবার দরকারই বা কি! বাড়ি ঢোকার মুখে ট্রে-টা রাস্তার মোড়ে পানের দোকানে রেখে দিয়ে গেলেই হবে।

নীট মুনাফার তেইশটাকা সর্দার সুজন সিংএর ঝোলা কোর্তার পকেটে গিজগিজ করছে—মূলধনের একশ' আর সুদের দুটি টাকা বাদ দিয়েই অবশ্য। পাঁচটা তারা দেখার পর সে দরাজ মন নিয়ে একটি হোটেলবারে ঢুকে পড়ল। ইচ্ছানুযায়ী আহার করল সর্বপ্রথম। তারপর এক নিব্‌স হুইস্কি সোডা আর ভাজা কাজুবাদাম। মুল্‌ক ছেড়ে আসার পর দেশী সরাবই তার নিত্যদিনের পানীয়। পালপার্বণে কল্‌দীপ আর প্রীতম হুইস্কি ব্রাণ্ডি এনেছে বটে, কিন্তু সে সরাব সুজন সিংএর গলার নিচে

নামতে চায়নি। সন্তানদের প্রাণান্ত পরিশ্রমে উপার্জিত টাকায় বাবুয়ানি করে সুখ হয়নি। আজ হুইস্কির স্বাদ বেশ নতুন অথচ স্মৃতিময় প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে, যদিও বিলিতি নয়, উত্তরপাড়া-কোন্নগর ডিসটিলারির চোলাই—বিলিতি নামের লেবেল আঁটা।

পৌত্র-পৌত্রী, হুইস্কি স্যাম্পেন শেরীর মুখে সর্দার সুজন সিং আজকাল আর মদ ঢেলে দেয় না, বাজে জিনিস গিলিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পচিয়ে দিতে চায় না বলেই। পুরনো অভ্যেসের দরুন হুইস্কি মাঝে মাঝে বায়না করত, 'আমায় একটু দারু দাও না পাপ্পুজী।'

'না।' সংক্ষেপে হুইস্কির আবেদন অগ্রাহ্য করে দিত সুজন সিং। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে তার দুটি চোখ সজল হয়ে আসত। নিজের পাকা নেশার নিয়মিত খোরাকটা পর্যন্ত মুখে বিস্বাদ লাগত তখন। অথচ দেশী ধেনো মদ ততদিনে তার শরীর সয়ে নিয়েছে, মনের সঙ্গেও মানিয়ে গেছে।

আজ হুইস্কি স্যাম্পেন শেরীর জন্যেও একটা ছোট বোতল নিল সুজন সিং। বাজারের পাঞ্জাবী হোটেল থেকে মাংস কিনল খানিকটা, যদিও এ আয়োজন তার বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন হয়।

পাঁচ তারার কথা ভাবতে ভাবতে পরিপূর্ণ মনে বাড়ি ফিরছে সুজন সিং, প্রথম ধাক্কা আসবে প্রীতমের কাছ থেকে, সে খোঁজ করবে, 'আজ ভোর থেকে মাঝরাত অবদি তুমি কোথায় ছিলে পাপ্পুজী? আমি স্কুটার নিয়ে সারা শহর চষে তোমার তালাশ করেছি।'

প্রীতমকে একচোট ধমকে দিতে না পারলে তার কোঁসকোঁসানি যাবে না, হয়তো রাতভোর চলবে, অতএব একটি মাত্র কথা বলে তাকে নিরস্ত করতে হবে, 'তুমি নিজের গেহুঁ নিজে ভাঙো, আমার কথা তোমায় চিন্তা করতে হবে না।'

প্রীতম থতমত খেয়ে চুপ করে যাবে প্রথমটা, তারপর অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে বলবে, 'বেশ আমি কিছু জিগ্যেস করব না, এখন চল, খাবারটুকু খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দাও।'

'আমার খাওয়ার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি খেয়ে এসেছি।'

প্রীতম আরো অবাক হবে, আরো বিক্ষুব্ধ-বিমর্ষ, কিন্তু সে সব ভাব চেপে রেখে বলবে, 'ওঃ, খেয়ে এসেছ, তা বাড়িতে বলে গেলেই পারতে, তাহলে আমায় তোমার খাবার আগলে বসে থাকতে হত না। ...শেরী, পাপ্পুর তামাক সেজে দে, পাপ্পু আজ আর কিছু খাবে না, খেয়ে এসেছে।'

'থাক্, আমার কোনোকিছু নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।' বলতে বলতে সুজন সিং অন্ধকার দোরগোড়া ছেড়ে দালানের আলোর নিচে এসে দাঁড়াবে, এবার তার হাতের মাটির পাত্রটায় চোখ পড়বে প্রীতমের ; করবে না মনে করেও সে জিগ্যেস করবে, 'তোমার হাতে কি ?'

'গোস্ত্।'

'হঠাৎ— !'

'আমার খাইস্', তারপর সুজন সিং হাঁক দেবে, 'হুইস্কি, স্যাম্পেন, শেরী, যা এক একটা পিলেট আর গেলাস আন তাড়াতাড়ি।'

প্রীতমের এতদিনকার আধিপত্য অগ্রাহ্য করে সর্দার সুজন সিং আজ পৌত্র দুটি আর পৌত্রীকে নিয়ে ড্রিংক পার্টি বসাবে। নিজের হাতে তাদের গেলাসে দারু ঢেলে দেবে, মাংস পরিবেশন করবে, আর সর্বময়ের কাছে প্রার্থনা করবে, জীবনে যত দুর্যোগই আসুক না কেন, এরা যেন তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে নিতে পারে, যেন ভাগ্যের প্রত্যাশী হয়ে বসে না থাকে।

সুজন সিং বাড়ি ঢুকল। বাড়ি যেন খাঁ-খাঁ করছে। প্রীতম বোধহয় এখনো ফেরেনি। তার চালচলন আজকাল একটু বেশিই বিগড়ে গেছে। শাদী করার নাম নেই, ভোগ করার সাধ আঠারো-

আনা। সব জেনেশুনেও সর্দার সুজন সিংকে চুপ করে থাকতে হয়। সম্ভবত আধুনিক দুনিয়ার পন্থাটাই এইরকম। তবে পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকতে হলে যুগের ফর্মায় নিজেকে ঢেলে নেওয়াই ভাল, নয়তো জীবনকালেই মৃত্যু। সর্দার সুজন সিং যেমন সন্তানদের রচিত প্রতিবন্ধক মানতে চায় না, তেমনি তাদেরও বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে চায় না। তবু একটি কথা সে আজ প্রীতমকে বলবে, 'একটু গা বাঁচিয়ে চল নয়তো নিজের বোকামীর শিকার হয়ে বসবে তুমি। অগ্নিশুদ্ধ হতে চাও আপত্তি নেই, কিন্তু তা হতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ-অস্তিত্বহারা হয়ো না।' এটুকু বলা, এতটুকু সাবধানতা দেওয়া দোষের হবে না নিশ্চয়ই।

অন্যদিন হলে প্রীতমের নাম ধরে ডাক দিয়েই সুজন সিং বাড়ি ঢুকত, কিন্তু আজ সহজেই অনুমেয় প্রীতম ফেরেনি এখনো। উঠনের এক পাশে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে তার স্কুটারটা দেখা যাচ্ছে না।

সুজন সিং ডাকল, 'শেরী!'

শেরী ঘরে ছিল, সাড়া না দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল; যেমন তার স্বভাব, বিনা প্রয়োজনে একটি শব্দও সে খরচ করে না। পাপ্পুজী ডেকেছে, আসতে হবে, তখন সাড়া দেওয়া না দেওয়ায় কি আসে যায়।

মনের মধ্যে ঠিক যেমন আয়োজন সাজিয়ে নিয়ে সুজন সিং বাড়ি ঢুকেছিল তেমনটি আর হল না, শেরীর হাতে মাংসর পাত্রটা দিয়ে বলল, 'এটা রাখ্, প্রীতম ফেরেনি এখনো?'

সুজন সিংএর সাড়া পেয়ে অল্প একটু অবগুণ্ঠন টেনে পুত্রবধূ অমৃতও বেরিয়ে এসেছে, শেরীকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল তার উত্তর অমৃতই দিল, 'প্রীতমকে পুলিসে ধরেছে, আপনার মুণ্ডে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।'

'হঠাৎ—!' সুজন সিং উঠনেই বসে পড়তে যাচ্ছিল, কোনোমতে অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের ধাক্কা সামলে নিয়ে দৃঢ় পা দুটি মাটির

ওপর আরো শক্ত করে চেপে রেখে প্রশ্ন করল, 'কেন, স্কুটার নিয়ে কোনো এ্যাকসিডেন্ট করেছে নাকি, স্কুটারটাও দেখছি না?'

'না।' অমৃত কাওর ঘাড় নাড়ল, তারপর সুজন সিংএর চিন্তা-ছায়াগ্রস্ত চোখের সুমুখ থেকে নিজের চোখজোড়া অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আজ প্রীতমের দুটো র‍্যাশন দোকানেই পুলিসের হামলা হয়েছিল—একসঙ্গে সাপ্লাই আর বাটখারা সাহেব।'

'বাটখারা সাহেব—ওঃ, ওয়েট এ্যাণ্ড মেজার!' সুজন সিং হেসে ফেলল হঠাৎ, তারপর জিগ্যেস করল, 'কেন ধরল তাকে?'

'ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড আর নকল বাটখারা, কম ওজনের।'

'কিন্তু—' সুজন সিং চিন্তিত মুখে ভ্রূকুটি করে, তার মুখাকৃতি অথবা ভ্রূকুটি কোনোটাই অবশ্য দেখা যায় না, কপালের তিনভাগ ঢাকা মুরেঠা, আর মুখে ঘন জঙ্গল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট সন্দেহের প্রকাশ, 'এর জন্যে তো সমন করবে, একেবারে গ্রেপ্তার?'

অমৃত কাওরকে উপলক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেও তার কাছে উত্তর চায়নি সুজন সিং। এ প্রশ্নের জবাব দেবে পুলিস ও আদালতের হাকিম। ব্যবসা করতে বসে সুজন সিংএর ওপর কতবার সমন ওয়ারেণ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম প্রথম একটু চিন্তিত হত সে, তারপর আর মাথা ঘামায়নি। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য টাকার তোড়া নিয়ে ছুটে যাওয়া। ব্যবসার মুনাফা থেকে এর জন্যে একটা অংশ সে নিয়মিত কেটে রাখত। স্মাগলিংএর কারবারে এক-এক দফায় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু লক্ষের খেসারৎ ডবল মুনাফার আকার নিয়ে ফিরে এসেছে। লাহোর না হয়ে চণ্ডীগড়ের মানুষ হলে ঐ টাকার জোরে সর্দার সুজন সিং আজ মন্ত্রীর গদি খরিদ করে রাখত।

অমৃত কাওর আরো একটু সংবাদ পরিবেশন করে, 'হামলার সময় নাকি কালেক্‌টার সাহেব নিজে ছিলেন।'

'কালেক্‌টার—!' সুজন সিং অধিকতর চিন্তিত হয়। কালেক্‌টারকে চোখে দেখেনি সে, কিন্তু পরিচয় শুনেছে। তরুণ আই-

এ. এস. মিস্টার এস. এন. পাঠক। এখনো দুনিয়াদারীতে হাতেখড়ি হয়নি তার। কর্তব্য এবং ন্যায়ধর্মে বিশ্বাসী। আর কাউকে চিন্তা নয়, কারো সততার বিক্রয়মূল্য শ'-এর অঙ্কে কারো বা হাজার। কাল অবশ্য প্রীতম জামিনে মুক্তি পাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তার কপালে কয়েদ লেখা আছে? কারাবাস। আর তা সর্দার সুজন সিংএর জীবনকালেই!

সর্দার সুজন সিংএর সমস্ত নাড়ি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সে চাপাস্বরে তর্জন করে, আমি 'এস. এন. পাঠককে খুন করব।'

এস. এন. পাঠক নাম শোনেনি অমৃত কাওর, সাশ্চর্যে প্রশ্ন করে, 'এস. এন. পাঠক—?'

'না কিছু না।' সুজন সিং সামলে নেয়। অনুভব করে সে স্বীকার না করলেও তার সর্বাঙ্গ, এমন কি মনেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে বার্ধক্যের অংকুশাঘাত আরম্ভ হয়েছে, তাই আকস্মিক উষ্মা। ইতিপূর্বে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও সে প্রৌঢ় বয়েসের সুদৃঢ় মনোবলের সাহায্যে সেইসব দুরূহ ঘাঁটি পার হয়ে গেছে। বিপদ প্রীতমের, তার পাশে মুণ্ডে কল্‌দীপ আছে, তারাই এ থেকে উদ্ধারের পন্থা খুঁজে নিতে পারবে, তাতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে বিপদের জালটাকে সে আর ভারাক্রান্ত করবে না।

অমৃত কাওরের দুশ্চিন্তায় অধিক ইন্ধন না যুগিয়ে সর্দার সুজন সিং দরাজ গলায় বলে, 'শেরী, তিনটে গ্লাস আর প্লেট নিয়ে আয়। হুইস্কি স্যাম্পেন কোথায়, তাদেরও ডাক।'

ডক্‌টর সেনশর্মা আজ গাড়ি নিয়ে য়ুনিভারসিটি আসেননি, একটা পরিকল্পনা রচনা করে তারই সিদ্ধি উপায়স্বরূপ রিক্সায় এসেছিলেন। পরিকল্পনাটি অনুলেখা। শিকারের ছিপ নানাভাবে খেলিয়েও তিনি নাগাল পাচ্ছেন না। প্রথম দিকে নম্র ব্যবহারের ঢিলে সুতো ছেড়েছিলেন অনেকখানি, ক্লাশে লেকচারের সময় অনুলেখাকেই মুখ্য করে রাখতেন, 'এনি ডিফিকালটি, মিসেস ডাট্‌?'

অনুলেখা ঘাড় নাড়ত, কিন্তু এতই ক্ষুদ্র যে, সে মুদ্রা দিয়ে তার বোধ্যতা বা অনুধাবনের অক্ষমতা কোনো ভাবই চিহ্নিত হত না। ডক্‌টর সেনশর্মা অবশ্য বুঝতেন, তাঁর বক্তৃতার তথ্যতাৎপর্য গ্রহণ করা অনুলেখার সাধ্যাতীত। বিশেষত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হলেও সে বাস্তবিকই পড়তে আসেনি। ক্লাশের অধিবেশনে নিজেকে অল্প-বিস্তর জাহির করে যাওয়া ভিন্ন তার অন্য উদ্দেশ্য নেই। তারপর শেষাবধি যদি একটা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি উপরি আয় হয়ে যায়, তাই বা মন্দ কি!

অনুলেখার অন্তরতম মনের ভাব আন্দাজ করতে ডক্‌টর সেনশর্মার দেরি হয় না, কিন্তু তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তার মধ্যে একটা উচ্চাশার প্রজনন দরকার। তাকে প্রতিনিয়ত অনুভব করানো, মেধা-মগজ থাক-না-থাক, এখান থেকে বেরুবার সময় একটা উঁচু সম্মান নিয়ে যেতে হবে। এবং এ সফলতা অর্জনের জন্যে যে জিনিসের পুঁজি প্রয়োজন তা তার আছে।

'এ্যাম আই ক্লিয়ার টু য়্যু, অনুলেখা?'

অনুলেখার নাম ধরেও ডক্‌টর সেনশর্মা মাঝে মাঝে সম্বোধন করেন, ক্লাশে একটা চাপা হাসি তরঙ্গায়িত হয়ে যায়। স্নিগ্ধ ব্যঙ্গের ধারা প্রবাহ। হাঁদাহোঁদা ল্যাপামোছা মেয়ে দুটি পরস্পরের গা টেপাটিপি করে, তদধিক বেআদবি করে না কেউ। কারণ পোস্ট-

গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এ্যানথ্রপোলজির একেশ্বর ডক্টর স্মৃতিময় সেনশর্মা। সাতটি পত্রের আগমনসম্ভব সবক'টি প্রশ্নের উত্তর কণ্ঠস্থ থাকলেও বা থিসিস পেপারে দুনিয়ার সমস্ত মালমসলা উজাড় করে ঢেলে দিলেও, যদি কোনো ছাত্র সম্পর্কে তাঁর ললাট ভ্রূকুটিময় হয়ে ওঠে সেই ভ্রূকুটি তার খণ্ডিত ভাগ্যের নিদর্শন বলেই পরিগণিত হবে।

'এ্যাম আই ক্লিয়ার টু য়্যু, অমলেখা ?'

'ইয়েস স্যার', অমলেখা দাঁড়িয়ে ওঠে, এক নিমেষের জন্যে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকায়, পরক্ষণেই ঘরের মেঝের দিকে।

ডক্টর সেনশর্মা লক্ষ্য করেন অমলেখার মুখে লজ্জাঘর্ম, মুখের সুগৌর ত্বক বিদীর্ণ করে রক্তিমাভা বিচ্ছুরণ। এটা ক্রোধ অথবা বুঝতে না পারার লজ্জানির্দেশ তা তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না। এরজন্যে নিজেই কতকটা বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁর অভ্যস্ত শিকারী হাত মুহূর্তের জন্যে ব্যর্থতার অপযশে শিথিল হয়ে আসে।

তখন ডক্টর সেনশর্মা বলেন, 'বেশ, আপনি বসুন, একটু মন দিয়ে শুনুন, ঠিকই বুঝতে পারবেন।' তারপর কতকটা প্রাসঙ্গিক এবং কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেন, 'বেসিক প্রিন্সিপল তো আপনি বুঝতে পেরেছেন, তাহলে আমার এ্যাপ্রোচটাও পারবেন।'

অমলেখা মাথা নিচু করে থাকে, প্রথম সারিতে মেয়েরা বসে, অর্থাৎ ডক্টর সেনশর্মার মুখোমুখি এবং অদূরেই। তিনি লক্ষ্য করেন এখনো ঘামছে অমলেখা, এখনো তার মুখ লাল হয়ে আছে।

তারপর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনের কথা ভুলে, এইমাত্র যে বিষয়টির আলোচনা হয়েছিল, ক্লাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডক্টর সেনশর্মা তারই পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু সেদিনকার মতো অমলেখাকে আর ঘাঁটান না।

এইভাবে ছ'মাস উত্তীর্ণ হয়েছে, অথচ যে উদ্দেশ্যে ডক্টর সেনশর্মা অমলেখাকে ডিপার্টমেণ্টে ভর্তি করেছিলেন তা অসফল রয়ে গেছে। পূর্ববর্তী কোনো ক্ষেত্রে এতটা সময় ব্যয় হয়নি। তাঁর দিক থেকে যথেষ্ট ইঙ্গিতই অমলেখার কাছে পৌঁছেছে, এমনকি

তাকে ডিপার্টমেন্টে আনবার আগে কৌতুক করে বলেছিলেন, 'সত্যি এমন রসকষহীন বিষয়ের অধ্যাপনা করি যে, একটুও ভাল লাগে না, আপনি আমাদের এখানে এলে খানিকটা এনার্জি পাব।'

তখন অনুলেখা তাঁর এই চাটু-কৌতুক বেশ উপভোগ করেছিল, 'তাহলে তো আমাকে ছ'বছর পরে আবার ছাত্রীজীবনে প্রবেশ করতে হয়, নয়তো শেষে আপনাদের ডিপার্টমেণ্ট হয়তো উঠেই যাবে।'

এখন কিন্তু ডক্টর সেনশর্মার মনে হতে আরম্ভ করেছে, অনুলেখার বাইরেটা যতই তপ্ত-প্রকাশ হোক ভেতরটা শীতল, নয়তো শিলাদিত্যর সঙ্গে বনিবনা নেই কেন। ছোকরা দেখতে-শুনতে তো ভালই, কোনো যুবতী নারীর জীবনের সব কামনা পূর্ণ করতে না পারুক, বয়েসের মূল চাহিদা মেটাতে পারে নিশ্চয়ই। দাম্পত্য জীবনের অন্যান্য হিসেব তো যৌবনের খরা আসার পরই সুরু হয়, এদের তা ইতিমধ্যেই এসে পড়ল নাকি!

যাই হোক শেষপর্যন্ত না দেখে ডক্টর সেনশর্মা স্বস্তি পান না, তবে শিকারের পদ্ধতিপন্থা পরিবর্তন করেন। কিছুদিন যাবৎ অনুলেখাকে আমল দিলেন না মোটেই। তার সম্বন্ধে তিনি ভ্রূক্ষেপহীন। তাকে বাদ দিয়ে পাশের মেয়ে দুটিকে প্রশ্ন করেন, সারা ক্লাশের সমস্ত ছাত্রদের লেখাপড়া সুবিধা-অসুবিধার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু অনুলেখা কি বলে-না-বলে তা শোনার প্রতীক্ষা করেন না। অর্থাৎ ব্যবহার ও সম্বোধনের চাতুর্যে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েও দেখেন তিনি।

সেদিন নিঃশব্দে ক্লাশে এলেন ডক্টর সেনশর্মা। ঘণ্টা শেষ হওয়ার পর একজন অধ্যাপকের বিদায় এবং পরবর্তীর প্রবেশের কিছুটা সময়, যে অবসরে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে খানিকটা হৈ-হুল্লোড় করে নেয়, ঠিক সেই সময়টাতে তিনি এসে ঢুকলেন।

'মিসেস দত্ত, আপনি যদি এমন অভব্য আচরণ করেন, তাহলে

আমার ক্লাশের সময় আমি আপনাকে বাইরে থাকবার জন্যে বলতে বাধ্য হব।'

ডক্‌টর সেনশর্মার ভৌতিক আবির্ভাব প্রায় কোনো ছাত্রেরই চোখে পড়েনি, তাঁর আচম্বিত উচ্চকণ্ঠ ও শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য অনুলেখা ছাড়াও তাদের প্রতিজনকে বিস্মিত করে। আকস্মিক আঘাতে হতচকিত অনুলেখা বিপর্যস্ত। ভীতি ও ব্যথাময় চোখ তুলে ডক্‌টর সেনশর্মার দিকে তাকায় একবার, তারপর চোখের জল রোধ করার আপ্রাণ চেষ্টায় অসফল হয়ে অধ্যাপকের অনুমতি না নিয়েই ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

পেছন সারির বেঞ্চ থেকে কোনো এক দর্পী ছাত্রের চাপা তর্জন ডক্‌টর সেনশর্মার কানে ভেসে আসে, 'ইন্‌হিউম্যান!'

ডক্‌টর সেনশর্মা গ্রাহ্য করেন না, কর্তব্যে মনোনিবেশ করেন অচিরেই। পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যের মধ্যে পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাশ আরম্ভ হয়। কিন্তু আজ পাশার একটি মোক্ষম চাল চেলে ফেলেছেন তিনি। কণ্ঠস্থ গৎ-এর মতো আওড়ে গেলেও তাঁর মনের সমগ্র এবং শততম অংশ অনুলেখাতেই লিপ্ত হয়ে আছে। অনুলেখার শখের পড়া, জীবন-সংগ্রামের প্রশ্ন নয়, এর পর সে কি ক্লাশে আসবে? তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপকের এত হঠকারী হওয়া উচিত হয়নি। অনুলেখাকে আরো কিছুটা আত্মপ্রস্তুতির অবসর দেওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক একজন পুরুষের বিবাহিতা রমণী, তার দেহ-মনের অপ্রাপ্তি ও অনাস্বাদজনিত বুভুক্ষা না থাকাই স্বাভাবিক—সব শিকার কি একই টোপে গাঁথা যায়।

দ্বিতীয় দিক দিয়েও তিনি বিচার করেন, অনুলেখা দত্তর মতো একটি বিচিত্র তেজদর্পিণী মেয়েকে আয়ত্তে আনতে হলে নিপীড়ন পন্থাই কার্যকরী, নয়তো সে তার মেকি আভিজাত্যের অভিমান নিয়ে চিরদিনই দূরে থেকে যাবে। তার ভুয়ো চটকের ব্যক্তিত্ববিম্ব ঝরিয়ে দিতে পারলেই সে তাঁর কামনার ঝাঁপিতে প্রবেশ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। এই শ্রেণীর মেয়েকে

বাঁশীর সুরে বিমোহিত করার আগে সাঁড়াশির কবলে আনা দরকার।

ছুটির পরও ডক্টর সেনশর্মা বাড়ি ফিরলেন না, নিজের একান্ত-কক্ষে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে পরীক্ষার খাতায় মনোনিবেশের ভান করে বসে রইলেন। মনের উৎকর্ণ ভাব বাইরে প্রকাশিত হতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যাশা সফল হল, বেয়ারা স্লিপ নিয়ে এল। ডক্‌টর সেনশর্মা জানেন, অম্বুলেখা দত্ত ছাড়া আর কোনো নাম ও স্লিপটাতে থাকতেই পারে না।

'আসতে বল।' অনুমতি দিয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা খাতা দেখে চলেন।

ঘরে ঢুকে অম্বুলেখা ছুটি-হাত জোড় করে নিজের বুকের কাছে তুলল, 'নমস্কার স্যার।'

'নমস্কার, বসুন।'

অম্বুলেখাকে বসবার নির্দেশ দিলেও ডক্টর সেনশর্মা বিশেষ কোনো চেয়ার দেখিয়ে দিলেন না, অনুশোচনা-রহিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, ছুটি চোখে কৌতূহলহীন সাধারণ জিজ্ঞাসা।

অম্বুলেখা বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। ডক্টর সেনশর্মা তাঁর চোখের দৃষ্টি সাধারণ করে রেখেছেন কিন্তু অন্তঃপ্রেরিত দৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছেন তার দেহ-মনের সর্বত্র। অম্বুলেখা সুন্দরী বটে কিন্তু মাথার চুলে স্বল্পতাচিহ্ন বর্তমান। মনে হয় তার বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর মতো অতবড় খোঁপাটায় প্রচুর গোঁজামিল আছে। মুখ খুবই ধারালো, কিন্তু থুতনীর নিচে দ্বিতীয় প্রস্থ মেদসঞ্চয় হয়েছে। শরীর দীর্ঘাঙ্গী তবে ঐ দৈর্ঘ্যের ওপর প্রস্থও আক্রমণোদ্যত। গাত্রবর্ণে রাসায়নিক দ্রব্যাদির পালিশ থাকলেও প্রকৃত রংটুকু বাস্তবিকই ফর্সা। বাকি থাকে দেহের লোভনীয় ও প্রয়োজনীয় অংশগুলির মূল্যমর্যাদা নিরূপণ। ওগুলি গভীর তৃপ্তি দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বলেই মনে হয়, তবে গতানুগতিক সুখ বিতরণের ক্ষমতা এখনো আছে। একটা পুরনো রসিকতা ডক্টর সেনশর্মার মনে

পড়ল, ছাত্রাবস্থায় পথঘাটে মেয়েমিছিল দেখে তাঁরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন গুড ফর ব্যাড পারপাসেস্। মন্দ কাজের উপযোগী ভাল জিনিসই বটে। সবদিক বিশ্লেষণ করে ডক্‌টর সেনশর্মা স্থির করেন অনুলেখার প্রকৃত জীবনের মেয়াদ বড়জোর তিন-চার বছর, অবশ্য তাঁর নিজের প্রয়োজন তার অর্ধেক।'

ডক্‌টর সেনশর্মা জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ', অধ্যাপকের দিকে সরাসরি দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুলেখা বলল, 'আমায় ওভাবে অপমান করলেন কেন স্যার, আমি কি দোষ করেছিলাম?'

'না, দোষ এমন কিছু নয়, গোলমাল করছিলেন—তবে আমি আপনাকে অপমান করিনি, বকেছিলাম।' এতখানি গম্ভীর স্বরে বলে যাওয়ার পর ডক্‌টর সেনশর্মা অনুলেখাকে আবার উঁচু করে তুলে ধরার প্রয়াস দেখালেন, 'অবশ্য প্রায় সকলেই গোলমাল করছিল, কিন্তু আপনাকে বিশেষ করে বলার উদ্দেশ্য আমি চাই ছাত্র-ছাত্রীরা আপনাকে দেখে ম্যানার্স শিখুক।'

এই একটি কথাতেই যেন অনেকখানি মেঘ অপসারিত হয়ে গেল, এখন অনুলেখার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি খানিকটা উদার ও অভিমানী, 'আমি কি ক্লাশের মনিটার?'

'বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?' ডক্‌টর সেনশর্মা এবার একটি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে অনুলেখাকে বসতে অনুরোধ করলেন, তারপর, বললেন, 'আপনি অত্যন্ত ছেলেমানুষ, আমার কিন্তু মনেই ছিল না আপনাকে বকেছি।'

অনুলেখা বসল বটে কিন্তু বলতে ছাড়ল না, 'আপনার মনে ছিল না, কিন্তু ক্লাশসুদ্ধ সবার মনে আছে, তারা কোনোদিন ভুলবে না আপনি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার অপমানের কথা কেউ ভুলবে না।'

ডক্‌টর সেনশর্মা মৃদু হাসি হাসলেন, 'ভুলবে বইকি, যেদিন আপনি ফার্স্টক্লাশ নিয়ে এখান থেকে বেরুবেন সেদিন ভুলবে। না,

সেদিন তারা ভাববে, মিসেস দত্তর বদলে আমি কেন বকুনি খেলুম না।'

অমুলেখা যেন এক মুহূর্তের জন্য বাক্যহারা হয়ে রইল, তারপর বলল, 'তাই নাকি? কিন্তু কাল থেকে আমার পক্ষে ক্লাশ করা সম্ভব নয়, আপনি আমায় জোর করে ভর্তি করেছিলেন তাই আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, আমি আর পড়ব না।'

ডক্‌টর সেনশর্মা চুপ করে রইলেন, পাশার চাল ব্যর্থ হয়নি। এখন কিছুটা আগ্রহ কিছু নিস্পৃহা মিশ্রিত কথা বলে অমুলেখাকে করায়ত্ত করতে হবে। আজ অবশ্য তিনি স্পর্শের মধ্যে টানবেন না তাকে, অন্য এক অবসরের জন্য এটি মুলতুবি রাখবেন। ইতিমধ্যে তার চেতনায় নিজের অস্তিত্বের খানিকটা শেকড় ছড়িয়ে দিতে পারাই যথেষ্ট।

অমুলেখা বলল, 'যাচ্ছি।'

'অনুমতি পেয়েছেন?'

'মানে?'

'অমুলেখা', ডক্‌টর সেনশর্মা তার নাম ধরে সম্বোধন করেন, কিছুটা বিরতি দিয়ে বলেন, 'আপনাকে বকেছি তার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, ওভাবে ক্লাশের অপর কাউকে বলতে পারতুম না। কিন্তু আপনাকেই বা বললুম কেন তা আমি জানি না। মানুষের মনে একান্ত অকারণেই এক-একজনের সম্বন্ধে অধিকারবোধ জন্মে যায়, কেন জন্মায় তাও আমি জানি না।'

ডক্‌টর সেনশর্মার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অমুলেখা তাঁর কথা শুনছিল, এতদিন লক্ষ্য করেনি আজ দেখল, ঐ উজ্জ্বল চোখদুটিতে গভীর বিষণ্ণতার ছায়া, স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখী মুখ যেন একটু ক্লিষ্ট। তার মনে হল সে যে বিশেষভাবে ডক্‌টর সেনশর্মাকে লক্ষ্য করছে তা তিনি ধরে ফেলেছেন, বোঝা মাত্রই সে চোখ নামিয়ে নিল।

ডক্‌টর সেনশর্মা বললেন, 'চা আনতে বলি?'

'না', অমুলেখা উঠে দাঁড়াল, 'কাল থেকে আমি আর আসব না।'

'আপনার আসা বা না-আসা কি আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে?'

অনুলেখা ঠোঁট কামড়াল, 'আপনি আমায় এনেছিলেন তাই—'

'এখন বোধ হয় আপনার মনে হচ্ছে আমার অন্যায় হয়েছিল?'

অনুলেখা বিব্রত হয়ে পড়ে, জবাবটা হ্যাঁ অথবা না কোন্ দিকে দেবে স্থির করতে না পেরে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে বলে, 'তা ঠিক নয়।'

আর না এগিয়ে ডক্টর সেনশর্মা আজ এখানেই ছেদ টানেন, 'যতদিন না বুঝতে পারছেন কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা নয় ততদিন পর্যন্ত আমি আপনাকে আসতেই বলব।'

স্তব্ধ বিস্ময় ও পুলকিত সন্দিগ্ধতার মাঝে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার পর অনুলেখা বলে, 'আজ তাহলে যাই স্যার?'

'হ্যাঁ, শুধু আজকের মতো।' অনুলেখার দিকে না তাকিয়েই ডক্টর সেনশর্মা কতকটা অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দেন।

অনুলেখার কপালে একটা ক্ষুদ্র ভ্রূকুটি ফুটে উঠল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক নিমেষের জন্য ডক্টর সেনশর্মার মুখের দিকে তাকাল সে, কিন্তু সেখানে কোনো অভিসন্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। থাকলেও তা একান্ত নির্দোষ। হয়তো তাঁর ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ হৃদয়ের এক ধরনের আকুতি যা কোনোমতে অপরাধের তালিকাভুক্ত হতে পারে না।

তেরো

ডক্‌টর সেনশর্মা হাঁটা-পথে বাড়ি ফিরছেন। রাস্তাটা কাঁচা। আমবাগানের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ, তবে দূরত্ব সংক্ষেপ করার জন্যে বাগানের কোল মাড়িয়ে দু'-চারটে রিক্সা যাওয়া আসা করে। য়্যুনিভারসিটির ছাত্ররা সাধারণত এই পথ দিয়েই সাইকেল ছোটায়।

প্রথম প্রথম দেশলাইবাক্সর মতো একটা ছোট গাড়িতে অনুলেখা য়্যুনিভারসিটি আসত, শিলাদিত্য চালিয়ে আনত। য়্যুনিভারসিটির ময়দানে দাঁড়িয়ে গাড়িটা বারকয়েক যে রকম অভব্যতা দেখিয়েছে, শিলাদিত্য গলদ্‌ঘর্ম, অনুলেখা অপদস্থ, তারপর থেকে মোটর ছেড়ে অনুলেখার রিক্সার শরণ।

অনুলেখার সঙ্গে একটা নির্জন সাক্ষাতের অভিসন্ধিবশত ডক্‌টর সেনশর্মার আজকের আয়োজন। শেষ ঘণ্টাটি পর্যন্ত অনুলেখার ক্লাশ। তার ক্লাশ শেষ হবার মিনিট দশেক আগে তিনি য়্যুনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে আমবাগানের হাঁটাপথ ধরলেন।

ডক্‌টর সেনশর্মার মনোগত উদ্দেশ্য অচঞ্চল, অথচ তিনি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। তাঁর বিয়াল্লিশ বছর বয়েস কাঁচা প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়ার নয়। এ নিঃসন্দেহ, অনুলেখার প্রতি তিনি প্রণয়াসক্ত হননি। প্রত্যেক সেসনে একটি ছাত্রীকে গ্রহণ করেছেন তিনি, তার জীবনে প্রতিষ্ঠার সূচনা এনে দিয়েছেন, বিনিময়ে সে তাঁকে ক্ষণিকের সুখ উপহার দিয়েছে। এটি না হলে নয়, জীবনমরণ সমস্যা, এমন অনুভব তাঁর হয়নি কখনো। এমন কিছু কামপ্রবণ নন তিনি, তবু নিজের মানসম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ও উচ্চ পদের বাজি রেখে এই পথে বিরাজ করছেন কেন? মনে হয় তাঁর জীবনের একটি স্থানে যে ব্যর্থতার ক্ষত আছে নৈতিক গ্লানি স্বীকার করেও তিনি বোধ হয় তার ওপর প্রতিশোধের প্রলেপ মাখিয়ে চলেছেন।

য়্যুনিভারসিটি ছাত্রদের প্রায় সবক'টি সাইকেলই পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, রিক্সাও কয়েকটি, কিন্তু প্রত্যাশিতটির সাক্ষাৎ নেই। তবে ওটিরও আগমন অবধারিত। ডক্‌টর সেনশর্মা নৈতিক চিন্তা ছেড়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছেন, উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছেন তিনি।···রিক্সাটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল, কিছুটা দূর থেকে একটা ঝরঝরে শব্দ শোনা যাচ্ছিল, থেমে গেছে হঠাৎ। সমস্ত চিত্রটাই ডক্‌টর সেনশর্মা তাঁর অনুমানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই।

'আপনি!' অনুলেখারই কণ্ঠস্বর; বিস্মিত এবং পুলকিত।

ডক্‌টর সেনশর্মা দাঁড়িয়ে পড়লেন, অনুলেখাকে কাছে আসার অবসর দিয়ে বললেন, 'আপনি যেখান থেকে, আমিও সেখান থেকেই।'

অনুলেখা ভাবল এক মুহূর্ত, ডক্‌টর সেনশর্মাকে কি তার রিক্সায় উঠতে অনুরোধ করবে, কিন্তু অধ্যাপক তাতে সম্মত হবেন মনে হয় না। যদি হন, তাও তার বৃহত্তর লজ্জা। একসঙ্গে ফেরা, অপরিসর জায়গায় গা ঘেঁষে বসা, এরপর তার পক্ষে আর যেখানেই হোক ডিপার্টমেন্ট অফ্‌ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এ্যানথ্রপোলজিতে যাওয়া অসম্ভব।

ডক্‌টর সেনশর্মার অনুমতি না নিয়েই অনুলেখা রিক্সা ছেড়ে দিল, 'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে হেঁটে ফিরি।'

'ও কি করলেন', ডক্‌টর সেনশর্মা মুখে বিস্ময়চিহ্ন ফুটিয়ে তোলেন, 'আমি কি শহরে ফিরছি এখন! তাছাড়া আপনি শুধু শুধু রিক্সা ছেড়ে দিলেন কেন, আমি রিক্সা নিইনি আজ একটু হাঁটব বলেই।'

অনুলেখা যেন তার ছাত্রিত্ব বিস্মৃত হয়ে এক বিশেষ ভঙ্গিতে বলে, 'কিন্তু বাড়ি না ফিরে আপনি এখন কোথায় যাবেন? আজ গাড়ি কোথায় আপনার, আনেননি কেন?'

আমবাগান ছাড়িয়ে নীলকুঠি, তার ওপাশে পরিত্যক্ত শ্মশান, দিগন্তপ্রসারী মাঝগঙ্গার হরিৎশোভা, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে ডক্‌টর

সেনশর্মা জবাব দেন, 'গাড়ি গ্যারাজে ভর্তি হয়েছে। তাই ভাবলুম একটু পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে নেওয়া যাক্; পরীক্ষার খাতা সিনেটের মিটিং এইসব নিয়েই তো এ যাবৎ পাগল হয়ে ছিলুম—আজ ছুটি পাওয়া গেছে।'

'ছুটি বুঝি আপনাকে নির্জনতার দিকে টানে?'

ডক্টর সেনশর্মা জবাব দেন, 'ছুটির অর্থই বিপরীত দিকের আকর্ষণ; যার যেমন কাজ ছুটিটা তার বিপরীতে ছুটতে চায়। আপনার জীবনে যদি কোলাহলের উপদ্রব থাকে আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।'

অনুলেখা হাসল, 'আপনার কথা বুঝলুম। আমার জীবনে কোলাহলের উপদ্রব না থাকলেও এখন আমায় আপনার সঙ্গেই যেতে হবে, কারণ এ রাস্তাটার তেমন সুনাম নেই, ওদিকে একটা তাড়ির আড্ডা আছে, একা বাড়ি ফিরতে পারব না।'

আয়োজনটা বুঝি ভেঙে আসছে, ডক্টর সেনশর্মা বলতে বাধ্য হলেন, 'তাহলে আমার বেড়ানো আজ বন্ধ থাক, আপনি যাতে নির্ভয়ে বাড়ি পৌঁছুতে পারেন তার ব্যবস্থা আগে হওয়া দরকার।'

এবার অনুলেখার চিন্তা করার পালা, বিব্রত হওয়ার অবকাশ, সে বাধ্য হয়ে বলে, 'না না, চলুন আমি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি; এই সুযোগে আমারও একটু বেড়ানো হয়ে যাবে।'

রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়েও ডক্টর সেনশর্মা যেন ইতস্ততঃ করেন, 'দেরি হলে আপনার বাড়িতে ভাববে না?'

অনুলেখা হাসল, ঈষৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ঈষৎ মেঘমেদুর, 'আমার জন্যে ভাবনা! আচ্ছা, আমায় দেখে আপনার কি মনে হয়, খুব সুখী, খুব নিশ্চিন্ত-নির্ভাবনা, না?'

ডক্টর সেনশর্মা বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'তাই তো মনে হয়!'

আবার একটু হাসল অনুলেখা, তারপর রহস্যময় ভাষায় বলল, 'মনে হলেই ভাল। বেশ, চলুন কোথায় বেড়াতে যাবেন, আমি তো ওদিকের কিছুই চিনি না।'

ঠিক জায়গাটিতে এসে পড়েছেন ডক্‌টর সেনশর্মা। সঙ্গে অনুলেখা। পরিকল্পনার তিলমাত্র বিচ্যুতি নেই। কোনো আকস্মিক উৎপাতে পরিবেশ বিঘ্নিত হয়নি। ইচ্ছে করলে এখনই অনুলেখার সঙ্গে নিবিড় হওয়া যায়, তার পূর্ণ সম্মতিতেই। এই জায়গাটি ডক্‌টর সেনশর্মার বিগত কয়েক বছরের স্মৃতিতে মুখর হয়ে আছে। যে একবার কোনোমতে এসেছে সে বার বার এসেছে, এবং একটি অহংকারে পরিতৃপ্ত হয়ে চিন্তা করেছে, ইতিপূর্বে বুঝি আর কেউ তাঁর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। অনুলেখা ভাববে সে নিজের জীবনের একটি আকস্মিক দুর্বল মুহূর্ত অধ্যাপককে উপহার দিয়ে গেল, কিন্তু আবার আসবে সে, আগামী ছুটি বছরের মধ্যে তাকে বহুবারই আসতে হবে, এবং প্রতিবার এই অনুভব নিয়ে ফিরবে, অধ্যাপকের বিক্ষুব্ধ জীবনে একমাত্র সে-ই এক নিভৃত পরিতৃপ্তির স্বাক্ষর। নীলকুঠির মরা শ্মশান পর্যন্ত আসতে আসতে ডক্‌টর সেনশর্মা অতি ধীর নিপুণভাবে আসন্ন পরিবেশে একাত্ম হওয়ার উপযুক্ত করে অনুলেখার মানস রচনা করে রেখেছেন। অনুলেখা এখন তার অবশ্যম্ভাবী বিবশ মুহূর্তকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে উন্মুখ।

'অনুলেখা!'

'বলুন?' এক পা এগিয়ে গিয়েছিল অনুলেখা, প্রত্যাশী ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়াল।

'বাড়ির জন্যে তোমার মন কেমন করছে না অনুলেখা?'

ডক্‌টর সেনশর্মার প্রশ্নসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুলেখার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের মতো প্রত্যক্ষ বক্রতার ঝলক দেখা গেল, তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, করছে, আমায় আপনি এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? ফিরে চলুন, আমি বাড়ি যাব। কিন্তু আমার মন কেমন করছে কি না একথা আপনার হঠাৎ মনে হল কেন?'

ডক্‌টর সেনশর্মা জবাব দিলেন না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সারাদিনের প্রচেষ্টায় তিনি আজ অনুলেখাকে নিজের জীবনে ঈপ্সিত কেন্দ্রে আকর্ষণ করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, হঠাৎ তা স্বেচ্ছায়

ভেঙে দিলেন। তাঁর বর্তমান জীবনেতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ। আপাত চিন্তায় এর কোনো অর্থই খুঁজে পান না তিনি।¯ কারণটা হয়তো আরো গভীরে নিহিত, এবং তা তাঁর সহজ অনুসন্ধান শক্তির বাইরে।

অনুলেখা বলল, 'আপনি ফিরবেন, না আমায় একাই যেতে হবে ? আমার অবশ্য ভয় করবে, কিন্তু এখানে থাকলে সবচেয়ে বেশি ভয় আপনাকেই।'

ডক্‌টর সেনশর্মা নিজের মনের মধ্যে নির্বোধ হাসি হাসছেন, বললেন, 'এখন পর্যন্ত আমায় ভয় পাবার মতো কিছু কি তুমি দেখেছ ?'

'আপনি হঠাৎ আমায় তুমি বলছেন কেন ?'

'বয়েস আর সম্বন্ধের অধিকারে।'

'কোন্ সম্বন্ধের অধিকার, সেটাতেই আমার সন্দেহ।'

'এই মুহূর্তেই তোমার সন্দেহ নিরসন করা তো সম্ভব নয়, অনুলেখা।' ডক্‌টর সেনশর্মা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলছেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অনুলেখা বলল, 'আপনার হাবভাব দেখে মনে হয় আপনি এখন সর্বদিক দিয়েই অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমার অপেক্ষা করা উচিত নয়, আমি চললুম।'

অনুলেখা আর দাঁড়াল না, কিছুক্ষণ আগে ডক্‌টর সেনশর্মা তার বইখাতা নিজের হাতে টেনে নিয়েছিলেন, সেগুলো ফেরৎ না নিয়েই সে বেপরোয়া ভ্রূক্ষেপহীন ভঙ্গিতে ফিরে চলল।

অনুলেখার সঙ্গে কিছুটা ব্যবধান রেখে ডক্‌টর সেনশর্মাও শহরের দিকে ফিরছেন, কিন্তু দায়দায়িত্বের দূরত্ব রেখে নয়। একটি পূর্ণ-যৌবনা নারীর পক্ষে এ পথের নির্জনতা বিপদময়।

ডক্‌টর সেনশর্মা একসময় সরব হয়ে ওঠেন, 'অনুলেখা, তোমার বই—'

'ফেলে দিন, আমার ছুঁতে ঘেন্না করে।'

অনুলেখার ঘৃণা নির্বিবাদে গ্রহণ করে ডক্‌টর সেনশর্মা পথ চলেন, আজকের সুখান্বেষায় হঠাৎ ছেদ টেনে দিয়ে তিনি যেন বিচিত্র অতৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছেন। এও এক ধরনের সুখাবেশ, জীবনটাকে পরিপূর্ণ বঞ্চনার অতল প্রশান্তিতে নিমগ্ন করে দেয়।

ঠিক এমনিই ঘটনা। এরও কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ ডক্টর সেনশর্মা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাননি। অথচ এই আকস্মিক দিনটি তাঁর সর্ববৃহৎ ত্যাগে চিহ্নিত।

গোটা পঁচিশ বছরকে পেছনে ঠেলে দিলে দেখা যাবে দুই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু কষ্টেসৃষ্টে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হওয়ার আয়োজন করছে। ইচ্ছে বিজ্ঞান পড়া, কিন্তু স্বল্পসংখ্যক আসন ভাল ছেলেদের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত। কোনো নবাব স্টেটের কয়েকটি নমিনেশন আছে, সেগুলি বিলি-বিক্রি হয়। ত্রিদিবের পিতা তাঁর কলংকিত কুলাঙ্গার পুত্রের জন্যে একটি নমিনেশন খরিদের ডাক দিয়ে এসেছিলেন। নবাবজাদা বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি দিনকতক পরে একবার খোঁজ নেবেন, যদি এর বেশি দাম না ওঠে তাহলে আমি আপনাকে আগে দিয়ে পরে অপরকে দেব—আমার জাতবিরেদরকে বাদ দিয়েও আপনাকে দেব।' এই প্রসঙ্গে নবাবজাদা আরো বলেছিলেন, তাঁর মোট চারটি নমিনেশন আছে, উপযুক্ত গ্রাহক জুটিয়ে দিতে পারলে ত্রিদিবেরটা তিনি বিনামূল্যে দেবেন।

ত্রিদিব-পিতা, ডাক্তার বিশ্বদীপ বসু ত্রিদিবকে বলেছিলেন, 'তোর বন্ধু, স্মৃতিময় না কি নাম যেন, ও যদি নমিনেশন কিনতে চায়, বলিস আমাকে। আমার সঙ্গে নবাবজাদার বন্ধুত্ব আছে, আমি বললে যত সস্তায় দেবে অপরে গেলে তার দেড়া হেঁকে বসবে।'

নমিনেশনের সম্ভাব্য দাম শুনে ত্রিদিব আঁৎকে উঠেছিল, 'তিন হাজার!'

স্মৃতিময়ের বাবার মাসিক বেতন বোধহয় তিরিশের বেশি নয়। তেলকলের মুহুরী, ত্রিদিবের কিশোর বয়েসের আন্দাজমতোও তার মাসিক দাম এর অধিক হতে পারে না। ত্রিদিব তখুনি পিতাকে

বলে দিয়েছিল, 'না বাবা, ওরা কিনতে পারবে না, স্মৃতিময় তো স্কুলেও 'ফ্রী ছিল।'

ডাক্তার বিশ্বদীপ ত্রিদিবের কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিলেন, 'গরীবের ছেলে, নমিনেশন কিনতে পারবে না, ফ্রী পড়বে, অথচ থার্ড ডিভিশনে টেনেহেঁচড়ে পাশ করবে ; ওটা কি গবেট্ না বদমাইস ?'

দুই-ই, গবেট তো বটেই এবং ঐ বয়েসের যোগ্য 'বদমাইসও'। ত্রিদিব কিন্তু দ্বিতীয় দোষারোপটা অস্বীকার করে প্রথমটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল 'গবেটই, নয়তো দিনরাত তো বই মুখে থাকে, পড়ে পড়ে গলায় ব্যথা হয়ে যায়, লিখে লিখে হাত জমে পাথর ; অথচ বেচারা—'

ডাক্তার বিশ্বদীপ ত্রিদিবকে ঐখানে থামিয়ে দিয়েছিলেন, 'তুইও তাই, তবে তোর না পড়ে মগজ ভোঁতা হয়ে গেছে, না লিখে হাতে বাত ধরেছে।' ছেলেকে শাসন করবার এর চেয়ে প্রশস্ত অবসর তিনি কোনোদিনই পাননি, রোগিসমুদ্র মন্থন করে রূপোর কুঁচি তোলার কাজে তিনি সদাই ব্যস্ত।

নবাবজাদার নমিনেশন কিনে ত্রিদিব বিজ্ঞান ক্লাশে গিয়ে ঢুকেছিল, তার জীবনের পথ ছকবাঁধা। কোনোরকমে ইনটারমিডিয়েট পাশ করে ভারতের যে-কোনো স্থানে একটি সদ্যপ্রসূত মেডিক্যেল কলেজে স্থূল অংকের চাঁদা দিয়ে ভর্তি হওয়া ও পাঁচ সাত দশবছরের মধ্যে বেরিয়ে এসে ডাক্তার বিশ্বদীপ বসুর মৌরসী রাজছত্রের পাশে নিজের যৌবরাজ ছত্রটি মেলে দেওয়া। তাদের চারপুরুষের বংশগত পেশায় এর ব্যতিক্রম হয়নি।

স্মৃতিময় সেনশর্মার ভাগ্য কিন্তু অনিশ্চিত। যতদিন ফ্রী হাফ্-ফ্রী যোগাড় হবে ততদিন তার পড়ার বাবুয়ানি। তার মধ্যে বাবা মাঝে মাঝে তাগিদ দেবেন, 'অমুক জায়গায় বলে রেখেছি, ঢুকে পড়, পরে একটা ভাল চাকরি বেছে নিলেই চলবে, হাতেরটা ছাড়িস কেন ?' তাগিদটা জোর হবে যখন স্মৃতিময় খাতা কেনবার পয়সা চাইবে। বই কিনে পড়ার কথা সে স্বপ্নেও স্থান দেয় না। তবে এদিকে তার বিশেষ

মাথা ব্যথা নেই, স্কুল-কলেজে বই-টই পড়ানো হয় বলে শুনেছে সে, কিন্তু তা যে নিজেরও পড়ার দরকার হতে পারে, এ ধারণা তার আজও জাগেনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতায় কি লিখেছে না লিখেছে তা সে নিজেই জানে না, পরীক্ষকরা কিছু কিছু নম্বর দিয়েছেন—ভরা পৃষ্ঠা দেখেই। অর্থাৎ স্মৃতিময় সেনশর্মার কলেজে পড়ার উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ জীবনের অবধারিত কাঠিন্য যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মাস দুই পরে ত্রিদিব আর্টস ক্লাশে এসে ঢুকল, স্মৃতিময় জিগ্যেস করল, 'তুই আজ ভেড়ার পালে ভিড়ে গেলি যে?'

ত্রিদিব হাসল, 'সাইন্স ছেড়ে দিয়েছি।'

'সত্যি!'

'একটু পরেই দেখবি, আমার নাম ডাকবে।'

'কেন রে, সাইন্স ছাড়লি কেন?'

'তুই-ই বল না, কেন?'

ত্রিদিবের বন্ধুত্বের ওপর স্মৃতিময়ের গভীর আস্থা, সে জবাব দেয়, 'তুই আজ এখানে এসেছিস, কিন্তু যেদিন গিয়ে সাইন্সে ঢুকলি আমি সেদিনই জানতুম তুই চেঞ্জ করে ফিরে আসবি। সাত বছর আমরা একসঙ্গে ঘর করেছি, সাতপাকের বন্ধনের চেয়েও তা বেশি, কতদিন ছাড়াছাড়ি থাকতে পারে? আমার বাপের টাকা থাকলে আমি শুধু তোর সঙ্গে বসবার জন্যেই সাইন্স নিতুম।'

'তোর জন্যে, কেন তোর আমার কি কলেজের বাইরে দেখাসাক্ষাৎ নেই? এখানে একটি টপ্ ট্রেড্ আছে, তাই আমি হেথা।'

এবার হাসল স্মৃতিময়, 'ওঃ, তাই বল, তুই শেয়ার নিতে এসেছিস?'

'মানে, এর মধ্যেই বুকড্ নাকি?'

'হুঁ।'

'কে রে শালা, আজই তার নাইটহুডের টুয়েলভ ও' ক্লক করে দিচ্ছি, সে পত্নীস্থ ভ্রাতাকে কাল নাকে পাংচার নিয়ে ক্লাশে আসতে হবে।' ত্রিদিব কথার শেষে ঘুঁষি পাকায়।

স্মৃতিময় নিজের দিকে আঙুল দেখায়।

ত্রিদিব বলে, 'তোর সঙ্গে আমার অন্য রিলেশন, এখন ফিফটি ফিফটি, তারপর কলেজ ছাড়ার সময় টস করে একজন তুলে নিয়ে যাব। একটা ট্রেড্ নিয়ে তো আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে পারি না?'

স্মৃতিময় বলে, 'তা তো ঠিকই!'

টপ্ ট্রেড্ রমা সরকার। দু'মাসে মাত্র এইটুকুই আবিষ্কার করতে পেরেছে স্মৃতিময়। বাকি পরিচয়ও অল্পবিস্তর জানে বটে, কিন্তু তা নবাববাড়ির পোলাও-কালিয়ার মতোই, আঘ্রাণেই সীমাবদ্ধ, আস্বাদ নেওয়ার স্পর্ধা বাতুলতা।

ত্রিদিব প্রস্তাব করে, 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে, এতদিন তো শিব্‌স ফাদারকেও টের পেতে দিসনি?'

'আলাপ করানোর কথা কেন বলছিস, আধখানা তো তোরই হাতে তুলে দেব ভেবে রেখেছি।'

'কবে?'

'আজ বিকেল পাঁচটায়।'

'বেশ', বলেই ত্রিদিব বলে, 'না, আজ বিকেলের দিকে হবে না। উঁহু, এ মাসের মধ্যেই নয়। আজ ম্যাচ, কাল ম্যাচ, পরশু— চল না বরং সন্ধ্যের পরেই ওদের বাড়ি যাই?'

স্মৃতিময় বলে, 'আমার ফাদারকে তুই জানিস না! কারখানা থেকে ফিরে আমায় দেখতে না পেলে ওল্ড ম্যান চোখে অন্ধকার দেখবে, ফলস্বরূপ আগামীকাল আমায় খঞ্জ অবস্থায় কলেজে আসতে হবে।'

'ওয়েল, হোয়াটস্ দেয়ার, তোমরা গল্প করছ কেন?'

ত্রিদিব চাপাস্বরে বলে, 'কি পড়াচ্ছে রে পাঁঠা দি গ্রেট, অমন উৎকট শব্দে চেঁচাল কেন? যেন কে ওর গলাটা হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে!'

মুখ নিচু করে স্মৃতিময় জবাব দেয়, 'ছোকরা প্রায়ই তো

ক্লাশ নিতে আসে, কি পড়ায় তা কে জানে—লজিক ইকনমিকস।'

'ছোঃ, ওসব আবার সাবজেক্ট? লজিকের মাস্টার প্রফেসর, ফতুয়ার হাই কলার! কথায় আছে না, ক্রো-র ড্যাস হইল ভূমিতে লুটায়ে গেল?'

এরপর প্রচণ্ড হাসিতে স্মৃতিময় ভেঙে পড়ে। ক্লাশসুদ্ধ ছাত্র সেই আকস্মিক হাসিতে সংক্রামিত হয়ে হাসতে আরম্ভ করে। অধ্যাপকের পড়ানো স্থগিত। স্তব্ধ। টপ্‌ ট্রেড্‌ রমা সরকার ও আরো চারজন ছাত্রী ত্রিদিব-স্মৃতিময় জুটির দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

'বোথ অফ্‌ য়ু্য গেট আউট ফ্রম মাই ক্লাশ। আই সে, গেট আউট এ্যাট ওয়ান্‌স!'

স্মৃতিময় উঠে দাঁড়াল, তারপর ত্রিদিব।

'তোমার রোল নম্বর কত?'

'এইটটিসেভেন, স্যার।'

'তোমার সাতটা লেকচার কাটা গেল, যাও, এখন ক্লাশ থেকে বেরোও।'

ত্রিদিবও বেরিয়ে যাচ্ছে, অধ্যাপক জিগ্যেস করলেন, 'পালাচ্ছ কোথায়, তোমার রোল—?'

'আমি আজই ভর্তি হয়েছি স্যার, এখনো রোলকল হয়নি।'

অধ্যাপক ত্রিদিবকে ঠাওর করবার চেষ্টা করেন, 'তুমি তো কলেজ টীমে ব্যাক থেকে খেল?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তবে আজই ভর্তি হয়েছ মানে?'

'আগে সাইন্সে ছিলাম, আজ চেঞ্জ করে আর্টসে এসেছি।'

'তুমি হেসেছিলে?'

'আমি কোনোদিনও হাসি না স্যার, তাই আমার ডাকনাম রামগরুড়।'

সারা ক্লাশে একটা চাপাহাসির কোলাহল ছড়িয়ে পড়ল, অধ্যাপকও বাদ গেলেন না।

'অল রাইট, য়্যু মে সীট, বাট য়্যু গেট আউট।'

স্মৃতিময় বেরিয়ে গেল, আর সেইদিন থেকে ত্রিদিব বসু ক্লাশের নায়ক।

কিশোর বয়েস সম্বন্ধে নিঃসন্দেহতার খোলা দরজা দিয়ে ত্রিদিবই স্মৃতিময়কে টপ্ ট্রেড্ রমা সরকার পর্যন্ত পৌঁছে দিল। "আজ তোকে এক গেলাস জল খাওয়াবার নাম করে বৈঠকখানায় নিয়ে এলুম, নেক্সট্ উইকের মধ্যে মিসেস সরকারের কিচেন। দেখ সিতে, মাসিমা-টাসিমা বলিস না খবরদার, সবাই এঁকে মেম-সাহেব বলে।'

তারপর টপ্ ট্রেড্ রমা সরকারের সঙ্গে আলাপ, স্মৃতিময় কথা বলতে পারল না, বিনা পিপাসায় এক গেলাস জল শোষণ করা সত্ত্বেও তার গলা একেবারে শুকনো।

রমা বলল, 'ত্রিদিব তোমার ফার্স্ট ফ্রেণ্ড, কিন্তু ত্রিদিব কেমন স্মার্ট-হিউমারাস আর তুমি লাজুক।'

স্মৃতিময় জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

রমা জিগ্যেস করে, 'তোমাদের মধ্যে লেখাপড়ায় কে ভাল?'

পার্থক্য উনিশ-বিশ, কে উনিশ কে বিশ পরীক্ষকের মর্জিতেই সে মান নির্ধারিত হয়। কখনো ত্রিদিব কখনো স্মৃতিময়। কিন্তু হালফিল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনদাঁড়ির সওয়ারী হয়ে এসে কলেজে ঢুকলেও স্মৃতিময়ের সাকল্য নম্বর ত্রিদিবের চেয়ে বেশি।

টপ্ ট্রেড্ রমা সরকারের প্রতিটি কথায় ত্রিদিবকে অগ্রণী করে দেখানোর চেষ্টা, এইবার হয়তো তার খেলাধুলোর কথা উঠবে— ফুটবল হকি ক্রিকেট থেকে বক্সিং ওয়েট লিফ্টিং—ত্রিদিব যেখানে একছত্রাধিপতি। তাই এ প্রসঙ্গ ওঠার আগেই গলার শুকনো

ভাবটা থাকা সত্ত্বেও স্মৃতিময় সজোর কণ্ঠে রমার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করে, 'ত্রিদিব বরাবরই আমার চেয়ে রেজাল্ট খারাপ করে।'

ত্রিদিব কাছে দাঁড়িয়ে, অর্ধাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্মৃতিময়কে এখানে এনেছে, তাকে রমা সরকারের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সমীপ করে দেওয়াটা সে নিজের নৈতিক কর্তব্য মনে করে বলে, 'সিতু ইচ্ছে করলে ফার্স্ট ডিভিশনে যেতে পারত, কিন্তু আমার চেয়ে দূরে ছিটকে যাবে এই ভয়ে অর্ধেক কোশচেনের উত্তর না লিখেই খাতা ফেরত দিত।'

টপ্ ট্রেড্ রমা সরকার বিশ্বাস করে না, তার সর্বাঙ্গে হিল্লোল তুলে অবিশ্বাসের হাসি ছিটকে আসে, 'তা আবার কেউ করে নাকি ?'

ত্রিদিব গম্ভীর হয়ে বলে, 'এ তো কিছুই না, আমার জন্যে সিতু লাইফ পর্যন্ত দিতে পারে।'

'আর সিতুর জন্যে তুমি ?'

'আমিও।'

বাইরে এসে ত্রিদিব বলল, 'দেখ সিতু, তুই রামখচ্চর, তবু তোকে আমি কতখানি লিফ্‌ট দিয়ে এলুম ! কিন্তু একটা প্রমিস কর্, কখনো পারসেন্‌টেজ বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করবি না ?'

'কিসের ?'

'এই এক-আধটা কিস ছাড়া আর কিছু করবি না ?'

লোভলোলুপ ঠোঁট চেটে, সদ্যজাগরিত ইচ্ছেটাকে গলাধঃকরণ করে নিয়ে স্মৃতিময় বলে, 'ও কি আমায় দেবে ?'

'দেবে না মানে !'

'তোকে দিয়েছে ?'

'না, তবে দেবে ; আমায় দেবে, তোকেও দেবে।' ত্রিদিবের কথায় আঠারোআনা আত্মবিশ্বাসের শিলমোহর।

নির্জীব অথচ আশাপ্রবণ স্মৃতিময় ত্রিদিবের ডান হাতটা চেপে ধরে, 'তুই সত্যি বলছিস দিবু ?'

'একটা মেয়ের কিস নেওয়া এমন কি শক্ত কাজ? যে ত্রিদিব বোস সতেরো বছর বয়েসে য়্যুনিভারসিটি ব্লু, তার কাছে এ তো এ পিন্‌চ অফ্‌ স্নাফ্‌।' ত্রিদিব টক্‌ টক্‌ তুড়ি বাজায়।

যা হোক ত্রিদিবের সুপারিশের সিঁড়ি বেয়ে স্মৃতিময়কে রমা সরকারের কাছে এগুতে হয়নি। বরং আধাআধি বখরার খেলায় দুই সরিকের বাঁটোয়ারা ও ভাগাভাগি যথাচুক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বে রমা যেন স্মৃতিময়ের প্রতিই একটু বেশি আসক্ত।

ত্রিদিব বলে, 'রমা তোকেই ভালবাসে সিতু।'

স্মৃতিময় প্রতিবাদ করে, 'না, তোকে—তোকে রোজ কিস দেয় আজকাল বরং আমায় দিতে চায় না।'

ত্রিদিবের মনের মধ্যে অন্যমনস্কতার ভাঁজ পড়ে, অন্তর্মুখী স্বে সে বলে, 'রমা পছন্দ করে না আমি ওদের বাড়ি যাই, মেলামেশ করি, কিন্তু আমাদের বন্ধুবিরোধ চায় না বলেই আমি গেলে একা ছুঁতে টুঁতে দেয়—তবে মন থেকে নয়।'

স্মৃতিময়ের বিশ্বাস হয় না, বরং তার অভিজ্ঞতায় অন্য এক চি অধিকতর উজ্জ্বল ও বিশ্বস্ত। রমা সরকারের বাবা এম. এন. সরকা সাবডিভিশনাল অফিসার। 'লোকটা মাল-ঝাল টানে বটে, কি খুবই অনেস্ট আর সরল প্রকৃতি। নয়তো কোন্‌দিন চাপরাশি দি আমাদের বাংলোর ওভার বাউণ্ডারি করে দিত। ও'র মা'ও এক দি দিয়ে সুবিধের, নিজে মেম সেজে পার্টি-মার্টি করে বেড়ায়, এদি একমাত্র কন্যা যে মাটি হয়ে যাচ্ছে সে হুঁস নেই। তা এদের আবা হুঁসহাস, মেয়ের রূপ আছে, পেটে বিদ্যে আছে, বাপের টাকা আ মানখাতির আছে, তার ওপর সোসাইটি নামে এক চিড়িয়াখান গতায়াত বসবাস, একদিন দেখা যাবে একটা বড়কা কেউকেটার গল বঁড়শি বনে গেছে।' ত্রিদিবের কথাটা স্মৃতিময় একদিন ভিন্ন ভাব

রমাকে বলেছিল। তার জবাব, 'ত্রিদিব দায় এড়াতে চায়, বন্ধুর উচ্ছিষ্টে তার রুচি নেই।'

রমা কিন্তু নিপুণ হাতে খেয়া বাইছে, উভয় পক্ষ সম্বন্ধে তার সমান আগ্রহ, সমান নিস্পৃহা। তবে এক দিক দিয়ে এরা দুজনে লাভবান হয়েছে, রমার রুচিতে টিকে থাকবার জন্যে লেখাপড়াটাকে কেউ আর গৌণ করে রাখেনি। খেলাধুলোয় ত্রিদিবের কিছুটা সময় খরচ হয়, রাত জেগে সে সেই গাফিলতি পুষিয়ে নেয়। আর স্মৃতিময়ের তো দিনেরাতে অখণ্ড অবসর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রমা সরকারের বাড়ি গিয়ে তাকে একটু ছুঁয়ে আসা, কয়েকটা পাঠ্যপুস্তক ধার করে আনা, এ ছাড়া অপর কোনো চিত্তবিক্ষিপ্তকারী কাজ নেই তার।

বি. এ-তে ভর্তি হওয়ার পর রমা বলল, 'বি. এ. পড়বে, অনার্স থাকবে না, এ তোমাদের ভাল লাগে?'

স্মৃতিময় বলল, 'আমি অনার্স নেব বই কি!'

ত্রিদিব বলল, 'আমিও।'

রমা বলল, 'আমি নিয়েছি এ্যানথ্রপোলজিতে।'

ত্রিদিব বলল, 'আমাদের কলেজে এটাই তো নতুন সাবজেক্ট, ভিড় কম, আমিও নেব।'

স্মৃতিময় বলল, 'আমিও।'

রমা উঠে গেল, নিজের হাতে বাগান করেছে সে, বড় বড় গোলাপ নিয়ে এল, 'বসোরাই রোজ, একটা তোমার, আর একটা তোমার।'

'আর—?' ত্রিদিব বলল।

'আর—?' স্মৃতিময় বলল।

রমা এক-এক করে দু'জনের ঠোঁটে চুমু দিল, তারপর বলল, 'এই কিন্তু শেষ, এরপর তোমাদের মধ্যে যে এম. এ-তে সবচেয়ে ভাল রেজাল্ট করবে, তাকেই সারাজীবন ধরে দেব, একজন চিরদিনের জন্যে বাদ যাবে।'

স্মৃতিময় বলল, 'ত্রিদিব রোজ লুকিয়ে এসে নেবে।'

রমা মুখ টিপে হাসল, 'সেটি হচ্ছে না, দিন সাতেকের মধ্যে আমি কলেজ বোর্ডিংএ চলে যাচ্ছি। বাবার বদলির ডি. ও. এসে গেছে, বড় জোর আর এক মাস। তুমি কি ভাবছ স্মৃতিময়?'

'কিছু না তো!' স্মৃতিময় রমার প্রশ্ন ও কৌতূহল এড়িয়ে যেতে চায়।

জবাব দেয় ত্রিদিব, 'ধুৎ, তোর চিন্তার কি আছে, আমি কি সত্যিই তোর কম্পিটিটার—যদি তেমন দেখি পরীক্ষাই ড্রপ করে দেব। রমাকে তোর হাতে তুলে দিয়ে আমি টীম নিয়ে টুরনামেণ্ট খেলে বেড়াব, সেই হবে আমার পরম ভোগ, বৈরাগ্য।'

ত্রিদিব লক্ষ্য করে তার অঙ্গীকার শোনার পর রমার মুখটা যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্মৃতিময় দেখে রমা ম্লান হয়ে এল।

স্মৃতিময় বলে, 'আমাদের অত দূর পর্যন্ত আলোচনা করবার দরকার হবে না দিবু, কারণ বি. এ-তেই আমার শেষ।'

'কেন?'

'কেন?'

'এখানে কি এম. এ. পড়ানো হয়, তোমরা তো জানো, আমার পক্ষে বাইরে গিয়ে পড়া কখনো সম্ভব হবে না।'

ত্রিদিব হেসে ওঠে, 'তুই পাগল নাকি সিতু, রমা-ট্রফি না খেলিয়ে তোকে আমি ছাড়ব মনে করেছিস? আমাদের হু'জনের একমাস পড়ার খরচ বাবার একটি কলেরা কেস। তাছাড়া রমাও নিজের বিয়ের যৌতুক তোকে আগাম দেবে।'

উদার প্রতিশ্রুতি দেবার পর ত্রিদিব আড়চোখে রমার মুখের দিকে তাকাল, রমা খুশি হয়েছে যেন। স্মৃতিময়ও তাকাল, রমাকে কিন্তু বিষণ্ণ ও বিরক্ত মনে হল তার।

রমা বোর্ডিংএ থাকে, তার সঙ্গে ইদানীং দেখাসাক্ষাৎ খুবই কম। কলেজের দেখাশোনা না-এরই সামিল। পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে

মন্তব্য মাড়িয়ে দুঃসাহস সংগ্রহ করা স্মৃতিময়ের পক্ষে অসম্ভব। ত্রিদিব অবশ্য এ সবের ধার ধারে না, বন্ধুদের কাছে রমাকে আমাদের বউ বলে জাহির করে। 'বলছি বটে আমাদের, কিন্তু ওর সীমন্তের হাইওয়েতে সিতুই সুরকি ছড়াবে। ঐ যে কি বলে, সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর'।'

রমা একদিন আড়ালে পেয়ে ত্রিদিবকে বলেওছিল, 'তুমি এসব কথা যেখানে সেখানে বলে বেড়াও কেন, কে যেন আমার বাবাকে এ্যানোনিমাস চিঠি দিয়েছে।'

উত্তরে ত্রিদিব বলেছিল, 'নাও, নাও, এত ভণিতা করতে হবে না, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তো ক'টা বছর বলব, কিন্তু সিতু বলবে চিরকাল।'

ত্রিদিব মুখে যাই বলুক স্মৃতিময় জানে তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলছে, এ অবস্থায় ত্রিদিব যে তাকে অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করবে না তেমন ধারণা করা যায় না। তাই রমার সম্বন্ধে আপাত অবহেলার ভাব দেখিয়ে স্মৃতিময় তার সমস্ত চিন্তা-চেতনার পরিপূর্ণ অংশ পাঠ্য-পুস্তকেই ন্যস্ত করে, কিন্তু কলেজের টার্মিনাল পরীক্ষায় কোনো ব্যস্ততা দেখায় না। পরীক্ষার ফল দাঁড়াল, সর্বোচ্চে রমা, তার নিচে ত্রিদিব এবং সর্বনিম্নে, প্রায় তলিয়ে যাওয়া অবস্থায় স্মৃতিময়।

ত্রিদিব বলল, 'সত্যি, এম. এ-তে আমায় একবছর ড্রপ করতেই হবে, নয়তো স্মৃতিময় সেনশর্মা যা খেল্ দেখাচ্ছে, একদিন আমায় ওর আত্মহত্যার জন্য দায়ী হতে হবে।...তুই কি সত্যিই গাড়োল রে সিতু, এত খারাপ রেজাল্ট তোর হয় কি করে?'

আসল চমকটা বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করছিল। স্মৃতিময় পেল ফার্স্ট ক্লাশ, রমা সেকেণ্ড ক্লাশ, ত্রিদিবের ভাগ্যে অনার্সই জুটল না। রেজাল্টের কাগজ হাতে নিয়ে ত্রিদিব একচোট উচ্চহাসি হেসে নিল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুই ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিস সিতু, এতে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি রে; কিন্তু

এক জায়গায় আমার দুঃখ, তুই আমায় বিশ্বাস করিস না—এ রেজাল্ট সেটাই প্রমাণ করে দিল।'

স্মৃতিময় না-বুঝ ভান করে, 'মানে?'

'মানে বোঝাতে গিয়ে তোকে ছোট করে দেব, ত্রিদিব বোস সে ধাতু নয়। যাক, এবার তো আমাদের পাটনায় এ্যাডমিশান নিতে যেতে হবে, কবে যাবি বল, ব্যবস্থা করি?'

স্মৃতিময় বলে, 'তোর সুবিধে মতন তুই যাবি, আমার আর পড়াশোনা হবে কি না কে জানে।'

'কেন, না হবার কি হয়েছে?'

'আসল বস্তুরই যে অভাব।' স্মৃতিময় ম্লানহাসি হেসে জবাব দেয়।

ত্রিদিব আরো অবাক হয়, 'বাঃ, আমাদের তো সর্ত আছে, তোর সব খরচ আমি আর রমা দেব?'

'কিন্তু আমি তা নিতে পারব না। দেখি, মা বড় মামাকে চিঠি দিয়েছে, দু-চার দিনেই জবাব এসে যাবে, তিনি যদি সদয় হন তাহলেই—'

আহতস্বরে ত্রিদিব বলে, 'তোর সম্বন্ধে আমার ধারণা এতটা খারাপ ছিল না সিতু, রমা এখন সামনে নেই তাই বলছি, একটা মে' মানুষের জন্যে তুই কত নিচে নেমে যেতে পারিস!'

স্মৃতিময় চুপ করে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে ফেলে, 'রমা যদি কোনোদিন আমার বউ হয় সেদিন আশাকরি তুই তাকে একটা মে' মানুষ বলে কথা বলবি না?'

সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবার ত্রিদিব অনুভব করল, তার মুখের ভাষা নিঃশেষ হয়ে গেছে; সে শুধু বলল, 'সিতু—!'

রমার ব্যবহার ত্রিদিবেরই অনুরূপ, একটা শুকনো অভিনন্দন দিয়ে বলল, 'তুমি তো সকলকে অবাক করে দিয়েছ স্মৃতিময়!'

'তুমি সুখী হয়েছ?'

'তুমি ভাল, মানে খুব ভাল রেজাল্ট করেছ, সেদিক দিয়ে সুখী

বইকি ; আমাদের তিন জনের ব্যাচে তোমার পাশটাই পাশের মতন।'

'তাছাড়া কিছু নয় ?'

'আর কি ? আমি তো তোমাদের প্রতিযোগিতার পুরস্কার, এর বেশি আমার বলা উচিত নয়, তা'তে পক্ষপাতদোষ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, ত্রিদিব যদি একটু খাটত তাহলে অত নিচে তলিয়ে যেত না—তার কাছে খেলার চেয়ে বড় কিছু নেই, কেউ নেই।'

রমার বক্তব্য ও মতামত অধিকতর স্পষ্ট হতে পারে না, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু স্মৃতিময়ের অনুভবে তার সমস্ত মনটা ধরা পড়ে যায় ; ত্রিদিব এবং তার পরীক্ষার ফল ক্ষেত্রবিনিময় করে প্রকাশিত হলেই রমা খুশি হত। তার নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে ত্রিদিবের জন্যে বিশেষ গুরুত্বের ওজন চাপানো আছে।

রমা প্রশ্ন করে, 'এবার এম. এ. পড়বে তো ?'

'সেইরকম তো কথা ছিল।'

'হ্যাঁ, তা ছিল—'

রমা চুপ করে যায়, তার এ নীরবতা স্মৃতিময়ের কাছে তাকে আরো বিশদ করে তোলে। ত্রিদিব কথার মাঝে কিছুটা আভাস দিয়েছে, রমা তার নিরপেক্ষ আচরণের মধ্যেও ত্রিদিব সম্বন্ধে খানিকটা হতাশা এবং তার বিষয়ে অনাগ্রহ দেখিয়ে ফেলে সমস্ত চিত্রটা আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

অথচ এ চুক্তি ছিল না, পরস্পরকে প্রতারিত করা যেতে পারে এমন কোনো সর্ত নয়। স্মৃতিময় সেনশর্মার এটুকু নৈতিক বল আছে ; রমা এবং ত্রিদিব যদি তার কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে তারা পরস্পরকে ভালবাসে, সে সানন্দে তাদের প্রাক্তন চুক্তি থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। অধিকার পরিত্যাগ করাই অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, অতএব নিজের বিজয়টুকু প্রমাণিত হওয়ার পর তার আত্মত্যাগের ক্ষোভ থাকত না।

কিন্তু ত্রিদিব একটা উল্টো চাপ দিয়ে তাকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করল। রমার ব্যবহারও তেমনি। তাই ত্যাগের প্রশ্ন আর ওঠে না, সে সুযোগ তারা নষ্ট করেছে। আপাতত সে খানিকটা সহ্যই করে গেল, ওদের প্রাপ্যটুকু ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবি রেখে অপ্রতিবাদের মাধ্যমে কিছু অপবাদ স্বীকার করে নিল। তার নিজের সংকল্পকে আরো বেশি একাগ্র করে তুলল সে, এবং সিদ্ধিলাভের মূল মন্ত্র হিসেবে মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বন করল সর্বপ্রথম, ভবিষ্যতে নিজের প্রসঙ্গে কখনো মুখ খুলবে না।

পনেরো

ফিফথ্ ইয়ার চলছে তখন রমা হঠাৎ ক্লাশ করা বন্ধ করল। স্মৃতিময় মনে করেছিল বিশেষ কোনো কারণে সে কিছুদিনের জন্যে বাড়ি গেছে, কিংবা বোধ হয় প্রতিশ্রুতির খেয়াল বিসর্জন দিয়ে পিতামাতা-নির্দেশিত জীবনপথে যাত্রার উদ্দেশ্যে চিরদিনের মতোই এখানকার পাট গুটিয়ে ফেলেছে। আর এ ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, ত্রি-পক্ষীয় চুক্তিকারীদের দুটি পক্ষকে খবর না দিয়েই যেতে হয়েছে তাকে।

ক্লাশের শেষে স্মৃতিময় একদিন ত্রিদিবকে জিগ্যেস করল, 'রমার খবর জানিস কিছু?'

'চুলোয় গেছে।' জবাব দিয়ে ত্রিদিব তার কামিজের পকেট থেকে ফুটবলের টাইসীট বের করে, 'এবার দেখছি পাওয়েলস্ কাপ আমাদের কপালে নেই, থার্ড রাউণ্ডেই আমরা হিমঘরের যাত্রী—সঁ্যাতা মেরে যাব।'

প্রথম কথার সূত্র ধরে স্মৃতিময় কথা বলে, ত্রিদিবের উক্তির বৃহত্তর অংশ কানেও নেয়নি সে, 'চুলোয় গেছে মানে?'

'চুলোয় গেছে মানে, গন্ টু হেল। ক্লাশে না এসে সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোয়, সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখে। একদিন সিনেমা-হলেই আমার সঙ্গে দেখা হল, বলল, আর পড়ে কি হবে, ভবিষ্যতে আমার যেভাবে দিন কাটবে, এখন থেকে তাই অব্যেস করছি।··· অর্থাৎ, চুলোয় গেছে।'

রমা তাহলে এখানেই আছে, স্মৃতিময়ের মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তা ভুল। এতখানি সংবাদ এক নাগাড়ে পরিবেশন করে গেলেও ত্রিদিবের কথায় গুরুত্ব বা উৎকণ্ঠার আভাসমাত্র নেই। সম্ভবত তাকে পাঠ্যপুস্তকের সমাধির মধ্যে গুঁজে দিয়ে ত্রিদিব আর রমা একত্র জীবনযাপনের কোনো গুপ্ত পথ তৈরি করে নিচ্ছে, চরম

পরীক্ষার দিনটিতে তার হাতে একটি শুকনো ব্যর্থতা তুলে দিয়ে তারা প্রকৃত পরিচয় ও সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ করবে।

স্মৃতিময় বলল, 'এই করে দিন কাটাচ্ছে, তুই কিছু বললি না?'

ত্রিদিবের মুখের ভাবে তাচ্ছিল্যের প্রকাশ, টাইসীটটা মুড়ে কামিজের পকেটে পুরে নিয়ে জবাব দিল, 'আমি কে, রমা তোর ভাবী পত্নী, তুই বলগে যা। তাছাড়া আমি বলতে গেলে তো সেই মে'মানুষ-টানুষ করেই বলব, যা শুনলে তোর গায়ে ফোস্‌কা পড়তে পারে।'

ত্রিদিবের মতো এতবড় সাধু-শয়তান স্মৃতিময় বোধ হয় তার বাইশবছর বয়েসের মধ্যে দ্বিতীয় দেখেনি, বিদ্বেষের ক্লেশ অতিকষ্টে গোপন রেখে সে বলে, 'আমার ভাবী স্ত্রী, না তোর?'

'আমার!' ত্রিদিব হেসে ওঠে, 'আমার লেখাপড়াব বহর দেখে বুঝি তাই মনে হয়? তবে আমি যে একেবারে পড়ি না তা নয়, পাশ তো করতেই হবে। আর এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ না হোক, হাই সেকেণ্ড ক্লাশ না পেলে একটা ইনটারমিডিয়েট কলেজের লেকচারার-সীপও জুটবে না। বাপের পয়সায় খাওয়া মিষ্টি, কিন্তু বয়েস বেশি হয়ে গেলে তা দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে।'

স্মৃতিমর হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, তুই যদি আমার চেয়ে ভাল রেজাণ্ট করিস রমাকে বিয়ে করবি তো?'

'কেন করব না? দেখ সিতু, আমার সোজা কথা, রমা বা কোনো সুরমা শ্যামাই হোক, বিয়ে আমি নিশ্চয়ই করব; নয়তো আজীবন ব্যাচেলার থেকে জীবনতটিনীর ফিমেল ঘাটে ঘাই দিয়ে বেড়ানো আমার পোষাবে না।'

'রমার বদলে অন্য কাউকে নিয়ে তুই সুখী হবি?'

'ছ্যাৎ-ৎ, রমার কি এমন বিশেষত্ব তুই দেখলি বুঝি না আমি! ছেলেবেলায় তাকে এক-আধটা চুমু-টুমু খেতুম, তোকে বলিনি আমার এক পিসতুতো বোনকেও খেতুম—একই রকম। এভরি সেক্স হ্যাজ এ্যান অলটারনেটিভ—একের বদলে আর এক। অতএব রমার

বদলে সুরমা বা শ্যামাতেও আমার চলে যাবে। নারী-পুরুষের লেনদেন সর্বত্রই সমান, কবিতায় মুড়ে দেখলে প্রেম, খবরের কাগজের ওপর ছড়িয়ে দিলে তা বেয়ার ট্রুথ অফ্ ক্রুড লাইফ।'

এরপর আলোচনা চলতে পারে না, এতএব প্রসঙ্গের সমাপ্তি। কিন্তু আলোচনায় ছেদ পড়া এক জিনিষ ও পারস্পরিক সন্দেহ উহ্য রেখে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা আর এক। স্মৃতিময়ের অনুমান গভীর হয়, ত্রিদিব অন্যমনস্কতার অভিনয় ত্যাগ করেনি, রমাকে তার ছায়ামুক্ত করার অভিপ্রায়ে পড়া ছেড়ে দিতে প্ররোচিত করেছে। ত্রিদিবের নীচতার ক্রমবিকাশ দেখে সে অধিকতর আশ্চর্য ও আহত হয়, কিন্তু পূর্ববৎ নিরুত্তরই থাকে—সমস্ত নিষ্ঠা পাঠ্যপুস্তকে নিবিড় করে দেয়।

রমা বলল, 'তোমার সুমুখে কোনো প্রতিবন্ধক নেই স্মৃতিময়, তুমি আজ ইচ্ছে করলে সবকিছু পেতে পার। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা বলতে গেলে তোমার কাছে সেধে এসেছে। এরপর মানুষের যা স্বাভাবিক কাম্য, তা'ও উপযাচক হয়ে আসবে, তোমায় কারো দ্বারস্থ হতে হবে না।'

স্মৃতিময় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না, সিগারেট ধরায়, পরে বলে, 'একদিন যে আমায় একথা বলবে, তা বোধ হয় তোমার বছর দু' তিন আগে ভাবা ছিল; কিন্তু আমার তো তৈরি উত্তর নেই, জবাব দিতে সময় লাগবে।'

রমা একটু হক্চকিয়ে ওঠে, 'আমার ভাবা ছিল, তার মানে?'

'মানে, তুমি জানতে ত্রিদিবের জন্যে তোমায় একদিন আমার দ্বারস্থ হতে হবে।'

'ত্রিদিবের এমনি বিপর্যয় হবে তা আমি জানতুম?'

'ত্রিদিবের বিপর্যয়' বলতে বলতে স্মৃতিময় থামল, তারপর আবার বলল, 'তার জন্যে আমার দুঃখ তোমার চেয়ে কম নয় রমা। প্রাণে বেঁচে থাকবে, সবল দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, অথচ প্রকৃত জীবন বলতে যা বোঝায় তাতেই চিরপঙ্গু। ত্রিদিব কি চাইত তা আমি জানি, তাঁর পক্ষে এ যেন মৃত্যুর চেয়ে বেশি।'

'তাহলে—'

রমার কথা স্মৃতিময় কানে নেয় না, নিজের বক্তব্য শেষ করতে চায়, 'কিন্তু এ দুর্ঘটনা না হলেও আমার চেয়ে ভাল রেজাল্ট তার কখনোই হত না, তখন তুমি কি নিয়ে তার পক্ষে ওকালতি করতে আসতে? সেদিন হয়তো বলতে, আমি ত্রিদিবকে ভালবাসি, এই তো? আজও যদি এই কথা বল আমি কি তোমায় আটকে রাখতে পারব?'

প্রায় দেড়বছর পরে রমা এসেছে। মাসকয়েক আগে বিয়ের ইঙ্গিত দিয়ে স্মৃতিময় তাকে একটা চিঠি লিখেছিল। ত্রিদিবের দুর্ঘটনার রেশ তখন পর্যন্ত বর্তমান বলেই আসল কথাটা সে স্পষ্ট করেনি, কিন্তু সে চিঠির ধাঁচ যতই সাধারণ হোক ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে রমার উচিত ছিল উত্তর দেওয়া। মামুলি পত্রের মত চিঠিটা অগ্রাহ্য করায় তার মনোভাব জাহির হয়ে পড়েছিল। আজ রমা হঠাৎ এসে উপস্থিত না হলে সে ভবিষ্যতে তার কাছে নিজের অর্থহীন উপস্থিতি প্রকাশ করতে যেত না। নতুন কর্মস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নীরবেই এখানকার তল্পি গোটানোর আয়োজন করছিল। রমাকে দেখে সে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিল, তারপর যেমন বলা উচিত তেমনি করেই জিগ্যেস করেছিল, 'কেমন আছ রমা? তোমার ব্যাপারটা কি বল তো, লেখাপড়ায় ইতি দিয়েছ, অথচ পাটনা থেকেও নড়ছ না?' তারপর একটু হেসে মিছে একটা জিনিষ নিয়ে কৌতুক করার মত বলেছিল, 'আদেশ কর, কোন্ মাস কোন্ তারিখে টোপর মাথায় দিয়ে আমায় তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—আমার বাড়িতে একটা খবর অন্তত পাঠাতে হবে তো?'

ঠাট্টা হোক না-হোক, স্মৃতিময় জিনিষটাকে ঠাট্টা বলে তুলে না ধরা পর্যন্ত তার কথা সত্যি মনে করে রমার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল বইকি, কারণ ত্রি-পক্ষীয় চুক্তিটা তখনো বাতিল গণ্য হয়নি। কিন্তু সে প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে রমা নিজেই অত্যন্ত সহজভাবে একটা প্রশ্ন বিস্তার করে দিল, অবশ্য তা ঐ জিজ্ঞাসার জবাবেও পরিগণিত হতে পারে।

এম. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে ফুটবল মাঠে দানাপুর আর্মির হাতে প্রচণ্ড প্রহার খেয়েছিল য়্যুনিভারসিটি টীম। ত্রিদিবের প্রহার সাংঘাতিক, তার দেহের ওপর দাঁড়িয়ে এগারোটি সবুট খেলোয়াড় যুদ্ধনৃত্য করে গিয়েছিল। সৈন্যদলের হাত থেকে যখন তাকে উদ্ধার করা হয় তখন সে মৃতকল্প। অথবা মৃত! ফিল্ড সার্জন পর্যন্ত সেই মন্তব্য দিয়েছিলেন। হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পর বিস্তারিত পরীক্ষায় জানা গেল, তার পাথুরে বুকটা অনেক ধকল সয়েছে, কিন্তু দেহের নিম্নাঙ্গ তা পারেনি। কিড্‌নির জখম হয়তো একদিন নিরাময় হবে, কিন্তু জীবনধারা টেনে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তার নিঃশেষিত।

তারপর, স্মৃতিময়ের পরীক্ষা তখন পুরোদমে চলছে, রমা তো বহুদিন আগেই বুড়ি ছুঁয়ে বসে গেছে, ত্রিদিব এখনো হাসপাতালে। নিয়মিত দেখতে আসে স্মৃতিময়, কর্তব্যের ত্রুটি রাখে না।

ত্রিদিব অর্ধশায়িত হয়ে বসে আছে, আর চারদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবে, অল্পবিস্তর হাঁটতে পারে আজকাল; স্মৃতিময় বলল, 'যাক, আজ তবু একটা সুখবর পাওয়া গেল! হাসপাতাল থেকে বেরুলেই তোর মনে হবে কিছুই হয়নি, যেমন আগে ছিলি, তেমনিই আছিস। হাসপাতাল জায়গাটাই এমন, সুস্থ মানুষও এখানে এলে অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

স্মৃতিময়ের এতখানি উচ্ছ্বাসপূর্ণ সান্ত্বনার কথা শুনে ত্রিদিব শুকনো হাসি হাসল, 'আমার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে গেছে রে সিতু। ইতিপূর্বে আমি মনুষ্য নামধেয় এক জীব ছিলুম, বর্তমানে

গোত্র-রূপান্তরিত প্রাণী—মানে যে মুখ দেখে নাকি কোনো শুভ কাজে যেতে নেই। কাল তোর পরীক্ষা আছে?'

'কাল নেই, পরশু—'

'পরশু সকালে পাঁচমিনিটের জন্যে একবার আসতে পারিস, শুধু আমার মুখ দেখেই চলে যাবি—বিকেলে এসে খবর দিবি, পরীক্ষার পেপার কেমন গেল?'

'কি যা-তা বলিস তুই দিবু, চুপ কর।'

'যা-তা নয় সিতু, এ খোঁটা তো আমার চিরদিনের ঐশ্বয্যি হয়ে রইল। দেখ, তোর বিয়ে আমি এ্যাটেনড্ করব না, আমি একটা অপয়া বস্তু হয়ে গেছি, বৌভাতের মিষ্টিমাষ্টা আমায় পাঠিয়ে দিস কিন্তু!'

স্মৃতিময় জবাব দেয় না, মুখ বিকৃত করে কটূক্তিপূর্ণ উদ্গত উত্তর গিলে নেওয়ার ভঙ্গি করে।

ত্রিদিব বলল, 'তুই অমন পাঁচন-গেলার মতন মুখ করছিস কেন, শুনতে ভাল লাগছে না? তবে সত্যিকার ভাল কথা কিছু শোনাই। একটা কমপেন্‌সেসনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কেন জানি না, সেদিন আমার মোটেই মাঠে নামবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু পলিটিক্যাল সাইন্সের ডক্টর পি. কে. দাস, যিনি আমাদের এ্যাথেলিটিক য়্যুনিয়ানের প্রেসিডেন্ট, জোর করে আমায় খেলতে নামিয়েছিলেন—এটা আমাদের প্রেস্টিজ ফাইট ত্রিদিব, শুধু আজকের দিনটা, তোমার পরীক্ষা এসে গেছে, আমিই তোমায় এরপর খেলতে নিষেধ করব। তার ওপর কথা চলে না, খেলতেই হল। এখন আমার খেলাটেলা জনমের মতো তো চুকে গেল, সাঙ্গ হল লীলা! ডক্টর দাস আমায় বলেছেন—তুমি আমার ডিপার্টমেণ্টে ভর্তি হয়ে যাও, আই হ্যাভ স্পয়েলড্ য়্যোর লাইফ ইন ওয়ান ওয়ে, আই উইল সী ছাট ইট ইজ কমপেন্‌সেটেড্ ইন এ্যানাদার ওয়ে। মানে জানিস সিতু, ডক্টর দাসের নেকনজরে থাকার মানে?'

'এ তো খুবই ভাল খবর।' স্মৃতিময় আন্তরিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে

বলে ওঠে। ত্রিদিবকে উৎসাহিত করতে, তার ভবিষ্যৎ সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করতে বাধা নেই। ত্রিদিব আর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সে সম্ভাবনা চিরদিনের মতো ঘুচে গেছে। তবে যদি ইতিমধ্যে স্মৃতিময়ের হঠাৎ অসুখ করে, বা এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বছরটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন ত্রিদিব একটা সুযোগ পেয়ে যাবে—আগামী বছরের পরীক্ষায় বসতে পারে সে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রমা তার কাছে চিরদুর্লভ সামগ্রী হয়েই থাকবে। রমা কেন, ত্রিদিবের জীবনে কোনো নারীরই আবির্ভাব কল্পনা করা যায় না।

ত্রিদিব বলল, 'হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমার পোশাক বদলে ফেলব, গেরুয়া বস্তর নেব!'

'দিবু—!'

'আচ্ছা থাক, তুই কষ্ট পাচ্ছিস, বলব না। কিন্তু আমার যে ঐ কথাগুলোই বার বার মনে আসে। একটা কথা তোর কাছে আজ স্বীকার করি, আমি রমাকে ভালবাসতুম, কিন্তু রমা তোকে ভালবাসে বলে আমি প্রথম থেকেই কমপিটিশান এড়িয়ে গেছি। আজ আমার ভালবাসাবাসির পালা চুকে গেছে বলেই কথাটা বললুম, তুই কিন্তু রমাকে কোনোদিনই ঘুণাক্ষরেও জানাস না!'

নিজের অবধারিত ও ভাবী পত্নীর সম্বন্ধে বাল্যবন্ধুর, বিশেষত এক অক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষের দুর্বলতার কথা স্মৃতিময়কে কান পেতে শুনতে হল। শোনবার সময় মুখটুকু অম্লান এবং অসন্তোষের চিহ্নবিহীন করে রাখল সে।

এবার স্মৃতিময় বলল, 'আজ তাহলে আমায় ছুটি দে?'

ত্রিদিব অদ্ভুত হাসি হাসল, 'ছুটি? ছুটি তো আমিই নিয়েছি!'

রমা উঠে দাঁড়ায়, 'আমি যাচ্ছি—'

'কোথায়, ত্রিদিবের কাছে নাকি?'

'এ প্রশ্ন করার অধিকার তোমার এখনো হয়নি, স্মৃতিময়।'

স্মৃতিময় স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, খানিকটা অনধিকারের মতোই হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা তোমার কাছে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই, এ অধিকার আমার হবে কি না, বা যদি হয়, কত দিনের মধ্যে?'

'স্মৃতিময়' কি যেন বলতে গিয়ে রমা ঠোঁট কামড়াল, তারপর বলল, 'না। তুমি আমার বাবাকে চিঠি দিও, আশাকরি তিনি অমত করবেন না, যদি করেনও তার জন্যে তোমার চিন্তা নেই।'

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে বসল স্মৃতিময়, 'আচ্ছা রমা, ত্রিদিবের হঠাৎ বিয়ে করার সাধ চাপল কেন, সে তো এখনো ছাত্র? আর বিবাহের যা স্থূল উদ্দেশ্য, তার জীবনে তা চিরদিনের মতোই অবান্তর হয়ে গেছে।'

রমা বলল, 'উত্তর কি আমাকেই দিতে হবে?'

'প্রশ্ন করার মানে তো তাই!'

রমা জিগ্যেস করল, 'আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে?'

'জবাব দেবার দায়টুকুই তোমার, বিশ্বাস করা না-করা আমার নিজস্ব ব্যাপার।'

রমা ফিরে এসে ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে বসল, একমুহূর্ত নীরব, তারপর যথাসাধ্য সহজ সুরে বলল, 'তোমার ধারণা আমি ত্রিদিবকে ভালবাসি, ত্রিদিবের সন্দেহ তোমায় নিয়ে; কিন্তু আমি জানি ভালবাসা বলতে যা বোঝায় তা আমার নেই, থাকলে আমার প্রথম বয়েসে আমি নিজেকে তোমাদের দু'জনের হাতে তুলে দিতে পারতুম না। একজনের সামনে অপর একজনের স্পর্শ চিন্তা করতে পারতুম না। মেয়ে জন্ম না হয়ে আমি পুরুষ হয়ে জন্মালে আমরা তিনজনে বন্ধু হয়েই থাকতুম স্মৃতিময়, তোমার আর ত্রিদিবের বন্ধুত্বও ভেঙে যেত না। তুমি বা ত্রিদিব যেদিক দিয়ে বিবাহের উদ্দেশ্য বিচার করতে তা আমি পারিনি। পারিনি বলেই আজ এই বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। ত্রিদিবের দৈহিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে

কিন্তু মনটা তো মরেনি, নারী-সাহচর্য সে চাইবেই। নারীত্বের চেতনাবিহীন একজন নারী ছাড়া আজ কে তাকে সুখী করতে পারে, কে তাকে নিয়ে তৃপ্তি পাবে ?'

নীরবতার সমাধিতে নিমগ্ন স্মৃতিময়ের দিকে তাকিয়ে রমা আবার বলল, 'বিশ্বাস করতে পারলে স্মৃতিময় ?'

'না।' স্মৃতিময়ের জবাব স্পষ্ট, কণ্ঠস্বর পরিপূর্ণ।

'তাহলে ?'

'তাহলে আর কি' স্মৃতিময় হাসল, 'ত্রিদিবের প্রতি তোমার যে ভালবাসা তা আমার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই তুমি খানিকটা মিথ্যে গাওনা গাইলে রমা! কিন্তু আমি অন্য দিক দিয়ে চিন্তা করছি, তোমার সর্বসত্তা যখন ওদিকেই তখন আমি একটা প্রাণহীন দেহ নিয়ে কি করব ? তবে আমি যেন নিজের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলুম, আবার আমায় নতুন করে চিন্তা করতে হবে, নতুন বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনের তাৎপর্য খুঁজতে হবে। তা যদি পেরে না উঠি আমার বাকি জীবন হয়তো বিকৃত অর্থময়তায় গিয়ে দাঁড়াবে!'

রমার অস্তিত্ব সুমুখ থেকে সরে গেছে, তবু তার অপসৃত সত্তার অনেকখানি যেন ঘরটির মধ্যে এখনো সঞ্চারিত হচ্ছে, তাতেই মগ্ন হয়ে রইল স্মৃতিময়। হঠাৎ এক কথায় প্রায় নিজেরই জীবনের অনেকখানি অংশ সে কি করে ত্যাগ করতে পারল—রমাকে ভালবাসে, না ত্রিদিবের কাছে ছোট হয়ে থাকতে চায় না বলে, এই অস্থির প্রশ্ন তাকে নিজের কাছেই স্পষ্ট হতে দিল না।

ষোলো

গত শুক্রবার সন্ধে উত্তীর্ণ করে থমথমে ভারি মুখে অনুলেখা বাড়ি ফিরেছিল। বইপত্র হাতে ছিল না, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা উত্তেজিতভাবে হাতে দোলাতে দোলাতে ঘরে ঢুকে সেটি বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তখুনি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে সে ছাদে চলে গিয়েছিল। এরূপ সংকটজনক অবস্থায় শিলাদিত্যর যা করণীয় তাই করেছিল সে। প্রশ্নের খোঁচায় অনুলেখাকে অধিকতর উত্তেজিত না করে, অথচ সে যে তার মনোবিকার সম্বন্ধে একেবারে অনাগ্রহী নয়, বরং একটু চিন্তিতই, এ ধরনের মুখভাব নিয়ে অনুলেখার সুমুখে গিয়ে বারকতক পায়চারি করে একটা আবশ্যিক কাজের অছিলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য শিলাদিত্যর বাড়ির বাইরে কাজ বলতে বেকারত্বের চরম নিদর্শনের মতো মূর্খ জনস্রোতে খানিকক্ষণ গা ভাসিয়ে বিধ্বস্ত গৃহনীড়ে ফিরে আসা, অনুলেখা তা ভালই জানে। সেদিন কিন্তু একটা ঝড়ের আগমন প্রতিরোধ করবার জন্যে বাড়ি ফেরবার সময় সে কিছু টুকিটাকি সওদাও নিয়ে এসেছিল। ঘরে এসে দেখল অনুলেখা শুয়ে পড়েছে। মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্পটা পর্যন্ত নেভানো।

ঘুমন্ত মানুষের ঘুম না ভাঙে, জাগরিত মানুষ শুনতে পায়, কণ্ঠস্বরকে ঠিক এই মাত্রায় বেঁধে রেখে শিলাদিত্য ডাকল, 'লেখা, এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছ যে, খেয়েছ?'

'হুঁ।' অনুলেখা খুব শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, যা শিলাদিত্যর পক্ষে অনমুমেয়।

হাতের জিনিষগুলো টেবিলের ওপর রেখে শিলাদিত্য গায়ের হাওয়াই সার্টটা খুলল, প্যাণ্ট ছেড়ে পাজামা পরল না আর, সময়ের এটুকু অপব্যয় বাঁচিয়ে অনুলেখার খাটের কাছে এসে একপাশে পা

ঝুলিয়ে বসল। ওদিকে ফিরে শুয়ে আছে অম্লুলেখা, সরাসরি তার সামনে গিয়ে না দাঁড়িয়ে সে এপাশ পর্যন্ত এসেছে। খুব কাছে এগিয়ে এসেছে।

নিজের এতখানি সমীপ উপস্থিতি কিছুক্ষণ নীরব রেখে শিলাদিত্য সেই সময়-অনুচ্ছেদে অম্লুলেখার মানসিক চিত্র-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে, উত্তাপ-শীতলতা স্পৃহা-অনীহা ইত্যাদি লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষাবধি তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণশক্তির সম্বন্ধে সন্দিহান থেকে গিয়ে ডানহানের প্রায় সম্পূর্ণ ওজনটা আত্মস্থ করে রেখে সেটির লঘু অস্তিত্ব অম্লুলেখার কাঁধের ওপর রাখে। অম্লুলেখার আপত্তি না হলে এই লঘু স্পর্শ বন্ধনের দৃঢ়তায় পরিণত হবে। আর সে যদি একটা ঝটকা দিয়ে বলে ওঠে, কি ইত্‌রামী হচ্ছে! তাহলে ঐখানেই ইতি।

অম্লুলেখা যা সাধারণত করে না আজ তাই করল। ঝড়ের গতিতে পাশ ফিরে শিলাদিত্যর কোলের মধ্যে নিজেকে প্রায় অবলুপ্ত করে দিয়ে বলল, 'অমন চুপি চুপি এসে দাঁড়ালে, জড়সড় হয়ে বসলে—কেন? আমায় ফেলে দেবে নাকি?'

বিস্মিত চেতনা নিয়ে শিলাদিত্য দৈহিক প্রসার বৃদ্ধি করে, গুছিয়ে বসে। অম্লুলেখা যেন স্বপ্নের ঘোরে তার চির অবরুদ্ধ অভিমান প্রবাহিত করে দেয়, 'আমায় আদর করতে তো ভুলে গেছ, আদর কর না?'

থতমত ভঙ্গিতে এবং আকস্মিক কশাঘাত সম্বন্ধে অবহিত হয়েই শিলাদিত্য অম্লুলেখার শরীরে আদর ছড়াতে থাকে। দুটি চোখের মুগ্ধরুদ্ধ আবেশ নিয়ে অম্লুলেখা সে প্রণয়োপচার গ্রহণ করে। এক নিমেষের জন্যে একটা হাত মুক্ত করে এনে শিলাদিত্য তার মাথার কাছে তেপায়া টেবিলের ওপর রাখা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দেয়। বিবশ পরিতৃপ্তিতে শয়ান অম্লুলেখা। তার এই অনবধানতার ফাঁকে শিলাদিত্য আত্মপ্রসার করবার সাহস খুঁজে পায়। অম্লুলেখা বাধা দেয় না, বরং যেন সমর্থনই যুগিয়ে চলেছে। অনেককাল পরে

শিলাদিত্য নিজেকে আবার নিজের অধিকারের ভূমিকায় নেতৃত্ব করতে দেখবে সেই উদ্দীপনায় তার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে। শরীরের বিস্মৃতপ্রায় অঙ্গসমূহ কর্মোদ্যমে মুখর। বৈরাগ্যমুখী জীবনের আকস্মিক প্রত্যাগম।

অনুলেখার অবলুপ্ত কণ্ঠস্বরে সমর্থনের ইঙ্গিত, 'আচ্ছা, তুমি যেন কি!'

অনুলেখার সলাজ অবস্থাকে আরো একটু বিব্রত করার জন্যে শিলাদিত্য প্রশ্ন করে, 'কি বল তো?'

'জানি না, যাও।' শিলাদিত্যর কাঁধের পাশে মুখ লুকোয় অনুলেখা, বাঁ হাতটা পেছন দিকে প্রসারিত করে দিয়ে আলোর অনাচার আড়াল করতে চেষ্টা করে।

শিলাদিত্য যেন আজই টের পেল অনুলেখার গায়ের ঘ্রাণের একটা বিশেষত্ব আছে। অনুলেখার সেই ঘ্রাণময় অস্তিত্ব সে নীরবে আহরণ করে নিজের চেতনা ও স্মৃতির প্রতিটি স্তরে সঞ্চিত করে নেওয়ায় তৎপর হয়। সময় অতিবাহিত হতে থাকে।

শিলাদিত্যর মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অনুলেখা বুঝল ইচ্ছাকৃত দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়া মানুষটা ঘামছে, গাল বাড়িয়ে সেই ঘামটুকু নিজের গালে মুছে নিয়ে সে বলল, 'আমার আজ তোমাকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।'

নিদ্রাতুর গলায় শিলাদিত্য জিগ্যেস করে, 'এমনিতে বুঝি ভালবাস না?'

অনুলেখার সুখময় শ্রান্তি অনেকটা তিরোহিত, এতক্ষণ ধরে সে যে জিনিষটার অনুসন্ধান করছিল, তার কিছু যেন পাওয়া গেছে, বেশিটাই যায়নি। আজ একটা বিষয় পরখ করে দেখছিল সে। চিত্তের পূর্ণতা দিয়ে অনুধ্যান করবার চেষ্টা করছিল, দেহটাকে তৃপ্ত করতে পারলেই কি জীবনের সমূহ পরিতৃপ্তি! যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবীর সর্বব্যাপারে অন্ধ হয়ে থেকে সে শিলাদিত্যকে নিয়েই জীবনাতিপাত করবে। কিন্তু শিলাদিত্য যেন নিজের সমস্ত উদ্যমের ফলশ্রুতি-

স্বরূপ এক বিরাট অতৃপ্তির গহ্বরই তার সুমুখে উন্মোচিত করে দিল।

তবু অনুলেখা শিলাদিত্যকে আঘাত করল না, আরো খানিকটা সময় ব্যয়িত হয়ে উভয় তরফের শ্রান্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে বলল, 'এবার ছাড় আমায়।'

শিলাদিত্য যেন অনন্ত বুভুক্ষার ভিক্ষুক, আপত্তি জানাল, 'না।'

অনুলেখা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু না, শিলাদিত্য আজ অনধিকারের হাত প্রসারিত করে তার দেহ থেকে খানিকটা সুখ নিংড়ে নিলেও, তাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে—দেহাতীত কিছু একটা তার প্রয়োজন, যা শিলাদিত্যর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আজই তার দাম্পত্যসুখের শেষ রজনী, তথাকথিত সর্বাধিকারের সমাপ্তি ; এরপর পূর্ণপ্রাপ্তি দূরে থাক, অনুলেখার সামীপ্যের ছায়াস্পর্শও পাবে না সে।

মৃদুতর শব্দে অনুলেখা বলল, 'লক্ষ্মীটি, তুমি বুঝছ না, আমার কষ্ট হচ্ছে।'

এ অনুনয়ের মর্যাদা রেখে শিলাদিত্য কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর তন্ময় চোখে অনুলেখার অবশ-অবারিত দেহের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই অনুলেখার, আরক্তিম চোখের অগ্নিময় দৃষ্টিতে শিলাদিত্যর বিমুগ্ধতা ঝলসে দিয়ে বলল, 'যথাসাধ্য জুলুম তো করে নিলে, এবার কি দয়া করে আমায় একটু ঘুমোতে দেবে ? আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও।'

বিস্ময়াপিষ্ট শিলাদিত্য মুহূর্তমধ্যে নির্বোধ হয়ে যায়, 'এখনো দু-একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়া বাকি ছিল তার। সেগুলো চেপে রেখে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে সে তাড়াতাড়ি অনুলেখার খাটের পাশ থেকে সরে গেল।

অভাবিত গত শুক্রবারের পর শনিবার। শনিবার অনুলেখার ক্লাশ থাকে না। পুরোটাই বিরাম। রবিবার। রবিবারের পর থেকে আরো চারটি দিন অনুলেখা য়্যুনিভারসিটি যায়নি। দেখে মনেও হয় না কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিয়মিত য়্যুনিভারসিটি যাওয়ার প্রবল প্রবণতায় সে ভোর থেকেই ব্যস্ত থাকত। পুরো দুটি ঘণ্টা বাথরুমে। তারপর সাজগোজের টেবিল। পোশাক নির্বাচন। আহার। সকাল থেকে দুর্বার তৎপরতা, শিলাদিত্যর তো দম ফেলারই অনবসর। সাড়ে আটটার আগে বাজারে টাটকা মাছ আসে না, তার ওপর চালানের গাড়ি দেরিতে এলে সর্বনাশ। মাছের বাজারের ধুমসো আড়ৎদার ঈশ্বর শা পর্যন্ত শিলাদিত্যর নৈমিত্তিক ব্যস্ততা চিনে ফেলেছে। পাইকারি দর হাঁকতে হাঁকতে সে আড়চোখে শিলাদিত্যর দিকে তাকায়, তার ছট্‌ফটানি লক্ষ্য করে। আর শিলাদিত্য যখন পাকা-মাছের মেছোর কাছ থেকে চারশ' গ্রাম পাকা-পোনার দরুন আটটাকা কেজি দরে তিনটাকা বিশ পয়সা দিয়ে পড়ি-মরি করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসে, সে দৃশ্যও মুখভরা পানজর্দা সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে ঐ ধুমসোগতর ঈশ্বর শা।

ঈশ্বর শা চেনে শিলাদিত্যকে। শহরের নামজাদা, তথাকথিত নামজাদা সব পরিবারকেই। বড়মাপের সামাজিক অনুষ্ঠানেই ঈশ্বর শা। ফরমাস মতো মাছের যোগান দিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই আর। ঈশ্বর শা বলে, 'চালিশ কেজির রহু গঙ্গা মাইর বুকে যদি একটাও থাকে বাবু, কাল তা আপুনাকে আমি জরুর এনে দিবে। লেকিন বাবু, বিশ কেজি টেস্ ভাল হয়। আপনি যা লিবেন আমি তাই এনে দিবে।'

শিলাদিত্যর মা'র শ্রাদ্ধের সময় নিয়মভঙ্গের মাছ ঈশ্বর শা'ই দিয়েছিল, সেদিন কি একটা গোলযোগের জন্যে মাছের বাজারে একটা আঁশ পর্যন্ত চালান আসেনি। ঈশ্বর শা নিজে রিক্সা করে বাড়িতে মাছ পেঁৗছে গিয়েছিল। 'আজ বাবু হরতাল আসচেন, মার্কিট বন্দ্‌ আসচেন, লেকিন ঈশ্বর শাউর ওয়াদা বন্দ্‌ নহী আসচেন।'

নিজের জড়বৎ দেহের মতো পানের পিণ্ডটা গালের এক অঞ্চলে মুহূর্ত কয়েকের জন্য জড়ো করে রেখে ঈশ্বর শা একদিন প্রশ্ন করে বসল, 'আপুনি দোত্তবাড়ির বাবু আসচেন, রোজনিত্যমডেলি আপুনাকে কি লোকাল ধরতে হয় বাবু? আজকাল কি কোনো কামধাম করচেন বাবু, না বিজনিস করচেন?' দোত্তবাড়ির অধিকাংশ বাবুই কামধাম করে না, এ খবর ঈশ্বর শা'র জানা; যারা কিছু করে তারা এ শহরে থাকে না, ভিন দেশে চলে যায়।

ঈশ্বর শা'র প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শিলাদিত্য বিব্রত হয়ে পড়েছিল, এ ক্ষেত্রে তার যা মুদ্রাদোষ, ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে কপাল কুঁচকে মেরুদণ্ডের প্রথম গ্রন্থি কণ্ডুয়ন করতে করতে একটা পাশ-কাটানো জবাব দিয়ে পালিয়ে এসেছিল সে। বলেছিল, 'এই, এই আর কি, সকালেই মাছের দরকার হয়।'

তারপর থেকে শিলাদিত্য যত লুকিয়েই বাজার যাক না কেন, ঈশ্বর শা নিলামদারী হাঁকডাকের ফাঁকেও তার দিকে একবার অন্তত আড়চোখে তাকিয়ে নেবে, আর শিলাদিত্যর মনে হবে, এমন জীবন-পলায়িত ব্যক্তির মতো কালযাপন করার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়াই ভাল।

সোম থেকে বৃহস্পতি, এই চারটে দিন শিলাদিত্য তার কৌতূহলকে লক্ষ্য না করার মধ্যেই ডুবিয়ে রেখেছিল। সকালবেলা ঠিক আটটায় বাজারে বেরিয়েছে, ধোপারবাড়ি তাগাদা দিয়ে এসেছে একদিন, সকাল সাড়ে ন'টায় অন্যান্য মহার্ঘ্য বাজারের সঙ্গে চারশ' গ্রাম পাকাপোনা কিনে এনেছে। বাকি স্থূল সওদাগুলো তাকে নিজে গিয়ে আনতে হয় না, বাজার করার ভার না পেলে কাজ ছেড়ে দেবে, এই সর্তে আনীত এক গৃহভৃত্যেরই দায় সেটা।

অম্বুলেখার সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলই শিলাদিত্য নিজের লক্ষ্যের বাইরে রাখবার চেষ্টা করে। বিশেষত অম্বুলেখার এম. এ. পড়া বা না পড়ায় তার তিলপরিমাণ মাথাব্যথা নেই। কিন্তু অম্বুলেখার য়্যুনিভারসিটি না যাওয়টা যদি কোনো ঝড়ের পূর্বাভাস হয়, এই

আপাত মুহ্যমান ভাব যদি অশান্তি উদ্রেককারী একটি প্রস্তুতি হয় — সেই ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠেছে যেন। কিছুটা প্রশ্ন ঠোঁটের ডগায় এগিয়ে আসে, কিছুটা সাহস সে সঞ্চয় করে ফেলে, কিন্তু সেই ভঙ্গুর সাহসকে দুঃসাহসের কোঠায় তুলে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে না, 'তুমি আজকাল য়ুনিভারসিটি যাচ্ছ না কেন, লেখা ?'

উপরন্তু গত শুক্রবার সন্ধ্যারাত্রির ঘটনাটা—একটি বিস্ময়ের জের নিয়ে অনুলেখার পূর্ণসম্মতিময় সান্নিধ্য এবং পরবর্তী বিস্ময়স্বরূপ তার রূঢ় প্রত্যাখ্যান, শিলাদিত্যর দাম্পত্যজীবনে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। মাঝখানে পাঁচ-ছ'টি দিনের ব্যবধান সত্ত্বেও ঐ স্বাদ এবং বিস্বাদ তাকে যেন যুগপৎ সুখ ও অসুখে আক্রমণ করে চলেছে। মনে হয়, অনুলেখার য়ুনিভারসিটি না যাওয়ার কিয়ৎপরিমাণ কারণ গত শুক্রবার সন্ধ্যারাত্রির ঘটনায় সমন্বিত হয়ে আছে।

মাছের বাজার সেরে এসে শিলাদিত্য দেখল অনুলেখা এখনো পর্যন্ত খাটের ওপরই বসে আছে, পাশের ছোট্ট টেবিলটায় আধভরা চায়ের পেয়ালা—অল্প একটু খেয়ে সরিয়ে রাখা। গায়ের হাওয়াই সার্টটা খুলতে খুলতে প্রশ্নের মধ্যে অন্যায় কৌতূহলের অনুপ্রবেশ যথাসাধ্য বাঁচিয়ে, সে জিগ্যেস করল, 'তোমার য়ুনিভারসিটির ছুটি চলছে বুঝি, লেখা ?'

অনুলেখা শুকনো অথচ কুটিল দৃষ্টিতে তাকাল, 'কেন, ছুটি কিসের ! এখন কি দোল না দুর্গোৎসব, ক্রিশমাস-মহরম—কোন্‌টা ?'

শিলাদিত্য হাসল, 'না, স্ট্রাইক-ফ্রাইকও তো হতে পারে ?'

শয্যাত্যাগের পর দিনগত পাপক্ষয় সুরু করার জন্যে হাই তোলাটা অনুলেখা বোধ হয় শিলাদিত্যর অপেক্ষায় আটকে রেখেছিল, এখন সে কাজটি সম্পন্ন করে অনীহাভরা আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আমার য়ুনিভারসিটি না যাওয়ার কারণ হঠাৎ এতদিন পরে জিগ্যেস করার অর্থ ? আমি তো ভাবছিলুম আমার কোনোকিছুই তোমার একঘেয়ে দৃষ্টিতে আর ধরা পড়ে না।' তারপর সুর পাল্‌টে বলল, 'যদি বলি তোমায় খুশি করার জন্যেই আমি য়ুনিভারসিটি যাচ্ছি না ; তুমি তো

চাও না আমার কোয়ালিফিকেশন একটু বাড়ুক, তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যে স্ট্যাটাস্ আমি হারিয়েছি, মান খুইয়েছি, নিজের চেষ্টায় তার খানিকটা ফিরিয়ে আনি—তাই সবদিক ভেবে আমি পড়া ছেড়ে দিলুম।'

না, অনুলেখার একটি কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, শিলাদিত্য জানে বলির মোষের গলায় ঘি মালিশ করে তার ঘাড়টা যেমন নরম করে নেওয়া হয়, যাতে এক কোপ ছাড়া দুটির প্রয়োজন না হয়ে পড়ে, তেমনি সেও পতিমেধের আয়োজন করছে ; নরম এবং সংবেদনময় কথার মালিশ করে তার প্রতিরোধের ক্ষমতা হরণ করে নিচ্ছে।

শিলাদিত্য অনুলেখার কাছে এসে দাঁড়ায়, একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়ায় প্রথমটা, অনুলেখা সরে যেতে বলে না, তখন সে নিজের ডান হাতটি বাড়িয়ে অনুলেখার বাম বাহু ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করে, মুখে খানিকটা চটকহীন হাসি, 'সত্যি লেখা, মাঝে মাঝে তুমি বড় ছেলেমানুষী কর। যাও, বাথরুমে যাও, তারপর তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে য়্যুনিভারসিটি।'

'কেন বল তো, ভূতের মুখে রাম-নাম কেন?' অনুলেখার স্বর সন্দিগ্ধ এবং তীক্ষ্ণ।

'কেন আবার' শিলাদিত্য তার বিশুষ্কপ্রায় মরা হাসির দুটি পা জড়িয়ে ধরে যেন, 'তোমার গরবে আমার গরব, তাই। নিজে তো কোনো দিকেই এগুতে পারলুম না, তোমার মান-খাতিরের আঁচল ধরে যতটুকু যেতে পারি!'

অনুলেখা উঠে দাঁড়াল, 'তুমি কেউটে নিয়ে খেলতে এসেছ, সোজা পথে চলে আমার নাগাল পেলে না, ন্যাকামি করে পাবে মনে কর?'

এ কথার উত্তর দেয় না শিলাদিত্য, বলে, 'শুধু শুধু ক্লাশ কামাই করে কি হবে, যাও না?'

'তাতে কি তুমি লাভবান হবে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, যাচ্ছি তাহলে' বলতে বলতে অনুলেখা হেসে ফেলে, 'আমার কিন্তু তোমার প্রতি অনুকম্পাই জাগছে।'

'আজ তোমার জামা-কাপড় আমিই বেছে দেব।' এক ধরনের দৃষ্টি চোখে নিয়ে শিলাদিত্য অনুলেখার দিকে তাকাল।

অনুলেখা বলল, 'অনুকম্পা মানে জানো—শব্দটার বানান আর আক্ষরিক অর্থ, এবং গূঢ় তাৎপর্য?' তারপর সে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

শিলাদিত্য ডাকল, 'লেখা!'

অনুলেখা সাড়া দিল না, বাথরুমের দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এল শিলাদিত্যর।

বোধ হয় দশমিনিট, অনুলেখা বাথরুম থেকে বেরুল। তারই খাটে অনধিকারী অতিথির মতো শিলাদিত্য বসে, দেখেই অনুলেখার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, কিন্তু শিলাদিত্যর নজর থেকে তা বাঁচিয়ে রেখে বলল, 'একেই তো দেরি হয়ে গেছে, এবার ঘর থেকে একটু বেরোও, আমি তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে নি। আমার জামা-কাপড় বেছে রেখেছ নাকি?'

'না, দিচ্ছি—দিচ্ছি এখুনি।' শিলাদিত্য অধীর তৎপরতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

অনুলেখা হেসে ফেলল, 'এমন সাপের ছুঁচো গেলা দেখিনি কখনো; এতই যদি একজন অসহায় অক্ষম বউকে ভয়, তো বিয়ে করেছিলে কেন? তোমায় আর আমার জামা-কাপড় বাছতে হবে না। আমি যেভাবেই সাজি না কেন, তোমার চোখে সুন্দর ছাড়া অসুন্দর লাগব না, তা আমি জানি।'

শিলাদিত্য বলল, 'আমার চোখের বাইরেও তো খানিকটা জগৎ আছে?'

কথাটা শুনে অনুলেখা এক নিমেষের জন্যে স্তব্ধ। এ ধরনের উক্তি শিলাদিত্যর মুখে শুধু আকস্মিক নয়, অত্যন্ত আশ্চর্যের। একটা কথার কথাই নয়, অনুলেখার মানসরূপ বিশ্লেষণ করে শিলাদিত্য

তারই সুমুখে ধরে দিল নাকি ? গত শুক্রবার ডক্‌টর সেনশর্মা তাকে নির্জনে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য অনাবিল ছিল না, এবং তা বুঝতে পারার পরও সে তাঁর সহগামিনী হয়েছিল। তারপরও যে সে অক্ষত ও অস্পর্শিত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছে, তা ডক্‌টর সেনশর্মার আচম্বিত ভাব পরিবর্তন বশতই। ডক্‌টর সেনশর্মার অভিসন্ধি অনুযায়ী সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল, তাই তাঁর আকস্মিক পরিবর্তন তার সহ্য হয়নি। নিজে সে প্রচারিত হয়ে পড়ল, ডক্‌টর সেনশর্মা বুঝলেন অনুলেখা সহজলভ্যা—অর্থাৎ নিজের আত্মিক জ্বালা নির্বাণের অবসর না পেয়েই সে তাঁর কাছে চিরদিনের জন্য সর্ববিক্রীত পাপ-পরকীয়া হয়ে রইল।

অবশ্য বিয়ের একবছর পরে শিলাদিত্য তাকে নিয়ে জুয়া খেলবার অনেক চেষ্টা করেছিল। তার প্রথম দিকের প্রয়াসগুলো যদিও কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের চাল, কিন্তু পরে সে এই থেকেই লাভবান হতে চেয়েছিল। অনুলেখা বুঝতে পেরে তার সে আয়োজন বানচাল করে দেয়, আর তারপর থেকে শিলাদিত্যকে হীন প্রতিপন্ন করার অনেক অবসর পায় সে।

এইমাত্র যে কথাটা শিলাদিত্য বলল তা ভেবেচিন্তে বলেনি, সুপরিকল্পিতভাবে এতটা ওজনসই আঘাত সে অনুলেখাকে করতে পারে না। কিন্তু কথাটা তার দমন করে রাখা মনন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ শিলাদিত্যের বিশ্বাস অনুলেখা নিজেকে দেখিয়ে বেড়াতে ভালবাসে, অপরের চোখে পড়বার জন্য উদ্‌গ্রীব—এবং এই সমস্ত ইচ্ছের যা পরবর্তী ধাপ, সেখান পর্যন্ত নেমে গিয়ে জীবনের আস্বাদ নিতে চায় সে।

ভিজে কাপড়েই অনুলেখা দাঁড়িয়েছিল, চিন্তা করছিল, কিন্তু তার চেহারায় চিন্তিত মানস পরিস্ফুট হয়ে নেই। সে যেন শিলাদিত্যের বাইরে যাওয়ার প্রতীক্ষাতেই রয়েছে, অথচ শিলাদিত্য কিছুতেই বেরুতে চায় না, তাই সে বলে, 'কি গো, তুমি বাইরে যাবে না কি ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি তো।'

অনুলেখা বলল, 'আমার তৈরি হতে ঘণ্টাখানেক লাগবে, তাছাড়া আজ শুক্রবার, ক্লাশ একটা থেকে—তুমি যদি একবার ডক্‌টর সেন-শর্মার বাড়ি যেতে পার?'

'কেন?' শিলাদিত্য দরজার কাছে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে এল।

অনুলেখা একবার ঠোঁট কামড়াল, তারপর বলল, 'গত শুক্রবার ক্লাশের মেয়েদের সঙ্গে তাঁর কাছে নোট নিতে গিয়েছিলুম, তারপর সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে বলে তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে আমার বইখাতা তাঁর টেবিলেই ফেলে এসেছি।'

'যাচ্ছি।' শিলাদিত্য আলনার কাছে গিয়ে বাজার যাওয়ার হাওয়াই সার্টটা টেনে নিতে গেল।

ত্বরিতে অনুলেখা বলল, 'ও কি করছ, একজন ভদ্রলোকের বাড়ি যাচ্ছ, একটু ভাল পোশাক পরবে তো? জামাই সেজে না যাও, মানুষ সেজে তো যাবে! আর পায়ের ঐ কাদামাখা জুতোটা বদলাও।'

অনুলেখার নির্দেশনায় শিলাদিত্য তৈরি হতে লাগল। এদিকে যে কারণে অনুলেখা তাকে বাইরে বেরুতে বলছিল, সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে, যেন সমস্ত বিধি-বিধান নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে সেও নিজের বেশ পরিবর্তনে তৎপর হল। ইচ্ছে করেই দেরি করতে লাগল শিলাদিত্য, আজ অনুলেখার য়্যুনিভারসিটি যাওয়া স্থগিত থাক, বরং দুপুরের দিকে একটা সামীপ্য আদায়ের চেষ্টা করবে সে। এখন থেকেই তাঁর লিপ্সার সূচনা দেবার চেষ্টা করবে।

শিলাদিত্য বলল, 'থাক, ক'দিন যখন কামাই হয়ে গেছে, আজ বিশেষ কি ক্ষতি হবে, সোমবার থেকেই যেও। আমি বরং রবিবারে গিয়ে তোমার বইপত্তর এনে দেব। এখন মিছিমিছি তাঁকে বিরক্ত করতে যাওয়া!'

শিলাদিত্যর মত পরিবর্তনের কারণ অনুমান করে অনুলেখা খুশি হয়। অপদার্থ মানুষটাকে কামনায় জর্জরিত করে তারপর তার

হাতে শূন্য উপচার তুলে দিয়ে একটু মজা দেখা—ডক্‌টর সেনশর্মার প্রত্যাখ্যানের নিকটতম এবং সহজতম প্রতিশোধ।

মুখে মোহিনী হাসি ফুটিয়ে অম্লুলেখা বলে, 'বুঝেছি, আমায় দেখতে তোমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তা অমন আড়চোখে কেন? বুঝি না কি এমন ঐশ্বর্য তুমি ঘরে এনে পুরেছ, যা ছ'বছর ধরে দেখেও আশ মেটে না, পুরনো মনে হয় না।'

এ যেন আমন্ত্রণ, শিলাদিত্য আস্কারা পায়। পাটভাঙা কামিজটা আলমারির হাতলে ঝুলিয়ে দিয়ে আশ্বাসপ্রাপ্ত চোখে অম্লুলেখার দিকে তাকায় সে। একটা বিশিষ্ট হাই তোলে।

অম্লুলেখা বাস্তবিকই ব্রীড়িত হয়, লাজ-রক্তাভ মুখ দিয়ে চিরাচরিত কপট ভৎ‍র্সনা বেরিয়ে আসে তার, 'অসভ্য!'

পরক্ষণেই অম্লুলেখার সম্বিত ফিরে আসে। একটা অসার অপদার্থ, জৌলুসহীন ঘষা কাচের টুকরো, হঠাৎ সে তারই মধ্যে থেকে মহার্ঘ্য মাণিক্যের স্পর্শসুখ প্রত্যাশা করে ফেলেছিল, তারই নকল আবেশদায়ক দ্যুতিতে নিজের বঞ্চনাক্ষুব্ধ অন্ধকারময় মনটাকে উদ্ভাসিত করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল! অচেতনতা-বিজিত কাঠিন্যের সঙ্গে অম্লুলেখা বলে, 'ঢের তো দেখা হল, এবার আমার ছোট্ট কাজটা করে এস। আজ য়্যুনিভারসিটি না গেলে ভবিষ্যতে আর কখনো যাওয়া হয়ে উঠবে না।'

শিলাদিত্যর বিমুগ্ধ দৃষ্টি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বরেও ক্ষোভচিহ্ন, 'এতদিন বাদ গেল, তবু আজ তোমায় যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ।' অম্লুলেখার গলা হিমশীতল।

শিলাদিত্যর মস্তিষ্ক এবং সারা শরীর থেকে যেন একটা মৃদু বিদ্যুতের প্রবাহ ক্রমশ নিচে নামতে নামতে পায়ের তলা দিয়ে ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয় ঢুকে যায়। সে আর দেরি করে না, প্রয়োজনের চেয়ে স্বল্প সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সতেরো

ডক্‌টর সেনশর্মা পরীক্ষার খাতায় ব্যস্ত। খাতা দেখা আর কি, এক যান্ত্রিক অভ্যাস। প্রথম প্রথম কাজটিতে নিষ্ঠার অনুসন্ধান পাওয়া যেত, তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আসা নম্বরগুলো বিচারের নামে অবিচারের নিদর্শন হয়ে না দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে সদা-সতর্কতা। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বার বার পড়তেন। যথাসাধ্য নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে নম্বর বসাতেন। সমস্ত খাতা দেখা হয়ে গেলে প্রতিটির পুনঃপরীক্ষা। এরই মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্যে গোটাকতক রোল নম্বরও এসে জুটত, সেগুলি আগে ভাগে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েই তিনি স্বকর্মে প্রবৃত্ত হতেন। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল এ পথে শুধু শত্রুবৃদ্ধিই হয়, সুনাম প্রসারিত হয় না। সিনেট-সিণ্ডিকেট তো আছেই, আরো গভীর জায়গাতে গিয়ে তাঁর নিরপেক্ষতা আঘাত হানে, যার ফল বিপরীত মুখে তাঁরই দিকে ফিরে আসে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় কিছুটা ন্যায়-নিরপেক্ষতা দেখনো সম্ভব, তা'ও আজকাল সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও মত্রদেশ থেকে পৈরবী এসে পৌঁছয়। তাছাড়া এই যুগটাই বিচিত্র, এখন আর কারও সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, কিন্তু স্বার্থ এবং জীবনধারণের সূতোগুলো প্রতিটি মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সাপ্লাই অফিসারের ছেলের খাতার নম্বর না বাড়ালে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্যে চিনি, ময়দার পারমিট পাওয়া যায় না। দেওয়ানী আদালত পর্যন্ত নাকি যুগের প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। এমন এক একটি ন্যায়ালয় আছে, যেখানে অধিষ্ঠিত দেবতার পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রের পাশ বা ভর্তির প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত একটা জরুরী নিষেধাজ্ঞা আদালতের কলম দিয়ে বার হয় না।

ক্রমশ এই পরিবেশে ধাতস্থ হয়ে গেছেন ডক্টর সেনশর্মা। উপায় নেই। একশ'টি খাতার মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটির জন্যে সুপারিশ। ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতার বহু অবদানের এটি অন্যতম। বিদ্যা সুপ্রসারের নামে প্রতি প্রদেশের প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়, যার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য যাই হোক, পরোক্ষে এইগুলিই স্বার্থপুষ্টি ও দুর্নীতি প্রচারের মূল কেন্দ্র। সুপিরিয়রিটি সংঘর্ষের নজিরে আদালতের নথিপত্র ভারাক্রান্ত। বিবেক বিসর্জন দিয়েই আজকাল কাজ করার নিয়ম, ব্যতিক্রমে চাকরি বজায় রাখা দুঃসাধ্য।

তাছাড়া চলমান যুগস্রোতে গা ভাসানো চিরদিনই সুখকর। প্রতিকূলতার ভার বইতে হয় না, উপরন্তু একটি জীবিকার নানা স্বত্ব-উপস্বত্ব। ডক্টর সেনশর্মা পরীক্ষার খাতা দেখেন, ভাল ছাত্রদের দিয়ে নোটবই লিখিয়ে 'এ্যান এক্সপিরিয়ন্‌সড্‌ প্রফেসর' রচিত বলে চালিয়ে দেন, তন্বী তরুণী শিকার করেন। অর্থাৎ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের প্রধানাচার্য হওয়ার যতগুলি সুযোগ-সুবিধা তার কোনোটা থেকেই তিনি বঞ্চিত নন। স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাজনীতিতেও তিনি নিজের বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পেরেছেন। আজকাল সাধনমার্গে সাফল্যলাভ হয় না, কৌশলজাল বিস্তার—সে বিদ্যায় তিনি অগ্রণী। এতকিছুর বিনিময়ে একটিমাত্র বস্তু তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে, বিবেক। ওটি যে কি শব্দ, শুধুই কি অভিধানগত, দেহ অথবা মনে কোথায় তার আবাস-অবস্থান, কিম্বা একটি ভ্রান্ত ধারণা বিশেষ; এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষিত চেতনা আজ ঘোর সন্দিহান।

এগারোটা বেজে গেছে, উঠি উঠি করেও ডক্টর সেনশর্মা উঠতে পারছেন না। বাকি ক'খানা খাতা হয়ে গেলেই একপ্রস্থ দায়মুক্তি। এগারোটা কুড়ির ক্লাশ যখন আর করা সম্ভব নয়, তখন বেলা একটার ক্লাশ করেই আজকের কর্তব্য চুকিয়ে দেওয়া যাবে। খানদশেক খাতা, আধঘণ্টা—। নম্বর যোগ করে ফয়েল-এ তুলতেই যা সময়

খরচ। দ্বি-পরীক্ষা প্রথা, কিন্তু যুগনীতির মূল তো সর্বত্রই একভাবে প্রসারিত। এই কাজটি সহজ সম্পাদনের জন্যে ডক্‌টর সেনশর্মা একটা পারিবারিক চুক্তি করে রেখেছিলেন। নম্বর যোগ করা, রোল-শ্লিপটিতে নম্বর তোলা, তাঁর স্ত্রী অর্পণাই করত —সর্ত প্রাপ্য বিলের সিকিভাগ। এটা অবশ্য খেলাই. কারণ তাঁর উপার্জনের পাইপয়সাটিতে অর্পণারই অধিকার। তবু পরীক্ষার খাতা দেখা বাবদ পারিশ্রমিকের চার আনা অংশ অর্পণা নিজের উপার্জন বলেই মনে করত। এই টাকায় সে ব্যাংকে খাতাও খুলেছিল।

অর্পণাকে খুশি করতে ডক্‌টর সেনশর্মা আর এক ধরনের খেলা খেলতেন, যে কোনো একটা খাতা হাতে তুলে নিয়ে বলতেন, 'বল তো, কত নম্বর দি?' অর্পণা হয়তো চোখ কুঁচকে ভুরু নাচিয়ে বলত, 'বাহাত্তর।' ডক্‌টর সেনশর্মা আঁৎকে উঠতেন, 'কি বলছ তুমি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের খাতায় সরস্বতী ঠাকরুণ নিজে এসে লিখে না দিলে ষাট আসে না!' একথা শুনে অর্পণা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ত, 'বেশ, তাহলে বাহান্ন দাও!' এবার ডক্‌টর সেনশর্মা খাতাখানি উল্‌টে পাল্‌টে দেখে নিয়ে বলতেন, 'ওঃ বাবাঃ, বাহান্ন দিতে হলে অনেকগুলো সাদা পাতায় নম্বর বসাতে হবে দেখছি!' অতঃপর অর্পণার বিরক্ত হবার পালা, 'এতই যদি এই করতে হবে, সেই করতে হবে, তো আমায় জিগ্যেস করা কেন?' অনন্যোপায় ডক্‌টর সেনশর্মার শেষপর্যন্ত অর্পণার কাছে নতি স্বীকার, উত্তরের সাপ-ব্যাঙ বাছ-বিছার না করেই বাহান্ন। অর্পণা খুশি। কখনো আবার তার অনুদার নির্দেশের শিকারও হয়েছে কেউ কেউ। 'একে সাতাশের বেশি দিও না, কি হাতের লেখা, যেন পাচক বামুন বাজারের হিসেব লিখেছে! তোমার দরকার কি এত কষ্ট করে পড়ার, খাতাপিছু ক'টা পয়সাই বা দেয়?' ইদানীং অপর্ণা এই বিশুদ্ধ অনাবিল প্রমোদ ব্যাপার থেকে পাশ কাটিয়ে রয়েছে, কেন তা সে-ই জানে।

অর্পণা বাইরে বাইরে বারকতক সাড়া দিয়ে গেছে, অর্থাৎ পড়ার ঘরের দরজার কাছে এসে উঁচু গলায় চাকরকে ডেকেছে, তপুকে

ধমক দিয়েছে, কোনো এক অভ্যাগতা প্রতিবেশিনীর কাছে জোর গলায় খেদ প্রকাশ করছে, 'তপুর তো এ বছরটা গেল, করি-করি করে ছেলেকে ভর্তি করা হয়ে উঠল না, কারণ কনভেণ্টের প্রিন্সিপালের সঙ্গে ওঁদের ডিপার্টমেণ্টের এক প্রফেসরের ছেলের ভর্তি নিয়ে মনোমালিন্য। তিনি ছেলেকে ওখানে দিলেন না, ইনিও তাঁর দেখাদেখি নিজের ছেলের বিদ্যেটুকু এক বছরের জন্যে হজম করে বসে রইলেন। আমায় বললেন—স্ট্যাণ্ডার্ড থ্রি-র মতন তৈরি করে দাও, পরের বছর ভর্তি করব। ঐ প্রিন্সিপালকে নাকি ওখান থেকে বদলি করে দেওয়ার কথা হচ্ছে, তারপরই সব প্রফেসরের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হবে।'

তবে অর্পণাকে নিয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা সর্বতোভাবেই সুখী। খোসামোদে তুষ্ট সে। জোর ধমক খেলে প্রথমটা একটু চটে ওঠে, কিন্তু অগ্নিবর্ষণের পরবর্তী মুহূর্তেই বারিবর্ষণ। সেকেলে মেয়েদের মতো গাড়ি গহনার বিনিময়ে সোহাগ উগলে দেয়। তাকে খুশি করার জন্যে ডক্‌টর সেনশর্মা বছর তিনেক আগে সস্তাদরে একটা গাড়ি কিনেছেন। তার দরুন অর্পণা তাঁর দুটি দুর্বলতা ক্ষমা করে দিয়েছে। মৃদু ভর্ৎসনা অবশ্য বাদ যায়নি, 'তুমি কি বল তো, তোমার মেয়ের বয়িসী, তাকে নিয়ে তুমি কি কাণ্ডটাই না করলে?'

ডক্‌টর সেনশর্মা বলতে গিয়েছিলেন, 'কে যে তোমার কানে এই বাজে খবর তুলেছে! কল্পনা সেন আমার ডিপার্টমেণ্টের লেকচারার বিনয় দত্তর পাড়ার মেয়ে, বিনয় আমার চেয়ে বয়েসে ছোট, সে পর্যন্ত তাকে ফ্রকপরা দেখেছে।'

অর্পণা তখ্‌খনি মুখের ওপর জবাব দিয়েছে, 'বিনয় দত্ত তাকে ফ্রকপরা দেখে থাকতে পারে, কিন্তু তুমি দেখনি। তুমি তাকে ক্লাশের ছাত্রীরূপেই প্রথম দেখেছ, বাইশ বছরের ধাড়ি মেয়ে।'

ব্যাপারটা ঐখানেই ইতি। আর একটা পাপ কাটাবার জন্যে ডক্‌টর সেনশর্মা অর্পণাকে ফ্রীজ উপহার দিয়েছেন। সম্প্রতি তার রান্নাঘরে অধিকতর আধুনিক আয়োজনও কিছু কিছু ছড়িয়েছেন

—প্রেসার কুকার, কেক-ওভেন, ক্যালগ্যাস। যা হোক, এ সব খেলনা—খেলনা বইকি—হাতে পেলেই অর্পণা সব ভুলে যায়। তাঁর সজ্ঞানে কৃত অপরাধ ক্ষমা করে। ভালবাসে।

এ যুগের বি. এ. পাস হয়েও অপর্ণার গায়ে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ছাপ পড়েনি। দায়ী বাপেরবাড়ির জলহাওয়া। অর্পণার পিতামহ বর্তমান। এখনো গুপ্তমশাই আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়োর মতো কোবরেজী চিকিৎসাব্যবসায় লিপ্ত। ঘৃত মণ্ড বটিকা গুটিকা চূর্ণ অনুপানের জগতেই আছেন তিনি। অর্পণার পিতা বংশগত পেশা ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তিনিও দু'যুগ পিছিয়ে রয়েছেন। স্টেশনারি দোকানের সঙ্গে মুদিখানা। চৌকির ওপর তোশক পেতে বসে খেরো-খাতায় হিসেবপত্তর লেখেন। প্রতি শনিবার বন্ধু দোকানদার সমভিব্যাহারে গায়িকাপল্লীতে গান শুনতে যান, ভোর-রাতে বাড়ি ফেরেন। বাল্যাবধি এই প্রত্যক্ষদর্শনের দরুন অর্পনার মনোভাব যথেষ্ট উদার, রোজগেরে পুরুষমানুষের অল্পবিস্তর 'ও-সব' সে ধর্তব্য জ্ঞান করে না। তবে একেবারে রাশ ছেড়ে দিয়ে নয়।

অর্পণার কর্তৃত্বের আবির্ভাব হল, 'তুমি আজ য়্যুনিভারসিটি যাবে না?'

'যাই কেমন করে, তুমি তো খাতাপত্র দেখা ছেড়ে দিয়ে আমায় ভরাডুবি করে রেখেছ!' মুখে এটুকু অনুযোগ জানালেও ডক্‌টর সেনশর্মা সামনের খাতাখানা সরিয়ে রেখে বলেন, 'এইবার উঠছি, আজ একটা ক্লাশ কামাই গেল।'

'তবু তো বেশ নিশ্চিন্ত, মাইনে কাটা যাবার ভয় নেই যে!' বলতে বলতে অর্পণা সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

ডক্‌টর সেনশর্মা বললেন, 'কাটা গেলেও তোমার হাতে পুরোটাই এনে দেব।'

'তা দেবে জানি, কারণ তোমার আসল মাইনে যে কত, তা তো আমায় জানাওনি কখনো।'

'বললে তুমি তোমার মা'কে চিঠি লিখে দেবে, তিনি হা-হুতাশ করবেন, জামাই এই পচা চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুদিখানা খোলে না কেন !'

অর্পণা হাসল, 'তা সত্যি ! মা বলে, চাকরি মানেই পরের অধীন, তার চেয়ে পানবিড়ির দোকান দেওয়া অনেক ভাল। মা হচ্ছে, আঠারোআনা পতিগতপ্রাণা। বাবা যদি দোকান তুলে দিয়ে চাকরি করতে যান, মা তখন বলবে চাকরির চেয়ে বড় সম্মানের আর কিছু নেই, ভারতের রাষ্ট্রপতিও তো চাকরিই করেন।'

'তুমি ক'আনা পতিপ্রাণা।'

'আঠারোআনা।···দেখ, আমি এবার কিছুদিনের জন্যে সমস্তিপুর যাব ; যাই-যাই করে বছর কেটে গেল, কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠছে না।'

'তা কি হয়, তাছাড়া ক'মাস পরে যখন দ্বিত্ব লাভ করবার জন্যে তোমার যেতেই হবে, তখন—। না, এখন তোমার যাওয়া হতে পারে না।' খুব অনিচ্ছা না থাকলেও ডক্‌টর সেনশর্মা আপত্তি তোলেন, নয়তো অর্পণা এখুনি সন্দেহ করে বসবে তিনি বুঝি কোনো নতুন পরিচয় বাধিয়ে বসে আছেন, অর্পণার বাপের বাড়ি যাওয়ার সুযোগটা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করবেন।

ডক্‌টর সেনশর্মার ইঙ্গিতাত্মক কথায় অর্পণা একটু লজ্জিত হয়, সেই লজ্জা কাটাবার জন্যে জিদ ধরে, 'হতে পারে না, মানে ? আমি আজই মা'কে লিখছি খোকনকে পাঠিয়ে দিতে, এক সপ্তাহের মধ্যেই যাব।'

সংক্ষেপে ডক্‌টর সেনশর্মা জবাব দেন, 'না।'

'বুড়ো তো হয়ে গেছ, এখনো বউ ছেড়ে থাকতে পার না নাকি ?' মৌখিক জিজ্ঞাসা শেষ হয়ে গিয়েও অর্পণার চোখে অনন্ত জিজ্ঞাসা জেগে থাকে।

অর্পণার পুণ্যপবিত্র দৃষ্টির তামাতুলসী স্পর্শ করে ডক্‌টর সেনশর্মা জবাব দেন, 'অর্পণাবালা না হয়ে অপর কেউ এ ঘর আলো করতে এলে এই অভিযোগ আমায় শুনতে হত না।'

অর্পণার খুশির প্রবাহ সন্দেহ নিয়ন্ত্রিত, 'থাক, আমার জানা আছে সব।'

ডক্‌টর সেনশর্মার কপট সরলতা অর্পণার মন্তব্যের সরল অর্থ করে নেয়, তিনি যেন পুনরাবৃত্তির অপবাদ কাটানোর জন্যেই বলেন, 'জানা আছে তো বার বার এক কথা বলাও কেন?'

অর্পণা হাসল, 'দেখ, তোমার স্বভাব যদি একটু খারাপ না হত, তুমি খুব ভাল লোক হতে।'

'তোমার কি দৃঢ়বিশ্বাস, আমার স্বভাব খারাপ?' ডক্‌টর সেনশর্মা গাম্ভীর্যের মুখোশ-আঁটা মুখ নিয়ে প্রশ্ন করেন।

'যতটুকু হয়েছে তার ওপর আরো দু-একটি ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেক হলে তা দৃঢ়বিশ্বাসেই দাঁড়াবে।'

'সন্দেহের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আইন-বিরুদ্ধ।'

'দাম্পত্য আইন আরো একটু কঠিন।' অর্পণা আসল প্রসঙ্গে চলে এল, 'যাক, চান করতে যাও, ডিপার্টমেণ্টে যাবে বলে তো মনে হয় না, কিন্তু খেতে-টেতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, এবার উঠছি।'

ডক্‌টর সেনশর্মা ওঠবার আয়োজন করেন, বাকি খাতাগুলো আজ শেষ হল না। খাতা জমা দেবার শেষ তারিখ কবে পার হয়ে গেছে, পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরি হয়ে যাবে। গেছেও খানিকটা। যাক, কত আর ক্ষতি হয়েছে তাতে! পাশ-করা ছাত্ররা কি এমন সাত সমুদ্র তেরো নদী জয় করতে বেরুবে। ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাদের অসহায়তা বৃদ্ধি হবে বই কমবে না। এখন বরং আছে ভাল, পাশ করার পর কি না কি করব, এই ভাব-সমাধিতে মজে আছে অন্তত!

তপু ঘরে এল, 'বাপী, একটা ছাত্তর এসেছে।' শিশু থেকে বৃদ্ধ, ডক্‌টর সেনশর্মার প্রত্যেক দর্শনার্থীকে তপু ছাত্র বলে উল্লেখ করে। মহিলা কেউ, মেয়ে ছাত্তর।

ডক্‌টর সেনশর্মা প্রশ্ন করলেন, 'কত বড় ছাত্তর?'

'অনেক বড়কা।'

কি যেন ভাবলেন ডক্‌টর সেনশর্মা। উঠে গিয়ে বাইরের দিকের দরজাটা অর্গলমুক্ত করলেন, কিন্তু কপাট না খুলেই ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন, তপুকে বললেন, 'যাও, ছাত্রকে নিয়ে এস।'

'দেরি কোর না কিন্তু!' অর্পণা সাবধানতা দিয়ে চলে গেল।

পরীক্ষার খাতাপত্র আড়ালে সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসু কৌতূহল নিয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা বাইরের দরজার ভেজানো কপাটের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন, কপাট ঠেলে তপু প্রথমে ঘরে ঢুকল, তারপর সে-ই পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন না, ঐ তো স্যার বসে আছে।'

আগন্তুক সত্যি সত্যিই ছাত্র কি না সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত হতে না পেরে ডক্‌টর সেনশর্মা কোনো স্বাগত-সূচক শব্দে সাড়া দিতে পারছিলেন না। কি বলবেন তিনি, এস, না আসুন! এই দ্বিধা থেকে বিমুক্ত হওয়ার আগেই তপুর স্বাগত স্বীকার করে নিয়ে শিলাদিত্য ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে ডক্‌টর সেনশর্মা একটু চমকে উঠলেন, গত সপ্তাহের ঘটনাটা তাঁর সমস্ত চেতনা কিছুক্ষণের জন্যে আচ্ছন্ন করে রইল।

'নমস্কার।' শিলাদিত্য খানিকটা এগিয়ে এল।

'ওঃ, আপনি!' তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা বললেন, 'নমস্কার, নমস্কার। প্রথমটা আমি আপনাকে ঠিক মনে করতে পারছিলাম না।' তারপর কতকটা লজ্জিতের মতো বলেন, 'সেই যে একবার এসে স্ত্রীকে ভর্তি করে গেলেন, তারপর আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বসুন।'

ডক্‌টর সেনশর্মার বিপরীত দিকে চারখানি চেয়ার, মাঝখানে একটি প্রমাণমাপের টেবিল। চারখানি চেয়ারের একেবারে ডান-পাশের চেয়ারটিতে, অর্থাৎ যেখানা ডক্‌টর সেনশর্মার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে বলে মনে হল, সেই চেয়ারটিতে বসে পড়ে শিলাদিত্য বলল, 'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এলুম।'

গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদারতা মিশিয়ে কথা বললেন ডক্‌টর সেনশর্মা, 'তাতে কি হয়েছে, কারো বাড়িতে আসা কি বিরক্ত করতে আসা? অবশ্য এ সময় আমার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু আজ বিকেলে সিনেটের মিটিং—এ্যাড্‌জোরনড্‌ মিটিং—তারই কাগজপত্র দেখতে বসে দেরি হয়ে গেল।' তপুর দিকে ডক্‌টর সেনশর্মার চোখ পড়ল। সে তার আয়ত চোখ মেলে ছাত্রটিকে চিনে রাখবার চেষ্টা করছে, যাতে ভবিষ্যতে এর পুনরাবির্ভাব হলে তার প্রতি পিতার মনোভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে সে নিজের কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারে, বলতে পারে, স্যার বাড়ি আছে, অথবা স্যার বাড়ি নেই।

স্মিত হাসি মুখে নিয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা তপুকে বললেন, 'তপু, ইনি আমার ছাত্তর নন, এঁর স্ত্রী আমার ছাত্তর। এঁকে একটু চা খাওয়াতে পার, তার সঙ্গে তোমার বাবাকেও?'

'হ্যাঁ বাপী।' একটা কাজের ফরমাস পেয়ে তপু খুশি হয়, পিতার নির্দেশের ফতোয়া হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে সে মা'র ওপর খানিকটা কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে।

শিলাদিত্য বলে ওঠে, 'থাক্‌ থাক্‌, এ সময়ে চায়ের জন্যে ব্যস্ত হবেন না, আমি অনেক দেরি করেই এসেছি, একান্ত অসময়ে।'

ডক্‌টর সেনশর্মা তপুর দিকে তাকান, 'তোমার মত কি তপু?'

তপু জবাব দেয়, 'না, আমি চা আনছি।'

তপু ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে ডক্‌টর সেনশর্মা সর্বপ্রথম নিজের মনটাকে একটু গুছিয়ে নেন। শিলাদিত্যর অসময়ে উপস্থিত হওয়ার কারণ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সে আসেনি। হাসি হাসি মুখে ডক্‌টর সেনশর্মা বলেন, 'এ দেশীয় ভাষায় জিগ্যেস করি, আমার উপযুক্ত কি ধরনের সেবায় আমি আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারি?'

শিলাদিত্য হাসল, কিন্তু যেমন দূরত্ব নিয়ে বসেছে ঠিক তেমনি দূরত্বই সে ডক্‌টর সেনশর্মার সঙ্গে সর্বতোভাবে অনুভব করে।

ম্যাট্রিক পাশ করে বছরখানেক কলেজে গতায়াত, তারপর হঠাৎ ধনী হওয়ার বাসনায় দু'বছর ব্যবসা-প্রয়াস, পরে প্রথম প্রচেষ্টায় অসফল হয়ে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় অলস দিনযাপন, সতেরোটা চিরুনি আর পাঁচটা আয়নার সাহায্যে কেশ-বেশ চর্চা, সিনেমায় প্রবেশেচ্ছা, ধনী পিতার সন্তান হয়ে জন্মানোর গৌরববোধ এবং এ সবের সামগ্রিক যোগফল একটি শূন্যময় অঙ্ক ছাড়া তার বর্তমান পরিচয় নগণ্যেরই সামিল। অবশ্য আর একটা পরিচয়ও আছে, সুন্দরী এবং উচ্চ-বংশজাতা শ্রীমতী অনুলেখার পরিচিতি তারই গোত্র এবং পদবীতে। যে অনুলেখার জন্যে সে উচ্চতম সমাজের অন্তরঙ্গতা লাভ করতে পেরেছে সেই অনুলেখারই এক এবং অদ্বিতীয় পরিচয়, সে শিলাদিত্য দত্তর স্ত্রী। নিজের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেককিছুই মনে হয় শিলাদিত্যর, কিন্তু অন্তে এই দাঁড়ায় ডক্‌টর সেনশর্মার চেয়ে সে সর্বাংশেই হীন। শিক্ষাগৌরব এবং প্রতিষ্ঠায় ডক্‌টর সেনশর্মা সাধারণের তুলনায় অনেক উঁচুতে, ব্যক্তির আওতা ছাড়িয়ে ব্যক্তিত্বের পর্যায়ে উপনীত; আর সে যেন ক্রমশই মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষের চেয়েও নিচে নেমে যাচ্ছে।

শিলাদিত্যর সাধারণ বক্তব্য জড়িয়ে আসছে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সে স্পষ্ট শব্দে বলবার চেষ্টা করে, 'অনুলেখা আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছে।'

ডক্‌টর সেনশর্মার বুকে মৃদু আলোড়ন সুরু হয়েই ছিল, তা যেন আরো বেড়ে যায়। সেদিন একটা বড় রকমের ভুলই করে ফেলেছিলেন তিনি। অনুলেখাকে অতদূর টেনে নিয়ে যাওয়ার পর তার বিষটুকু হরণ না করে ছেড়ে দেওয়াটা সুযুক্তির কাজ হয়নি। অনুলেখার সম্মতির অবসরে তিনি যদি তাঁকে আয়ত্ত করে রাখতেন, সে সুখ হয়তো বেশিক্ষণ টিকে থাকত না, কিন্তু স্বস্তিটা আজ এমন-ভাবে ব্যাহত হত না।

মুখের ব্যঞ্জনায় সরল জিজ্ঞাসার চিহ্ন টেনে আনলেন ডক্‌টর সেনশর্মা, 'কেন, বলুন তো?'

'সেদিন আপনার এখানে পড়তে এসে ভুলে বইখাতা ফেলে গিয়েছিল।' তারপর শিলাদিত্য অযাচিত কৈফিয়ৎ দেয়, 'একটু জ্বরের মতন হয়েছিল বলে ক'দিন ক্লাশে যেতে পারেনি, আজ যাবে।'

ডক্‌টর সেনশর্মার অস্বস্তি দূর হয়, শিলাদিত্য টের না পেলেও তিনি নিজে অনুভব করছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর অনুদাত্ত হয়ে পড়ছে, একটা দুশ্চিন্তা মাকড়সার জালের মতো গলায় জড়িয়ে গিয়েছিল, সে জাল এতক্ষণে অপসৃত হয়। 'ওঃ, সেইজন্যে মিসেস দত্তকে ক'দিন ক্লাশে দেখিনি!' তারপর একটু হেসে বললেন, 'আমি তো জানতাম না শরীর খারাপ, পাছে পড়ার অসুবিধে হয়, আমি তাঁর বইখাতা বেয়ারাকে দিয়ে ডিপার্টমেণ্টে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার অফিসেই আছে, ওঁকে বলবেন আনিয়ে নিতে।'

প্রকৃত কথা তো বলা যায় না, সেদিক থেকে অনুলেখাও শিলাদিত্যর কাছে সত্যি বলেনি, বুঝিয়েছে—ডক্‌টর সেনশর্মার বাড়ি পড়তে গিয়ে বই ফেলে এসেছি। তাহলে সেদিন অনুলেখা যতই বিষাক্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে থাকুক না কেন, সে বিষ নীরবে হজম করে নিয়েছে, তাঁর উদ্দেশে কিছুটা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেনি। অনুলেখা বই ফেরৎ না নিয়ে চলে যাবার পর তিনি সেগুলো পোর্টফোলিও ব্যাগে পুরে নিয়েছিলেন, পরের দিন ডিপার্ট-মেণ্টে গিয়ে সে গচ্ছিত সম্পদ নিজের দেরাজে রেখে দিয়েছেন। তারপর থেকে অনুলেখার অনুপস্থিতি তাঁকে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল, কয়েকবার মনে হয়েছে বই ফেরৎ দেবার ছুতোয় একবার তার বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবেন, কিন্তু শেষাবধি এতটা খেলো হয়ে যেতে পারেননি তিনি।

অনুলেখার কি বাস্তবিকই অসুখ হয়েছিল, না ঐ মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া? আজ সে ডিপার্টমেণ্টে আসবে, বই ফেরৎ নিতে অধ্যাপকের একান্তকক্ষে ঢুকবে, বেয়ারাকে দিয়েও চেয়ে পাঠাতে পারে—কিন্তু না, সেদিনকার ঘটনাটা সে তুচ্ছ করে দিতে পারেনি, তাই বই নেবার অজুহাতে এসে নিজের নির্দোষিতা দেখিয়ে

যাবে। কিন্তু তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবেন তিনি, নিরাসক্ত অধ্যাপকের মতো? ভাবতে ভাবতে ডক্‌টর সেনশর্মা শিলাদিত্যর দিকে তাকালেন, তার চেহারার আয়নায় অনুলেখার জীবনের তৃপ্তি-অতৃপ্তি সুখ-অসুখের প্রতিচ্ছবির অনুসন্ধান করলেন। শিলাদিত্য বাস্তবিকই সুপুরুষ, মুখের ভাব চালাকচতুর, কিন্তু তারই মধ্যে থেকে খানিকটা হুতাশ ব্যর্থতা উঁকি দিচ্ছে। এ যেন অনুলেখারই মনোভাবের তথ্যচিত্র। তার জীবনের পুরুষ-পরিপ্রেক্ষিত অঞ্চলে অতৃপ্তির মরুভূমি। অনুলেখা সহমর্মিতা চায়, সেই আয়োজনই করবেন তিনি, ক্রমশ মাত্রা বাড়াবেন। রীতি-নীতি পরিবর্তন করবেন। বিগত অনেকগুলি অভিজ্ঞতার সব সূতোগুলো একত্র করে অনুলেখা-শিকারের জাল টানবেন। তাঁর সান্নিধ্যের তটভূমি পর্যন্ত আসতেই হবে অনুলেখাকে। নিরুপায় আতিথ্য নিতেই হবে।

আঠারো

ন' মাস। বন্দীজীবনের দিনরাত্রি একটু দীর্ঘ তাই, নয়তো সময়টা এমন কিছু অস্তমেয়াদী নয়। প্রীতম কাওরের কাছে জেলখানাটা প্রথম প্রথম খাঁচার মতো মনে হয়েছিল—জায়গাটা বুঝি লজ্জার আকর। কিন্তু এ পরিবেশ ক্রমশ ধাতস্থ হয়ে এল। বরং কিছুদিনের মেয়াদ নিয়ে এখানে না এলে তার স্বভাব বা মনের জড়তা বুঝি ইহজীবনে কাটত না। এ যুগে অচল এমন খানিকটা মানসিক দুর্বলতা তার প্রতিটি কাজ ও প্রয়াসে বিঘ্ন সৃষ্টি করত।

প্রীতম কাওরের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট হয়েছে পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় জিনিষটা সর্বত্রই অপ্রচুর, আয়োজন সবখানেই যৎসামান্য, লুব্ধ হাতের প্রতিযোগী অগণ্য এবং তা আবহমানকাল ধরে লোলুপ। কোনোকিছু লক্ষ্য করে এগিয়ে যাওয়ার পর উপলব্ধি হয় অনেকগুলি বাসনা আগেভাগেই সেখানে উপস্থিত। যদি বা সামান্যতম কিছু পড়ে থাকে তা-ও সংগ্রহ করার পথে নানা বিঘ্ন, অপরিমেয় বাধা। চক্ষুলজ্জা ও ক্লিন্নতাবোধ।

কারাদণ্ড এগারোমাস, দু'মাস ছুট্ গেছে। এই একশ একরের জগৎটিতে প্রীতম কাওর অনেক বিচিত্র মানুষ ও বস্তুর দর্শনলাভ করেছে, অশেষ বৈচিত্র্যময় কথাবার্তা শুনেছে, আর অসংখ্য উপমান চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের প্রকৃত মাননির্ণয়ের অবসর পেয়েছে। কখনো মনে হয়েছে, বহু পূর্বেই দীর্ঘতম মেয়াদ নিয়ে তার এখানে আসা উচিত ছিল। আবার বিপরীত চেতনার বিদ্রোহভাবও জেগেছে, এ জায়গায় তার নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত হয়নি মোটেই। আইনের ফস্‌কা গেরোয় বহু জঘন্য অপরাধে অপরাধীও শাসনমুক্ত হয়ে সমাজের সর্বত্রই বিচরণ করে, তুলনায় তার অপরাধ অণুপরিমাণ। শূন্যসমান।

জেলখানায় ভর্তির দিন স্বাস্থ্যপরীক্ষায় ওজন হয়েছিল সাতচল্লিশ কেজি। প্রথম ধাক্কায় তা নিম্নগামী, তারপর মনের বিপর্যস্ত ভাবটা

থিতিয়ে আসার পর গায়ের টাইট কোর্তা আরো আঁট হয়ে গেল, শরীর ভারি ভারি, ছোট হাত-আয়নায় যতটুকু মুখ দেখা যায়, বেশ পুরন্ত। কারাবাসে আসার আগে গায়েমুখে পর্যাপ্ত রঙের ব্যবহার চলত, তাই আসল বর্ণ যে তার কি তা প্রীতম কাওর নিজেই ভুলে গিয়েছিল, এখানে আসার পরই সে যেন আবিষ্কার করল নেহাৎ খুঁৎখুঁতে নিন্দুক-প্রকৃতির মানুষ না হলে তাকে গৌরবর্ণই বলবে। সেই রং ক্রমশ অবিসংবাদী উজ্জ্বলগৌর হয়ে উঠল, কালক্রমে তার ওপর খানিকটা লালিমার স্পর্শ মুখরিত হল। প্রীতম কাওরের মনে হল মাত্র দেড়-দু'মাসের নিশ্চিন্ত অবসরে যৌবনা প্রকৃতি তাকে নিজের শিল্পপট নির্বাচিত করে যেভাবে সাজিয়ে চলেছে তার নিজস্ব প্রয়াস কখনো ততটা সফল হয়নি।

দুটিমাত্র জিনিষের আন্তরিক অভাব অনুভব করেছিল প্রীতম কাওর। নিয়মিত অল্পপরিমাণ মদ্যপান ও মাঝেমধ্যে পুরুষসান্নিধ্য। সামান্য ইঙ্গিত দিলে দুটি জিনিষই জুটে যেতে পারত, একের বিনিময়ে অপরটি সহজেই; অধিকন্তু বহুবিধ সুখসুবিধা। কিন্তু ভেতরকার চাহিদা সে তার বাহ্যিক নিস্পৃহা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল অর্থাৎ কারা-জীবনটাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে তার আন্তরিক মর্ম উপলব্ধি করতে চেয়েছিল।

জেল-ওয়ার্ডার, জৈব জগতে যার পরিচয় নারীরূপেই, একদিন প্রস্তাব তুলেছিল, 'পাঁচজনের সঙ্গে আপনার থাকতে যদি অসুবিধে হয়, একটা ব্যবস্থা করতে পারি।'

'কি?'

'ফার্স্টক্লাশ ওয়ার্ডে একখানা ঘর খালি আছে।'

'মাঝরাতে কেউ আবার বিছানায় ভাগ নিতে আসবে না তো?'

জবাব এড়িয়ে ওয়ার্ডার বলেছিল, 'আপনার খাওয়ার কষ্টও খুব, রোজ লক্ষ্য করি—'

প্রীতম হেসে ফেলেছিল, 'তোমার যদি দালালির ব্যবস্থা থাকে তাহলেই আমি এসব কথার উত্তর দেব, নয়তো নয়। কিন্তু নায়কটি

কে, এক না একাধিক ব্যক্তি? তবে তোমার কথা শুনে মনে হয় প্রস্তাবটা বেশ উঁচুতলা থেকেই এসেছে, কিন্তু এদের দলে এক-নম্বরেরটা মহিষ, দু'নম্বরের ব্যক্তিটি বলদ, আর তিন-নম্বরটি বোকাপাঁঠা। ওরা সব তোমারই যোগ্য পুরুষ, আমার নয়। লোভে পড়ে নিজের জিনিষগুলি ছেড়ে দিও না, এই আমার অনুরোধ।'

বর্ধিত ওজন, ঘষা-মাজা শরীর ও উজ্জ্বল-অভিজ্ঞ প্রজ্ঞা নিয়ে প্রীতম কাওর জেল থেকে বেরিয়ে এল, আশা করেছিল তার স্বাগত সংবর্ধনার জন্য না হলেও অন্তত সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পিতা সুজন সিং ও ভাই কুলদীপ জেলগেটে উপস্থিত থাকবে, ফটকের এপারে চলে এসে সে তাদের প্রণাম করবে, এক নিমেষের জন্যে পাপ্পুর সুবিশাল বুকের মধ্যে নিজের লজ্জাপীড়িত মুখটাকে লুকিয়ে রাখবে। যদিও প্রকৃত লজ্জা তার আর নেই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে তথ্য সর্বসমক্ষে ভাঙবেই বা কেন?

কেউই আসেনি। জেল থেকে ফেরৎ-পাওয়া সুটকেশটা ফটক ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে নামিয়ে রাখল প্রীতম। খুব ভারি নয় অবশ্য, এর চেয়ে অনেক বেশি বোঝা সে স্বচ্ছন্দে বয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু রিক্সার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সবেমাত্র কাক-ডাকা ভোর হয়েছে, হয়তো বা একটু সকালই, কিন্তু পথচারী বা সওয়ারীর গতায়াত তেমন আরম্ভ হয়নি।

মাসে একবার সুজন সিংএর সাক্ষাৎকার ছিল। ইদানীং সে বেশ নির্ভীক হয়ে উঠেছিল, প্রীতমকে গ্রাহ্যই করত না। মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে জেলগেটে দাঁড়িয়ে স্টেট লটারির টিকিট বিক্রি করে যেত বিশ ত্রিশ পঞ্চাশটা—বিক্রি মন্দ নয়।

গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়া নয়, প্রীতমের সাক্ষাৎ সেরে বাইরে এসে বাজখাঁই গলায় পুকার, 'আইয়ে, তগদীর

অজমাইয়ে—এক রূপায়ে মে একলাখ পাঁচলাখ—বা রে বাঃ, ক্যা খু-উ-ব!'

লোহার মেনগেট, তারপর একটা কাঠের ফটক, তখনো প্রীতম কাওর একেবারে ভেতরে চলে যায়নি, দুই ফটকের মধ্যবর্তী বারোহাত দীর্ঘ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বাপকে লক্ষ্য করছে—আবার একমাস, তৎপূর্বে এদিকে আসবে না পাপ্পু। সুজন সিংএর হাঁক শুনে প্রীতম ফিরে এসে লোহার গেটে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়ায়; চাপা বিরক্তি ও অনুনয়মিশ্রিত স্বরে ডাকে, 'পাপ্পু!'

ডাক শুনে সুজন সিং কাছে এগিয়ে আসে, ইতিমধ্যে চায়ের ট্রে-খানা গলায় ঝুলিয়ে সে অফিস সাজিয়ে ফেলেছে। ট্রে-খানির ওপর বিভিন্ন রাজ্যের লটারির টিকিটবই। কোনোটি বেশ মোটা, কোনোটা প্রায় নিঃশেষিত। সুজন সিংএর হাতে ডট্‌পেন। 'কি ব্যাপার, ডাকলি কেন?' সুজন সিং প্রীতমের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার খুঁৎখুঁতে পিতৃ দৃষ্টিতেও মনে হয় বেশ ভাল আছে প্রীতম, সুখে আছে, শরীর সেরেছে—বার বার দেখেও আশ মেটে না।

'তুমি বন্ধ করবে কি না?'

'কি?'

সুজন সিংএর গলার ট্রের দিকে প্রীতম আঙুল দেখায়, 'ঐ—। তুমি কি মনে করেছ আমি আর জেল থেকে বেরুব না?'

জেলগেটের হাবিলদার এ ক'মাসের মধ্যে চিত্রটা বারকতক দেখেছে, জেলের আসামী প্রীতম, তাই তাকে তুম সম্বোধন করে বলে, 'কাহে বুঢ্‌ঢাকো তং করতি হো জী? অপনা রোজগার ক্যা খারাব হ্যায়? এ সর্দারজী, হামকো পাঁচলাখবালা এক টিকস দেও—অবকী নম্বর লাগেগা ন?'

'কিঁউ নহী জী?' পাঁচলাখের টিকিটের কাউন্টার পার্টে সর্দার সুজন সিং নাম লেখে, মূলধন পাঁড়ে, ঠিকানা জেলগেট। বারদুই এ নামটা লিখে মুখস্থ হয়ে গেছে। তাছাড়া নামটারই এক বিশেষত্ব, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার দরকার হয় না।

টিকিটটা হাবিলদার মূলধন পাঁড়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে সর্দার সুজন সিং জিগ্যেস করে, 'এ হাবিলদার সাহাব, তুম কিস্‌কা মূলধন হো জী?'

মূলধন পাঁড়ে গেটের ছড়ের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে টিকিট নেয়, বাঁ হাতের তালুর উল্‌টো পিঠে পুরুষ্টু গোঁফের দুটি প্রান্ত মেজে নিয়ে জবাব দেয়, 'আরে সর্দারজী, থা তো ম্যায় বাপকা মূলধন, লেকিন বহ বেচারা মেরে পাঁচ বর্ষ কী আয়ু মে হী ডেথ্ কর গয়ে, আওর মা বেচারী গয়ী সাত মে, অব ম্যায় পাঁড়াঈন কা হী মূলধন হুঁ।'

সর্দার সুজন সিং রহস্যময় কণ্ঠে হেসে ওঠে, 'তব তো পাঁড়াঈনজী কে নাম সে ভী এক পাঁচলাখ কা টিকস লেনা চাহিয়ে জী?'

একথা শুনে মূলধন পাঁড়ে আঁৎকে ওঠে যেন, 'আরে রাম রাম, য়হ কভী নহী করনা চাহিয়ে। পাঁচলাখ পাঁড়াঈনকে হাঁথ লগ্ যাই ন, তো মুঝে ফৌরন ডাইভোস কর দী-ঈ। পাঁড়াঈন বড়ী আপ্-টু-ডেট্ বা, সুনিমা দিখি রোজ!'

এদের বাক্যালাপের মাঝে প্রীতম কাওর কূল পায় না, অগত্যা ক্ষুব্ধ অভিমানের সঙ্গে বলে, 'আমি তাহলে যাচ্ছি পাপ্পু?'

'যা না!' সর্দার সুজন সিং প্রীতমকে আমলই দেয় না, ইতিউতি তাকিয়ে পাঁচলাখের মক্কেল খোঁজে।

আজ জেল গেট পার হওয়ার সময় হাবিলদার মূলধন পাঁড়ে প্রীতমকে জিগ্যেস করে, 'সর্দারজী আয়ে নহী আভি তক্, তুম্‌হারা ভাই ভী নহী? আজ হম টিকস লেনে কে লিয়ে তৈয়ার আয়ে থে।'

যা চাক্ষুস তার আর উত্তর কি, প্রীতম কাওর জবাব দেয় না, হাত বদলে সুটকেশটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে জেল গেট পার হয়ে আসে।

রিক্সার দর্শন নেই, কিন্তু রিক্সাগুলো এসে যেখানে দাঁড়ায় সেখানে তালপাতা-ছাওয়া একটা ছোটখাট চা-পানের দোকান দেখা গেল। গেটের এপারে কয়েকবার পা দেবার সুযোগ হয়ে থাকলেও

দোকানটা ইতিপূর্বে প্রীতমের নজরে পড়েনি। স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে সে ওদিকেই পা বাড়াল। একমুহূর্ত ভাবল, স্যুটকেশে আছে তো কিছু, মনে পড়ল আছে দু'তিন টাকা—এখনকার মতো যথেষ্ট ও প্রচুর।

সিদ্ধ পাতার বিস্বাদ চা, তায় ধোঁয়াগন্ধ দুধ, মিয়নো বিস্কুট, অখাদ্য সবই ; তবে দোকানদারের সৌজন্যমূলক ব্যবহার এ অভিযোগ অনেকটা খণ্ডন করে দেয়। প্রীতম কাওরকে নিয়ে প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে, মাইজী বলবে, না দিদি! এত সুন্দরী মেয়েকে মাইজী বলতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু দিদি ডাকটাও দোকানদারের উপযুক্ত সম্বোধন মনে হল না, তাই সবদিক বজায় রেখে সে প্রীতম কাওরকে মেমসাব বলেই কথা আরম্ভ করল। 'আইয়ে মেমসাব।' তারপর শতাধিকবার মেমসাব ডাক আর সমসংখ্যক প্রশ্ন। কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কি কাজ! পাঁচটি প্রশ্নের অন্তত একটির উত্তর দিতে হচ্ছে প্রীতমকে। তার নিজেরই গরজ, দোকানের এই তালকাঠ-কাটা বেঞ্চিতে বসে সে রিক্সার অপেক্ষা করছে।

শেষপর্যন্ত প্রীতম কাওর জিগ্যেস করে, 'এখনো অবদি একটা রিক্সার দেখা নেই, কখন আসে ?'

দোকানদার হাসল এবার, 'আপনি জানেন না মেমসাব, আজ তো রিক্সা মিলবে না!'

'মিলবে না—কেন ?'

'হরতাল, মেমসাব।'

হরতাল! শহর তিন মাইলের ওপর, এতখানি রাস্তা হেঁটে যেতে হবে, সঙ্গে বোঝা। প্রীতম কাওরের ভেতরটা এবার ভরা বিরক্তিতে ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করে। হরতালের কথা তার জানা না থাকতে পারে কিন্তু ভাই কুলদীপ সিং, পাপ্পু, সর্দার সুজন সিং, এদের তো না জানার কথা নয়! আজ তারা আসেনি কেন—প্রীতমকে ত্যাগ করেছে? তা তো মনে হত না! মোকর্দমার

সময় পিতাপুত্র দুজনেই পাশে পাশে থেকেছে। সুজন সিং প্রতিটি তারিখে প্রীতমকে সাজিয়ে গুজিয়ে মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেট মুখার্জি-সাহেবের এজলাসে নিয়ে গেছে, সাহস দিয়েছে। লজ্জা ত্যাগ করতে শিখিয়েছে। জামিনের দিন থেকে রায় বেরুবার দিন, প্রতিটি মুহূর্তেই সুজন সিং প্রীতমকে নিজের বলিষ্ঠ বাহুর ভরসায় রেখেছে। প্রীতমকে এজলাসে পৌঁছে দিয়ে সে লটারির টিকিট বিক্রি করতে বেরুত, ফিরে ফিরে এসে দেখে যেত বার বার। তাছাড়া তরুণী এবং বলতে গেলে প্রায়বিদেশিনী আসামী-দর্শকদের ভিড় থেকে প্রীতমকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ভাই কুলদীপ সিং সর্বক্ষণ কাছে-পাশেই থাকত। সকলেই হাঁ করে প্রীতমের দিকে তাকিয়ে, শুধু ঐ মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেট সতীশচন্দ্র মুখার্জি ছাড়া। প্রীতমকে যখন আসামীর কাঠগড়ায় ঢুকতে হত তখনই লোকটা তাকাত একবার। তাও প্রীতমের মনে হত সে তাকে দেখে না, দেখে আসামীর কাঠ-গড়াটা ভর্তি হল কি না। বয়েস কত লোকটার? পঁয়ত্রিশ, বড়জোর সাঁইত্রিশ আটত্রিশ! বিবাহিত নিশ্চয়ই। কিন্তু এমন নির্মোহ কেন? বউ বোধ হয় পরমাসুন্দরী, তাই এদিক ওদিক তাকাবার দরকার হয় না, নয় হত-কুৎসিত; তাই দেখে সাধারণ নারীরূপ সম্বন্ধে তার এক ভ্রান্ত ধারণা হয়ে গেছে।

প্রীতমের উকিল বার বার বলেছে, 'আপনি বলেন তো মিস কাওর, আমি অফিসে ঘুষ-ঘাস দিয়ে আপনাব কেস ট্র্যানস্ফার করিয়ে নিই, এ যা কোর্ট, বাঁধবার রায়ই লিখতে জানে, খালাস দেওয়া ওর গুরুর নিষেধ।'

কে জানে কেন, সেকথা প্রীতমের বিশ্বাস হয়নি, 'না উকিলসাব্, যেখানে চলছে সেখানেই চলুক।'

উকিল বিরক্ত, 'চলবে আর কি, ও আপনাকে মামারবাড়ি দেখিয়ে ছাড়বে।'

স্নিগ্ধ হাসি হেসেছে প্রীতম, 'তাহলে তো ভালই, আমি আমার মামারবাড়ি দেখিনি, পাপ্পু মাকে কখনো বাপেরবাড়ি যেতে দেননি।'

প্রীতম কাওরের উকিল সর্দার সুজন সিং ও সর্দার কুলদীপের কাছে এজলাস-বদলের প্রস্তাব তুলেছে, কিন্তু দুজনেই ঘাড় নেড়েছে, 'না উকিলসাব্, প্রীতম বড়ী জিদ্দী, ওর যখন খাইস নেই—'

প্রীতমের দিকে তাকিয়ে নয়, কাঠগড়ার খাঁচাটাকেই যেন হাকিম মুখার্জিসাহেব রায় শুনিয়েছে, 'এগারোমাস— '

সেই সময় প্রীতমের যে কথাটা আবার মনে হয়েছে, লোকটার বিবি হয় খুব সুন্দরী-হাসীনা, নয় হত-কুৎসিত ; না হলে আমার মুখের দিকে একবার না একবার তাকাতই।

জেলে এলেও প্রীতম কাওর একঘরে হয়ে পড়েনি, বরং এই কারাবাস সমগ্র পরিবারটির কাছে তার এক বিচিত্র এবং দুঃসাহসিক অভিযানের মতো মনে হয়েছিল। পাপ্পা্ সুজন সিং লটারির টিকিট বিক্রি করতে করতে জেল পর্যন্ত এসে পড়ত, তারপর উপযুক্ত জায়গায় আবেদন জানিয়ে কন্যার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে ফিরত ; কিন্তু ভাই কুলদীপ সিং একা আসেনি কখনো। প্রীতমের স্কুটারটা ইদানীং সে-ই ব্যবহার করে—স্কুটারের সামনে স্যাম্পেন দাঁড়িয়ে, পেছনের আসনে হুইস্কি, তারাও পিসির সঙ্গে দেখা করে যেত। শেরী আর ভ্রাতৃবধূ অমৃত কাওর অবশ্য আসেনি কোনোদিন, কারণ অন্য কিছু নয়, তাদের স্বভাবই ঘরকুনো।

কুলদীপ সিং বলেছিল, 'তোর দুটো ফেয়ার প্রাইস সপের লাইসেন্স খারিজ হয়ে বাজেয়াপ্ত মাল তো কবেই সরকারী গুদোমে চলে গিয়েছিল—এখন মিছিমিছি ঘর দুটো আটকে রেখে ভাড়া গোনা কেন? বলিস তো মালিকের কাছে মোটা খেসারৎ আদায় করে ছেড়ে দি ?'

লাইসেন্স খারিজ হবে জানা কথা—যতদিন মোকর্দমা চলেছে খারিজ না হয়ে স্থগিত ছিল—ভবিষ্যতে লাইসেন্স আর পাওয়া যাবে না। আহা, কি মালই বা বাজেয়াপ্ত হয়েছে! মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত তিন-চার বস্তা দুর্গন্ধ চাল, তাতে কিলো-পিছু দেড়শ গ্রাম কাঁকর। পাঁচ বস্তা সারহীন মার্কিনী গম, আর দু'বস্তা ভিজে

চিনি। সরকারী স্তরে বিপুল বাটপাড়ির পর মন্দভাগ্য ব্যবসায়ীকে অল্পবিস্তর চুরির অবকাশ দেওয়ার উদ্দেশেই তো ফেয়ার প্রাইস সপ। লাভের মার্জিন যা দেয় তা ঐ সাপ্লাই ইনস্‌পেকটরের খোরাকী বাবদ। দোকানদারের ভাগে কিছু ভুয়ো কার্ডের কারচুপি ও কম ওজনের বাটখারা—তার পেছনেও আবার আইনের কুকুরের লোলুপ পাহারা। কারো অংশের প্রাপ্য কিছু ঘাটতি হলেই সর্বনাশ, যার ফলে প্রীতম কাওরের কারা-গতি।

কুলদীপ্‌ সিংএর কথা শুনে কিছুমাত্র চিন্তা করেনি প্রীতম, দোকান নাকচ হয়ে যতটুকু ক্ষতি হয়েছে শৃঙ্খলমুক্তির পর সে অন্যপথে তার শতগুণ খেসারৎ তুলে নেবে। জেলে আসার ফলে লাভই হয়েছে একদিক দিয়ে—প্রীতম কাওর নামটা শহরের ব্যবসায়ী মহলে ছড়িয়ে গেছে। তার যুগোপযোগী কর্ম ও মননশীলতা স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখান থেকে অবকাশ পাওয়ার পর আর অসুবিধে হবে না, ব্যবসায়ের সরিক অনেক জুটবে। এগারোমাসের মেয়াদ, যা হয়তো কেটেছেঁটে কিছুটা কম হয়ে যাবে—তার ব্যবহারিক জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয়পত্র হয়ে রইল।

প্রীতম জানতে চেয়েছে, 'বেশ, দোকানঘর ছেড়ে দিলে মালিকরা আমায় কত সেলামী দেবে?'

'একজন বলেছে তিনহাজার, আর একজন দু'য়ের বেশি উঠতে চায় না।'

'তো তিন-টা নিয়ে ঘর খালি করে দাও, দুই-টা আটকে রাখ, মেয়াদ শেষে বেরিয়ে আমি ওখানে অফিস খুলব।'

'কিসের অফিস?'

'জানি না।' জেল অফিসে জেলারের সুমুখে বসেও হাসতে হাসতে প্রীতম কাওর টেবিলের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, 'তবে অফিস থাকলে তার একটা কাজও থাকবে বইকি। কলদীপ ভাই, সুবিধে মতন একটা টাইপরাইটার পেলে কিনে রেখ তো!'

'হরতাল কি জন্যে?'

'কাল টিশন চকে একজন রিক্সাওয়ালাকে ইসটুডেনরা ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছে, তাই।'

'মারল কেন?'

সাদামাটা ভাষায় দোকানদার বিজ্ঞপ্তি দেয়, 'চারজন সওয়ারী নিয়ে যেতে চায়নি রিক্সাওয়ালাটা, সেইজন্যে মেমসাব।'

প্রীতম কাওর কতকটা যেন স্বগত স্বরে প্রশ্ন করে, 'হরতালে কি লাভ হবে?'

প্রশ্নটা বুঝি তাকেই করা হয়েছে, দোকানদার ঠোঁট উল্টোয়, যা হয়, যা হচ্ছে, ও যা হবে এবং যা ছাড়া আর কিছুই হবার সম্ভাবনা নেই, সেই কথাই জানায় সে, 'হবে আবার কি মেমসাব! একদিন জিরেন নিয়ে মদ-ভাং খেয়ে গায়ের ব্যথা শুকোবে, বিকেলের দিকে একটা লিডার ধরে এনে ময়দান জুড়ে মিটিং বসাবে, পরের দিন আবার রিক্সা নিয়ে টিশন চকে হাজির হবে, মেমসাব।' তারপর লোকটি নিজেদের দলগত রহস্যও ব্যক্ত করে ফেলে, 'দোকান হরতাল হলে আমরা যে তাই করি মেমসাব!'

অগত্যা তালকাঠ-কাটা বেঞ্চি ছেড়ে প্রীতম কাওর উঠে দাঁড়াল। সুটকেশ খুলে পয়সা বার করে দোকানের পাওনা মিটিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিতে প্রস্তুত হল সে।

দোকানদার জিগ্যেস করে, 'আপনি হেঁটেই শহর যাবেন মেমসাব?'

ক্ষীণ হতাশ স্বরে প্রীতম জবাব দেয়, 'তাছাড়া উপায় কি?'

'যদি জেল ঠিকেদারের লরিতে যেতে চান, ব্যবস্থা করে দিতে পারি মেমসাব।'

আবার বসে পড়ল প্রীতম, 'পাওয়া যাবে?'

প্রীতমকে বসতে দেখে লোকটি প্রীত হল, আপ্যায়িত কণ্ঠে বলল, 'যাবে মেমসাব, ন'টায়। জেলে মাল খালাস দিয়ে ন'টার সময় লরি ফেরে, ড্রাইভার আমার দোকানে চা

খেয়ে শহরে যায়। আমি বললে আপনাকে পৌঁছে দেবে, মেমসাব।'

ঘড়ি নেই প্রীতমের হাতে, এ দোকানে সে খোঁজ করাও বাতুলতা। আকাশের সূর্যটাই একমাত্র ঘড়ি এখানে। নিজের খালাসের সময় ধরে উপস্থিত সময় আন্দাজ করল প্রীতম—এখন আটটা হবে, বড়জোর সাড়ে আট। আরো ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষা!

নিরুপায় ভাব নিয়ে প্রীতম কাওর রাস্তার দিকে তাকায়। সারা রাস্তাটাই যেন মরে আছে। দু'একজন পথচারী, এক-আধটি সাইকেল। প্রীতমের মনে হল কোনো তরুণ সাইকেলারোহীকে দাঁড় করিয়ে তার পিছুতে বা সুমুখে চেপে বসে, সুটকেশটা হাতে ঝুলিয়ে নেয়। কিন্তু অপরিচিত পথিক রাজি হবে কি? এ দেশে রেওয়াজ নেই। শহর লাহোর হলে এত ভাবনা ছিল না।

আত্মানুসন্ধানে তৎপর হল প্রীতম। কাঁধকাটা কোর্তার নিচে অবারিত হাতদুটো, আর বুক থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করল। দেখার পর নিজের ওপর অনেকখানি আস্থা জাগল তার। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

সাইকেল নয়, জনকয়েক সওয়ারী সমেত একটা টমটম্। জায়গাও আছে একটু। দোকানের বেঞ্চি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল প্রীতম, হাত দেখিয়ে টমটম্ থামাল। নিজের বিপত্তি নিবেদন করে গাড়িতে উঠে পড়ল। এতক্ষণে বাড়ি ফিরে যাবার মতো একটা ভরসা পেয়ে একটু স্বস্তি পেল সে। গাড়ির ঝাঁকানির সুযোগে একজন আরোহী যেন তার দেহাঞ্চলে নিঃশব্দ অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করছে—বিশেষ আপত্তিজনক স্থানগুলিতে নয় অবশ্য। প্রীতম কাওর বিরোধ করল না, সংকুচিত হয়ে বসবার চেষ্টাও না, বরং কর্ম-তৎপর ব্যক্তিটির পাশে নিজেকে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ করেই ছড়িয়ে দিল। তিন সাড়ে-তিন মাইল রাস্তা আড়ষ্ট হয়ে বসে যাওয়ার চেয়ে সাধ্যমতো গুছিয়ে নেওয়াই ভাল। তার এ যাত্রাটা যে আরোহীদের দাক্ষিণ্যবশতই সম্ভব হয়েছে, তা আর মনে রইল না। বরং সে যে

একজনের কাছে এ দানের মূল্যচুক্তি দিতে দিতে চলেছে সেই বোধটুকু তার সমস্ত কুণ্ঠা হরণ করে নিল।

স্বস্তির ছোঁয়া পেয়ে প্রীতমের আবার বাড়ির কথাই মনে পড়ে। পাপ্পা সুজন সিং, ভাই কুলদীপ সিং—কেউ তাকে নিয়ে যেতে এল না কেন? তাহলে কি তারা শুধু তার কারাজীবনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই দেখা করতে যেত; মানে প্রীতম কাওর আজ জীবন সমাজ ও সংসারে একা!

একক যাত্রায় প্রীতম কাওর ভয় পায় না। বর্তমান দুনিয়ার নিয়মাফিক চলায় তার দ্বিধা-সংকোচ নেই। বরং অন্যের তুলনায় সে দশ পা এগিয়ে থাকে। কিন্তু প্রীতম পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে বাস করতে চায়, প্রেম ভালবাসা নিয়ে বাঁচতে চায়। আত্মীয় বন্ধু প্রেম প্রীতি এসব অনুভূতির কোনো পরিবর্তন সে চায় না। যে মানুষ যুগের বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে না পড়বে তার জীবনে এ কামনা ও ভাব থাকবেও। আর এগুলিকে মন থেকে নির্বাসন দেওয়ার অর্থ অস্থির যুগের কবলে পড়ে আত্মনিঃশেষিত হয়ে যাওয়া। প্রতিটি যুগ তো চিরদিনই অস্থির, তাই তা ভবিষ্যতের আহ্বায়ক। বর্তমান যুগের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চায় না প্রীতম কাওর, তার কবলিত হতেও চায় না, সমস্ত ঐশ্বর্য ও অভিশাপ সমেত সমগ্র যুগটাকে করায়ত্ত করতে চায় সে।

বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে বিক্ষিপ্ত চিন্তাস্রোতের উত্তেজিত তাড়নায় প্রীতম কাওর বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অলক্ষ্যের নির্বাসন থেকে অজস্র অশ্রুধারা এসে তার দুটি চোখ ভরিয়ে তোলে।

বাড়ি পৌঁছেই প্রীতম সর্বাগ্রে পাপ্পা সুজন সিংএর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি আমায় আনতে যাওনি কেন পাপ্পা? তুমি, তোমরা কি আমায় ত্যাগ করেছ, একঘরে করেছ? কি দোষ প্রীতমের, বাঁচতে চেয়ে কি অন্যায় করেছে সে? সবার মাথা ছাপিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাওয়া কি অপরাধ? তোমাদের প্রীতম আত্মীয়-পরিজন চায়, ভালবাসা চায়, জীবনসঙ্গী চায়, আদর করবার জন্যে

প্রাণভরে চটকাবার জন্যে সন্তান চায়, সেইসঙ্গে কিছুটা মানসম্মান ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠা। প্রীতম অসৎ পথে চলেছে, চুরি করেছে—না, আর এ কাজ করবে না, যদি তোমরা সত্যিই তাকে বাতলে দিতে পার কোন্‌টা সৎপথ, কোন্ পথে চলার জন্যে নিষ্ঠাই একমাত্র সহায় এবং সাফল্য অবধারিত। তোমরা কি পারবে প্রীতম কাওরকে তার লাহোরের দিনগুলি ফিরিয়ে দিতে? সেখানে থাকতে তার ভবিষ্যৎ যে ছবিটির মতো আঁকা হয়ে ছিল, ঠিক তেমনি এক ছবির মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে? যদি না পার প্রীতম নিজে তার পথ খুঁজে নেবে, তোমরা শুধু তাকে ভালবেসো, একঘরে করে দিও না। এ যুগের কঠিন বুক হু'পায়ে মাড়িয়ে তাকে দাঁড়াবার সাহস দাও, চঞ্চল ভূমিকম্পে তলিয়ে যেতে দিও না।

হুইস্কি আর স্যাম্পেনের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মেরে প্রীতম বলবে, তোরাই বা তোদের পাপ্পুর সঙ্গে গিয়ে আমায় নিয়ে আসিসনি কেন? এরই মধ্যে এত—এখনই তোদের মনে নীতি-দুর্নীতির বিচার খাড়া হয়ে গেছে, এখনই। এই তো সবে পৃথিবীতে এসেছিস, ভাল-মন্দর বিচার হাজার বছরেও শেষ হয় না, আর তোরা সব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়েছিস? এরপর বাকি জীবনটা নিয়ে কোথায় দাঁড়াবি? তোদের চোখ দিয়ে দেখলে সারা দুনিয়াই তো গোরস্থান, দাঁড়াবার জায়গা কোথাও আছে কি? আজকের যুগে মৃত্যু ছাড়া স্পর্শ বাঁচিয়ে চলায় উপায় নেই কোনো। কিন্তু বেঁচে থাকাই আমাদের জীবনমন্ত্র।

উনিশ

বাড়ির সুমুখে লোকারণ্য, গুরুদ্বারার অন্তর্ভূত শিখ সম্প্রদায়ের একটা মানুষও বাদ যায়নি। এ পাড়ার বাসিন্দা দেশওয়ালীও কয়েকজন। নিজেদের ইচ্ছেমতো বাড়ির মধ্যে ঢুকছে, বেরিয়ে আসছে। সুটকেশটা হাতে ঝুলিয়ে এটুকু পথ হেঁটেই আসছে প্রীতম কাওর। জনতার নজর এখনো তার দিকে পড়েনি, সে-ই জনতার মর্জি মতি বিচার বিশ্লেষণ করতে করতে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। গতি অবশ্য শঙ্কা-মন্থর।

এতগুলি মানুষের জটলা কেন? সকলেই যেন উত্তেজিত উদ্বিগ্ন ব্যস্ত, কিন্তু প্রায় নীরব। মূক-মৌন! এ মিছিলের উদ্দেশ্য দুটি হতে পারে। আজ প্রীতমের খালাসের দিন, জানে সবাই—তার স্বাগতের জন্যে জনসমাবেশ। কিন্তু এতগুলি মানুষের যদি এতখানি আন্তরিকতা তাহলে জেলগেট পর্যন্ত একজনও কেন অগ্রিম স্বাগত নিয়ে পৌঁছুল না? তাছাড়া এদের উত্তেজনা ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর সাড়ম্বর নয়!

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ, সম্ভাব্যই নয়, একান্ত নির্ঘাত—এত লোক প্রীতমের গৃহপ্রবেশে প্রতিবাদ জানতে এসেছে, পাপ্পু সর্দার সুজন সিং ও ভাই কুলদীপ সিংকে আটকে রেখেছে, জেল গেটে গিয়ে প্রীতমকে নিয়ে আসার অনুমতি দেয়নি। প্রীতম সমাজের কলঙ্ক, তাকে স্থানীয় শিখ সম্প্রদায়ের শীর্ষমণি গুরুদ্বারা সমিতির সভাপতি সর্দার সুজন সিংএর বাড়িতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। হয় প্রীতম, নয় আমরা—ফয়সালা না নিয়ে নড়বে না কেউ।

রাস্তার মোড়ের পানওয়ালা প্রীতমকে চেনে খুবই, তার দোকানেই সর্দার সুজন সিং প্রথম প্রথম নিজের গলায় ঝুলনো লটারির অফিস লুকিয়ে রাখত। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে সে একটা মরণপণ জিদ্ ধরে বসার পর অফিসটা আর সেখানে লুকিয়ে

রাখার দরকার হয়নি। তারপর থেকে দেখাসাক্ষাৎ হলে পানওয়ালা উভয় পক্ষের মানমর্যাদার ব্যবধান রেখেই প্রীতমকে ঠাট্টা করেছে, 'সর্দারজীকে জব্দ করতে পারলেন না দিদিসাহেব?'

প্রীতমের মাথার ওপর তখন মোকর্দমা ঝুলছে, তবু সে হেসে পাল্‌টা জবাব দিয়েছে, 'তোমরা সকলেই যদি একটাকায় পাঁচলাখ পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড় তো পাপ্পূজীরই বা দোষ কি? তোমাদের প্রত্যেকের এক টাকা থেকে সর্দারজীর ভাগে আসে চারআনা।'

পানওয়ালা প্রীতমদের বাড়ি থেকেই ফিরছে, প্রীতমের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হতে একটু থতমত খেয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল, প্রীতম আটকাল তাকে, একটু যেন ধমকের সুরেই ডাকল, 'এই রামলাল!'

পালাই পালাই করেও রামলাল দাঁড়িয়ে পড়ে, 'জী, দিদিসাহেব!'

প্রীতমের মনে অসংখ্য সন্দেহের কাঁটা, তারই আঘাতে তার কপালে অজস্র দাগ রেখায়িত হয়ে ওঠে, 'ব্যাপার কি, তুমি আমার বাড়ি গিয়েছিলে কেন, কি দরকারে?'

ঠোঁটের গোড়ায় জবাব, কিন্তু তা গিলে নিয়ে রামলাল অসহায় চোখে চারিদিক সন্ধান করে, জানা-চেনা কেউ যদি এই মুহূর্তে হাতের কাছে এসে যায়, তার ওপর ভার চাপিয়ে পাশ কাটাবে সে। কিন্তু কেউই নেই কাছে-পিঠে। অগত্যা সে ওপর আর নিচের ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলে, 'কুছ তো নঁহী দিদিসাহেব!'

বিরক্তিসিক্ত গলায় প্রীতম কাওর ভেংচে ওঠে, 'কুছ তো নঁহী, তো তুমি আমার বাড়ি গিয়েছিলে কেন, সর্দারজীদের কান ভারি করতে, না হুমকি-ধমকি দিতে?'

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে প্রীতম আর সময় নষ্ট করে না, রামলালের সাক্ষাৎই সমস্ত সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন। গণমিছিল বা পশুমেলা, এদের দলগত একজনের যা উদ্দেশ্য সারা দলটিরও তাই। ওরা দলবদ্ধ

হয়ে আছে, প্রীতম একা। কিন্তু তার একার যুক্তির বিপক্ষে ওদের সকলকার সম্মিলিত যুক্তি তো একটাই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই, তাতে সে একাই অতগুলি মানুষের বিরুদ্ধে যথেষ্ট।

জনব্যূহ অতিক্রম করে প্রীতম কাওর বাড়ি ঢুকল। মনুষ্যচাপে চতুর্দিক রুদ্ধপ্রায়, সেদিকে এক লহমা দৃষ্টির আগুন ছড়িয়ে সে ভেতরে চলে গেল। চোখদুটো জ্বলছে এখনো। কিন্তু এ জনতা প্রীতমের পথ আটকাতে চায়নি, বরং তাকে রাস্তা দেবার জন্যেই তাদের মধ্যে এক নীরব প্রেরণা দেখা গিয়েছিল। তবু জেল থেকে বেরুনো অবধি প্রায় সর্বক্ষণ বিরূপ মনোভাববশত সে এদের সহযোগিতাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে।

প্রীতমের কানে একটা চাপা কণ্ঠগুঞ্জন প্রবেশ করে, 'প্রীতম, প্রীতম কাওর!'

'কি প্রীতম, কি প্রীতম কাওর?' এক নজরে প্রায় সকলকে বিদ্ধ করে প্রীতম ব্যঙ্গময় স্বরে প্রশ্ন করে, কিন্তু কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা করে না।

উঠনটা অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছে, অপরিসর ও সংকীর্ণ, হয়তো একটানা ন'মাস ধরে জেলখানার ময়দানতুল্য প্রাঙ্গণগুলো দেখার পর প্রীতমের চোখজোড়া এখানে পৌঁছনোমাত্রই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া উঠনের কোথাও একটু ফাঁক নেই। জনস্রোতের অনেকখানি এখানেও সমাবিষ্ট। গুরু নানকের জন্মতিথির মিছিল ছাড়া একত্রে এতগুলি শিখ নারীপুরুষ প্রীতম কাওর এ শহরে ইতিপূর্বে দেখেনি।

কিন্তু এত মানুষের মাঝে বাড়ির লোকগুলি কোথায়—সর্দার সুজন সিং, সর্দার কুলদীপ সিং, অমৃত কাওর, হুইস্কি—স্যাম্পেন—শেরী! হঠাৎ প্রীতমের সারা প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হাহাকার করে ওঠে। ডুকরে কেঁদে উঠতে যায় সে। কিন্তু জনতার সুমুখে নিজের মর্মবেদনা প্রকাশ করতে চায় না বলেই কোনোমতে আত্মসংবরণ

করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ির লোকজনদের, অন্তত তাদের একটি কাউকে, অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করে।

উঠনের জনসমুদ্রে দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা করে নেওয়ার পর কোনো এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে প্রীতম প্রশ্ন করল, 'মেরে পাপ্পুজী কহা হ্যায় ?'

লোকটি জানে, জানে অবশ্যই, কিন্তু মুখের ভাষায় উত্তর না দিয়ে এই বাড়িরই একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইসারা করে, ঐখানে।

'পাপ্পু, পাপ্পুজী!' প্রীতম আর দেরি করে না, ইতস্তত করে সময় নষ্ট করে না, বাড়ি ফেরার পথে টমটমের অচেনা যাত্রীটির দুরভিসন্ধি-মূলক স্পর্শ অনুভব করতে করতে যে কথাগুলির মহড়া দিচ্ছিল সে-গুলি ঠোঁটের আগায় নিয়ে নির্দেশিত ঘরটাতে গিয়ে ঢোকে।

ঘরের এক জায়গায় কিছু লোকজন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, সর্দার সুজন সিং ছাড়া বাড়ির সকলেই।

'পাপ্পু কোথায় ?' প্রীতম জিগ্যেস করল না, সকলকার কাছে কৈফিয়ৎ চাইল।

বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি বিশালাকার বস্তুর দিকে দৃষ্টির ইঙ্গিত করল ভ্রাতৃবধূ অমৃত কাওর। শবদেহ। সর্দার সুজন সিংএর শবদেহ।

অনুত্তেজিত এবং প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রীতম জিগ্যেস করে, 'কেন ?'

প্রীতমের কৌতূহল নিভে গেছে, কিছুক্ষণ আগে অকারণেই খানিকটা কান্না তার কণ্ঠ রোধ করেছিল, সে অশ্রুময়তাও তলিয়ে গেছে। সর্দার সুজন সিংএর লোকান্তর গমন হয়েছে ; হঠাৎ, কেন—এর অতিরিক্ত তার আর জ্ঞাতব্য নেই।

'মুণ্ডে, এ মুণ্ডে!'

প্রথম ডাকেই কি সাড়া পাওয়া যায়, তাছাড়া জোয়ান মানুষের

মেহনতী শরীর, সূর্যোদয় থেকে রাত্তিরের সিকিভাগ পর্যন্ত আরাম ম্বার হারাম। অগত্যা নিজের ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে এসে সর্দার সুজন সিং কুলদীপ সিংএর ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায়; এত কাছ থেকে ডাকতে একটু দ্বিধাবোধ করে সে, তবু আবার ডাকে 'মুণ্ডে, এ মুণ্ডে কল্‌দীপ সিং!'

ঘুমকাতর গলায় কুলদীপ সিং সাড়া দেয়, 'উঁম্, কৌন হ্যাঁয় জী?'

এবার বেশ চোখা জবাব দিতে যাচ্ছিল সুজন সিং, এর নাম ঘুম, বাপের গলা চিনতে ভুল হয়ে যায়, কৌন হ্যাঁয় জী! সর্দার সুজন সিং উত্তর দিতে যাচ্ছিল, 'তেরে বাপ হ্যাঁয় জী।' কিন্তু তা না বলে শান্ত সস্নেহকণ্ঠে বলল, 'পাপ্পুজী।'

কুলদীপ সিং ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে, তারপর অন্ধকার হাতড়ে ঘরের দরজা খুলতে আসে, সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে গেলে দেরি হবে মনে করেই বোধ হয়! তেমন কোনো কারণ না ঘটলে পাপ্পু এ সময় চুপি চুপি ডাকবে না, বা নরম গলায় নিজের সম্বন্ধে জানান দিতে বলবে না—পাপ্পুজী। হয়তো বিশেষ দুশ্চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়েছে, কিম্বা ভয় পেয়েছে।

কুলদীপ সিং দরজা খুলে বেরিয়ে আসে, জিগ্যেস করে, 'কি বলছ পাপ্পু?'

'ক'টা বাজে?'

আবার ঘরে ঢোকে কুলদীপ সিং, আলো জ্বালে, টেবিল-ঘড়ি দেখে এসে জানায়, 'আড়াইটা।'

ঘড়ি সর্দার সুজন সিংএরও আছে, এমন কি হাতের কব্জিতেই বাঁধা, একমুহূর্তের জন্যে এটা ,হাতছাড়া হয় না। মানুষের সব কিছু মায় তার জীবনটা, সময় দিয়েই বাঁধা, তাই সময় নির্দেশক যন্ত্রটিকে দূরে সরিয়ে রাখা চলে না। সরিয়ে রাখাটা এক ধরনের বোকামি—তাতে কর্তব্যগুলো পিছিয়ে যায় না, মৃত্যুতিথি স্থগিত থাকে না, বরং যথাসময়ে সব একত্রে হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ে এসে পড়ে।

কুলদীপ সিং সময় জানানোর পর সর্দার সুজন সিং বলে,

'তাহলে আমাদের এইবার তৈরি হতে হয়, প্রীতমকে আনতে যেতে হবে তো?'

একটু বিরক্ত হয় কুলদীপ সিং, কিন্তু পাপ্পু ব্যক্তিটি তার সুপরিচিত, তাই বিরক্তি চেপে রেখে বিস্ময় প্রকাশ করে সে, 'এর মধ্যেই! জেলগেট খুলতে আটটার আগে নয়। আমরা সাতটায় বেরুলেই যথেষ্ট।'

সুজন সিং চটে উঠতে যায়, এই যুগ-জমানাটাকে গালিগালাজ করে মুণ্ডে কলদীপ সিংকে জানিয়ে দিতে চায়, আজকালকার আওলাদদের মতো সর্বব্যাপারে দুর্বিনীত হলে পিতা সর্দার সুজন সিংএর পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হবে। কিন্তু আজকের দিনটা বিশেষ শুভ, আকাশে একত্রে পাঁচতারা দেখার মতো না হোক, আনন্দের তো বটেই, তাই এই দিনটাতে ধমক-ধামক দিয়ে কুলদীপ সিংএর আনন্দটাকে চুষে না নিয়ে একটু হেসে সে জবাব দেয়, 'কে বলল বেলা আটটার আগে জেলগেট খোলে না? ওখানে আংরেজি তারিখের হিসেব, রাত বারোটার পর দুসরা দিন, তাই চারটে না বাজতেই প্রীতমকে ফটক পার করে দেবে।'

কুলদীপ সিং ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায়, সুদীর্ঘ হাই তোলে একটা, তারপর বলে, 'না পাপ্পুজী, আমি খবর নিয়েছি—সকাল আটটা।'

শেষ পর্যন্ত রফা হয় সকাল ছ'টার মধ্যেই সর্দার সুজন সিং পুত্র ও পৌত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে জেলগেটে হাজির থাকবে, যাতে বাইরে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রীতম দেখতে পায়। তার যেন ধারণা না হয় জেলখাটা আসামী বলে বাপ-ভাই তাকে তাচ্ছিল্য করল।

একটু পরে কুলদীপ সিং দ্বিতীয় চিন্তা করে বলে, 'একসঙ্গে চারজন সওয়ারী তাহলে কি নেওয়া যাবে?'

'তাই তো!' সুজন সিংও ভাবে, তারপর বলে, 'আমি না হয় একটু আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিক্সা ধরে চলে যাব, সেই রিক্সায় প্রীতমকে নিয়ে আসব। তুই প্রীতমের স্কুটারের সামনে স্যাম্পেনকে

দাঁড় করিয়ে আর পেছনের সীটে হুইস্কিকে বসিয়ে নিয়ে আসবি। লেকিন খেয়াল রাখবি, ছ'টা বেজে যেন এক মিনিটও না হয়ে যায়!' নির্দেশ জাহির করে সুজন সিং এবার কুলদীপ সিংএর সুমুখেই হাতঘড়ি দেখে, তারপর বলে, 'যা তাহলে, একটু শুয়ে নিগে যা।'

সর্দার সুজন সিং আবার নিজের ঘরেই ফিরে আসে। কুলদীপকে ঐ রকম নির্দেশ দেওয়ার মানে আছে একটা। ছেলের ওপর তার অনাস্থা নেই, কিন্তু খুব বেশি ভরসাও নেই। তার কবলে পড়ে থাকলে হয়তো পুরো দলটারই বেরুতে দেরি. হয়ে যাবে। বরং সর্দার সুজন সিং নিজে সোরগোল তুলে আগেভাগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে হুইস্কি ও স্যাম্পেনের তাড়নায় কল্‌দীপ, মুণ্ডে কল্‌দীপ আর দেরি করার অবসর পাবে না।

তবে তাড়াতাড়ি বলতে ঠিক এখুনি নয়, সাড়ে চারটে নাগাদ সুজন সিং যাত্রা করবে, তার আগে এ পাড়ায় রিক্সা পাওয়া যায় না। তিন-চার মাইল রাস্তা হেঁটেও যাওয়া যায়, কিন্তু প্রীতমের ফিরে আসার ব্যবস্থাটা গুছিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আরো ঘণ্টা দেড় সময় হাতে আছে, একটু গড়িয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু চোখের নীদ বড়া শয়তান। অন্য সময় ঘুম আসতে না চাইলেও আজই হয়তো ঠিক সকাল সাড়ে চারটেয় সে সুজন সিংকে তন্দ্রার ঘোরে চুবিয়ে রাখবে। তখন পোয়াবারো মুণ্ডে কল্‌দীপের, 'আমি কি করব, তুমি ঘুমোচ্ছিলে তাই ডাকিনি!'

ছ'লাখ পাঁচলাখের টিকিট ফেরি করে গত সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার সময় সুজন সিং পৌত্র-পৌত্রীদের জন্যে একটা বিলিতি পাইন্ট বোতল কিনে এনেছিল। এটা প্রীতমের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আগাম উৎসব। আজও একটা হবে। সাদামাটা আয়োজনই অবশ্য। তন্দুরী রুটি মটন-কোর্মা সালাদ আর দুটি বোতল। মুণ্ডে কল্‌দীপ তো সিকিখানাতেই কাৎ, প্রীতমও খুব বেশি নিতে পারে না। তাদের তুলনায় হুইস্কিটা পিতামহর নাম রেখেছে। তার চোখে

ঘোর আসে, কিন্তু শয়তান কা বাচ্চার মগজের কলকব্জা শেষাবধি বিলিতি ঘড়ির মতোই নির্ভুল চলে।

বোতলের তলানি খানিকটা রয়ে গেছে, এক পেগ। বোতলটা তাক থেকে নিয়ে এল সুজন সিং, তারপর চারপাইর ওপর চেপে বসে তলানিটুকু কণ্ঠে ঢেলে নিল। আলবলাতে তামাক খাওয়ায় সুজন সিং অভ্যস্ত, কিন্তু সময়-অসময়ে ব্যবহারের জন্যে কিছু চুরুটও রাখে। খালি বোতলটা যথাস্থানে রেখে এসে চুরুট ধরিয়ে টানতে টানতে মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখতে লাগল সে, সাড়ে তিনটে বাজামাত্রই প্রস্তুতি আরম্ভ করবে।

চৈত্র শেষের ভোর চারটে, আকাশে আসন্ন সূর্যোদয়ের আভাস, হাঁকডাক করে বাড়িসুদ্ধ সকলকে জাগিয়ে দিয়ে সর্দার সুজন সিং বেরিয়ে পড়ল। 'এ মুণ্ডে কল্‌দীপ, জাগো জী, হুইস্কি, স্যাম্পেন —এ জী!'

যেখানে রিক্সা পাওয়া সম্ভব সেখানে একটিও নেই। হয়তো এসে পড়বে এখুনি, সর্দার সুজন সিং অপেক্ষা করতে লাগল, ঘড়ি দেখল বার বার। তারপর সন্দেহ জাগল, গত সন্ধ্যেয় কি একটা খুনোখুনির গুজব শোনা গিয়েছিল, তখন তাতে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি সে। বিগত ক'টা দিন ধরে প্রীতমই তার সর্বস্নায়ু আচ্ছন্ন করে আছে। প্রীতমের খালাসের সময় যত এগিয়ে আসছে এক ধরনের আনন্দজনক ত্রাস এসে ততই তাকে বিপন্ন করছে। গুরুদ্বারা, অর্থাৎ এই শহরের শিখ সম্প্রদায় প্রীতমকে গ্রহণ করবে কি, হেয় করবে না তো? অবশ্য তারা মুখে কিছু বলেনি আজ পর্যন্ত, বরং ব্যাপারটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেবারই চেষ্টা করেছে, প্রীতমের বাহাদুরির বাহবা দিয়েছে—কিন্তু তা একান্ত মৌখিক কি না, প্রীতম না আসা অবধি তা বোঝা যাচ্ছে না।

আকাশ ক্রমশ ফরসা হয়ে চলল, এক-আধজন পথচারীও দেখা গেল, কিন্তু রিক্সা এল না একটাও। অগত্যা সুজন সিং হাঁটিতে আরম্ভ করে। একজন লোক নিজের কাঁধে মোটঘাট বয়ে নিয়ে

চলেছে, দেখে মনে হয় রেল-পথের যাত্রী স্টেশনের দিকে যাচ্ছে, তাকে সেধে দাঁড় করাল সুজন সিং, 'বাবুজী, আপনি বিনা সওয়ারীতে এত জিনিস বয়ে নিয়ে চলেছেন, বোধ হয় টিশন যাচ্ছেন?'

লোকটি দাঁড়াল না, বিরক্ত মুখে বলল, 'হ্যাঁ, জাহান্নমে গেছে সব, রিক্সা হরতাল!'

'কিউঁ জী?'

'কাল ইস্কুলিয়ারা একজন রিক্সাওয়ালাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছে।'

ওঃ, আর কিছু জ্ঞাতব্য নেই সুজন সিংএর। দূর-ভ্রমণের জন্যে পায়ের গতি এবার সে বাড়িয়ে দিল, বে-ফজুল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে পনেরোটা মিনিট বরবাদ। এই এক ফ্যাশান আজকাল, হরতাল বিক্ষোভ মিছিল। মরা মানুষের জন্যে সহানুভূতি দেখাবে কি, আহ্ দেবে কি, প্রতিটি কাজ-অকাজের মানুষই তিতিবিরক্ত। তোরা না নিতে পারিস বদলা, না খুঁজে পাস প্রতিকার, উল্‌টে তামাম দুনিয়াকে নিজেদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলিস।

গেঞ্জিকল ছাড়িয়ে লেভল্ ক্রশিং—ঘাটগাড়ির লাইন গেছে দক্ষিণ-উত্তরে। লেভল্ ক্রশিং থেকে জেলখানা পুরো দেড়মাইল। হাতের ঘড়ি দেখার আর দরকার নেই, পুবমুখেই চলেছে সুজন সিং। সূর্যটা উঁকি দিয়েছে, এবার আকাশের গায়ে মুহূর্তের নির্দেশ দিতে দিতে তিল তিল ওপরপানে উঠছে। সুজন সিং তার নিজের অজ্ঞাতেই যেন বালার্ক সূর্যের সঙ্গে বাজিধরা দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

ট্রেন নয়, খালি এঞ্জিনটাই আসছে, তাও বেশ দূরে। ওটার খাতিরে লেভল্ ক্রশিং পার হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করার মানে হয় না। মুণ্ডে কল্‌দীপ হুইস্কি আর স্যাম্পেন, তারাও বোধ হয় এতক্ষণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে—সুজন সিংএর পাশ দিয়ে তাদের স্কুটার ছুটে যাবে। সূর্যটা সুজন সিংএর মাথা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠবে!

মৃতদেহটা ঐখানেই পড়ে ছিল, ফ্ল্যাগম্যান লক্ষ্মণ কাহার পাহারায় রয়েছে। অপরাধী এঞ্জিনটা অদূরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। সর্দার কল্‌দীপ সিংএর স্কুটার এসে থামল। স্কুটার থেকে নেমে এল কল্‌দীপ সিং হুইস্কি আর স্যাম্পেন। তারপর হাসপাতাল ও ময়নাঘর। পুলিশ এবং লাশ-ফাড়া ডাক্তার। বিঘ্ন ও অসুবিধে-গুলো সর্দার কল্‌দীপ সিং তার অবারিত হাত চতুর্দিকে প্রসারিত করে দূর করে দিল। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতম যেন পাপ্পুকে দেখতে পায়, তক্ষুণি আবার তাকে খুঁজতে না বেরোয় সে!

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একই সৌধ, কিন্তু রোজ দেখা হয় না, তবু সপ্তাহে দুটো দিন অন্তত। হয়তো করিডরে চলতে দেখা, নীরব হাসিতে পরস্পরকে অভ্যর্থনা করে তাঁরা নিজের নিজের ডিপার্টমেণ্টে চলে যান। কোনোদিন বা ডক্টর ত্রিদিব বাসু নিজের বিরতির অবসরে খবর নিতে পাঠান ডক্টর সেনশর্মাও তখন অফ্ কি না। থাকলে তিনি এদিকে চলে আসেন। আবার কখনো ডক্টর সেনশর্মাই ত্রিদিব বাসুর বিভাগীয় কক্ষে গিয়ে দেখা করেন, তবে তাঁর পক্ষ থেকে যাওয়াটা কম, কারণ ত্রিদিব বাসুর নিজস্ব অফিস নেই। তিনি বিভাগীয় সর্বাধ্যক্ষ নন। ত্রিদিব বাসু ডক্টর সেনশর্মার বাড়ি আসেন, সেনশর্মাও যান, কিন্তু এদিক থেকেও ত্রিদিব বাসুর আসার অনুপাতে ডক্টর সেনশর্মার যাওয়াটা কম। কারণ রমা বসুকে তিনি আর তেমন সহ্য করতে পারেন না। রমা অবশ্য তাঁর সঙ্গে কোনো অসদ্ব্যবহার করে না, কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে ত্রিবিদকে যেভাবে আঘাত করে তাতে মনে হয় রমা যে একদিন তাঁর পাওনা অনাদায় দিয়ে ত্রিদিবের জীবনকণ্টকে পরিণত হয়েছে এ তাঁর পূর্বজীবনের সুকৃতি। ত্রিদিবের অনন্যসাধারণ সহনশীলতার কথা চিন্তা করে তিনি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করেন তা। ত্রিদিবকে বলেন। রমাকেও বলেন।

মাঝে মাঝে সিগারেটের দামী ধোঁয়াটা পর্যন্ত ডক্টর সেনশর্মার তেতো ঠেকে, একটু কেশে গলা সাফ করে নিয়ে তিনি বলেন, 'সত্যি ত্রিদিব, এ তুমি কি করে সহ্য কর? এক-আধ দিনের এক-আধটা আকস্মিক ঘটনা তো নয়, আমার মনে হয় রমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা তোমার মানসম্ভ্রম ও জীবন সদাসর্বদা বিপন্ন করে রাখা।'

'রমা আমার জীবন বেশি কি বিপন্ন করবে, তুমি তো সিগারেটের ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ করে রেখেছ।' নিজের মুখের সামনে দুটি হাত

তীব্রভাবে নাড়তে নাড়তে ত্রিদিব বাসু ঠাট্টা করেন, তারপর ব্যথিত ও দীনস্বরে বলেন, 'দূর থেকে ঐ রকমই মনে হয় বটে, কিন্তু এ হল দাম্পত্যের বোঝাপড়া। অনেক সময় আমাদের কি মনে হয় না, পথের ভিখিরীর সঙ্গে মানুষ অমন ব্যবহার করে কেন, ভিখিরীরাই বা এমন নিগ্রহ কি করে সহ্য করে, মরে যায় না কেন! এ-ও সেই বোঝাপড়া, যে দেয় ও যে নেয় তাদের ছু'পক্ষই জানে সাধারণ দানের সঙ্গে খানিকটা নিগ্রহ অবশ্যই মিশে থাকবে, নিতে হলে সবটাই নিতে হয়।'

ত্রিদিব বাসুর যুক্তির অকাট্যতায় ডক্টর সেনশর্মার বিশ্বাস হয় না, ঘাড় নাড়েন তিনি, 'সর্বত্র একই নিয়ম?'

ত্রিদিব বাসু জবাব দেন, 'গ্রহীতাকে হীন সাব্যস্ত করতে না পারলে নিজের মহত্ব ঠিক জাহির করা যায় না। রমা আমার জন্যে বিরাট স্বার্থত্যাগ করছে, জীবনের যা সর্বোত্তম কামনা তা আহুতি দিয়েছে। সে যে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এ সংবাদ কেউ রাখে না, অপরের পক্ষে জানা সম্ভবও নয়—তোমার কথা স্বতন্ত্র।'

রমার অনুপস্থিতিতে ত্রিদিবের সঙ্গে কথোপকথন করে ডক্টর সেনশর্মা ঐ জবাব পেয়েছেন, আবার ত্রিদিবের অলক্ষ্যে একই প্রশ্ন রমার কাছে উত্থাপন করেন তিনি।

রমার জবাব, 'আমি ত্রিদিবের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি, আশ্চর্য! সে তো কখনো অভিযোগ করে না, তোমায় বলেছে বুঝি? আমি জিগ্যেস করব কবে কি করেছি।'

হয়তো এই থেকেই এক বিপত্তির সূত্রপাত হবে তাই ডক্টর সেনশর্মা তাড়াতাড়ি বলেন, 'সে কেন বলতে যাবে, আমি তো নিজেই দেখি!'

রমা বসুর ছু'চোখের তারা চরকির মতো ডক্টর সেনশর্মার মুখের ওপর ঘুরে যায়, 'আচ্ছা! কিন্তু তোমার দেখাটা ভুল। স্বামীর সঙ্গে আমি একটু খোলাখুলি ব্যবহার করি। ড্রইংরুম রিলেশন তো নয়, যার সঙ্গে দিনরাতের সম্পর্ক তার কাছে নিজের মনোভাব লুকনো

চলে না। ত্রিদিব যদি খুব বড় মিথ্যুক না হয়, কখনোই বলবে না আমি তাকে খেতে দিই না, বিশ্রামের অবকাশ দিই না, বা অসাধ্য চাহিদা পেশ করে উত্যক্ত করি—যা শতকরা নিরানব্বইটা বউ করে। ছেলেদের হু'কোঁটা বার্লি দিতে পারে না, সিনেমা দেখছে রোজ।... তবে একটা জিনিষ, যা অত্যন্ত কনফিডেনসিয়াল, কিন্তু তোমার কাছে আমার গোপন কি আছে—জানো, জানো স্মৃতিময়, অন্য স্ত্রী হলে ত্রিদিবের মতন স্বামীর সঙ্গে শুতো না। ওর পঙ্গুত্ব ওকে এক-ভাবে ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলেছে, নিজে যেমন জ্বলে মরে অথচ অক্ষম, তেমনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে মজা দেখে।'

এরপরও রমা বস্থর অভিযোগ ও কথা ফুরোয় না, ঘন তপ্ত নিঃশ্বাসের প্রস্রবণ, আরক্তিম চোখছুটি ডক্‌টর সেনশর্মার প্রতি নিবদ্ধ, 'স্মৃতিময়, আমাদের বিবাহনীতি কি বিচিত্র; জেনেশুনে ত্রিদিবকে কেউ বিয়ে করত না, কিন্তু তারও তো সঙ্গিনী দরকার, তাই আমি তার কাছে এলুম। এর মানে কি এই, আমার আত্মপরিতৃপ্তির প্রয়োজন বা অধিকার নেই? আমি নিজেই অসুখী, ত্রিদিবকে সুখী করব কি করে? তোমাদের সমাজের উচিত আমায় কিছু কন্‌সেসন্ দেওয়া। আচ্ছা স্মৃতিময়, তুমি তো আগে আমায় চুমু খেতে, এখন পার না কেন?'

ডক্‌টর সেনশর্মার আর বসে থেকে তথ্যাবিষ্কারের সাহস হয় না হাতের আধখানা সিগারেট ছাইদানে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ান তিনি, 'আজ তাহলে উঠছি রমা, ত্রিদিব তো এখনো ফিরল না—অন্য একদিন আসা যাবে!'

রমা বস্থর উত্তেজিত ও রক্তস্ফুরিত চোখছুটো হেসে ওঠে, 'ভয় পেলে কেন, আমি কি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি? কোনোদিন যদি তা-ও করি, সেদিন তোমরা আমায় ক্ষমা কোর স্মৃতিময়।' বাকিটুকু বলতেও রমা বস্থর জিভে জড়তা আসে না, 'জানো স্মৃতিময়, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আই ডিক্লেয়ার মিসেলফ্ এ্যাজ এ প্রসটিচ্যুট! আমার উদ্দেশ্য তো মন্দ ছিল না, আজও নয়, তবে

কেন আমায় মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে জীবন কাটাতে হবে ?'

একটা কথা ডক্‌টর সেনশর্মা কোনোদিন বিস্মৃত হননি, রমাকে কোণঠাসা করে চেপে ধরার জন্য তিনি বলেন, 'আমার মনে পড়ে গেল রমা, বলেছিলে, তোমার মধ্যে সাধারণ নারীর মতো কামনা-বাসনা নেই, এদিক্ থেকে তুমি কিছুটা অনন্যা !'

বলা ও না বলা কথার স্মৃতিপুঞ্জ রমা বসুর সুমুখে এগিয়ে আসে, 'বলেছিলুম ? তা হবে ! সেদিন ঠিক কথাটা বলতে পারিনি—আমার দেহমনে আসাধারণত্ব কোথাও নেই, বরং আমি সর্বদিকেই অতি সাধারণ। কিন্তু তোমরা, তুমি আর ত্রিদিব আমায় বিভ্রান্ত করে তুলেছিলে, আমি বোধ হয় তোমাদের দুজনকে মিলিয়ে আমার অচেতন মনে এক অখণ্ড মূর্তি রচনা করেছিলুম, তাই বুঝতে পারতুম না কাকে বেশি ভালবাসি ! ক্রমশ আমার মনে হতে লাগল আমি ভালবাসতে পারি না, আমার মধ্যে সাধারণ নারীচেতনা নেই। তাই আমি নিজের অক্ষম অস্বাভাবিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে ত্রিদিবকে নিতে চেয়েছিলুম, কারণ স্বাভাবিক কেউ তো তাকে চাইবে না।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর রমা বসুর কণ্ঠ আবার উন্মুক্ত হয়, 'তোমাদের দুজনকে কেন্দ্র করে আমার মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল স্মৃতিময়, ত্রিদিবের বদলে তুমি আমার ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও আধখানা ব্যর্থতা থেকেই যেত। আজকাল আমার কি মনে হয় জানো, প্রতিটি মানুষের জীবনে এই ধরনের কত বৈচিত্র্য আছে, অসংখ্য অপরিতৃপ্ত কামনা আছে, যার বেশিটাই নৈতিকতাহীন; অথচ আমি যদি নিজেকে প্রকাশ করি, সুখী হবার জন্যে উন্মুখ হই, তোমরা নীতিমঞ্জরী নিয়ে তাড়া করবে !'

রমা বসুর কথায় যুক্তি আছে, কিছুটা হয়তো মানসিক বিকৃতির লক্ষণসহ বিচিত্র প্রত্যয়ের আভাস। ডক্‌টর সেনশর্মার সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগে। এখনো মাঝে মাঝে বর্তমান রমা বসুকে ভুলে

গিয়ে অতীতের সহপাঠিনী রমা সরকারকে মনে পড়ে যায়, এক অপ্রাপ্তির বেদনা বোধ করেন তিনি। মনে হয় রমা যেন তাঁর জীবনের খানিকটা অঞ্চল চিরদিনের মতো অন্ধকার করে দিয়েছে, একাধিক রমণীর আবির্ভাব সত্ত্বেও সে তিমির দূর হয়নি। অথচ রমাকে আর ভাল লাগে না, তাঁর বেদনাপাণ্ডুর মনের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রমার সাহচর্য অর্থহীন, অবান্তর।

কিছুদিন থেকে নিজের চতুর্দিকে এক রিক্ততার পরিবেষ্টন দেখতে পাচ্ছেন ডক্‌টর সেনশর্মা। মাস দুই যাবৎ অর্পণা নেই এখানে, তপু গেছে তার সঙ্গে। সমস্তিপুর থেকে সপ্তাহে একখানা অর্পণার চিঠি আসে, পত্রপ্রাপ্তি মাত্রই তিনি জবাব দেন। অর্পণা নেই, কিন্তু তার অভাব অনুলেখা আংশিকভাবে পূর্ণ করে রেখেছে।

অনুলেখা সম্বন্ধে একটা বিপরীত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ডক্‌টর সেনশর্মা, কিন্তু তার উদ্‌গ্রীব আগ্রহেই তা পরিবর্তিত হয়েছে—ইতিপূর্বে এমন অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেননি। আজ অনুলেখা তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়, না পাওয়া মোহসম্প্রদ নয়। অর্পণার অনুপস্থিতির সুযোগ ও শিলাদিত্যের সমর্থনে তাঁরা একাধিকবার ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। অর্পণার ঘর বা শয্যা কিছুই আর অনুলেখার অদেখা বা অব্যবহৃত নেই, কিন্তু তার মধ্যে কিসের যেন অসম্পূর্ণতা আছে, যে জন্যে চোখের আড়াল হওয়ামাত্রই মনেরও আড়ালে চলে যায়। তাঁর দেহতৃপ্তির যোগান দিয়ে যায় সে, কিন্তু দেহাতীত বুভুক্ষা মেটাতে পারে না। মানসিক নিঃসঙ্গতা অপনোদন করতে সক্ষম হয় না।

আজ সম্ভবত অনুলেখার হাত এড়াবার জন্যেই ডক্‌টর সেনশর্মা ডক্‌টর ত্রিদিব বাসুর বাড়ি এলেন। এসে দেখলেন, ভালই করেছেন, ত্রিদিব অসুস্থ, দু'দিন আগে পর্যন্ত বিশেষ বাড়াবাড়ি গেছে, এখন নিরাময়ের পথে, আশঙ্কামুক্তি হয়েছে।

কথাবার্তার মাঝে ডক্‌টর সেনশর্মা উচ্চহাস্যে ফেটে পড়েন, ডক্‌টর ত্রিদিব বাসুর রোগশ্রান্ত মুখেও খানিকটা হাসির আভাস, চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি কিছুটা কৌতুকময়।

হাসির গমক থামিয়ে ডক্‌টর সেনশর্মা বলেন, 'আজ বেশ মুডে আছ দেখছি, রিটার্ণ অফ্‌ টিন্‌ এজ ?'

'মুড্!' ত্রিদিব বাসু ব্যথাভরা বিস্ময় নিয়ে জবাব দেন, 'যমে-মানুষে সেমি ফাইনাল ম্যাচ হয়ে গেল, আর তুমি বলছ, মুড্। ক'টা দিন যা কেটেছে, রমার তো সর্বক্ষণ ভয়, তার সিঁথির সিঁদুরের এগজিবিশন্ লক্ আউট হয় হয়।'

ডক্টর সেনশর্মা উপদেশের ছলে কথা বলতে গেলেন, তার আগে একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলেন, 'তোমার ননী খাওয়া মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে নাও, নয়তো এখুনি আবার বলবে, দম বন্ধ হয়ে আসছে—ইট ইজ রিয়্যালি ওয়ানডারফুল, এ যুগের সর্বসংহারী আগুনে তোমাদের কিছু হয় না, আর সিগারেটের ইনোসেন্ট ধোঁয়া নাকে লাগলেই কাৎ, এ বোধ হয় তোমার ম্যানিয়া বা ফোবিয়া—হয় খুঁৎখুঁতে বাই, বা রোগ।'

ত্রিদিব বাসু একটু কাশলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেটের ওপর হাতচাপা দিয়ে একটা ব্যথা দমন করবার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, 'বাই বা রোগ, সেটা ঠিকমতো জানতে না পারা পর্যন্ত তো চিকিৎসা করাতে পারছি না।'

'হঠাৎ পেটে হাত চাপা দিলে কেন তুমি, এখনো কি ব্যথা আছে?' ডক্টর সেনশর্মা প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন।

ত্রিদিব বাসু মুখ বিকৃত করে জবাব দেন, 'স্লাইট—'

যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে বলবেন বলে ভাবছিলেন ডক্টর সেনশর্মা, এবার সেটি ব্যক্ত করার অবসর পান, 'বয়েস তোমার বাড়ছে বই কমছে না, এবার খাওয়া-দাওয়া একটু বিবেচনা করে করা উচিত।'

আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না, ত্রিদিব বাসু খাটের ওপর উঠে বসলেন, 'সে ব্যাপারে আমি বরাবরই সুবিবেচক, কিন্তু বাড়ির বাইরে গেলে অনিয়ম হয়েই যায়। সেমিনারে গিয়ে পাঁচদিন ছিলাম, সেমিনার মানে তো ইটিং সেরিমানি—দু'বেলা, উঁহু, বলতে গেলে চার বেলাই মাংস। তবু যদি ভাল মাংস হয় তো একটা কথা। পাঁচসিকে কিলোর গ্র্যাণ্ড গোট।'

'গ্র্যাণী গোট—!'

'ঐ সাদা বাংলায় যাকে বলে বুড়ি পাঁঠি। ওদের হেঁসেলে অজকুলের দিদিমা ও ঠানদি ছাড়া আর কিছুর প্রবেশ নিষেধ। পাঁঠিতে আমার আপত্তি নেই, যদি ভারজিন মেডেন হয়।'

ডক্‌টর সেনশর্মা হেসে ফেলেন, তাঁর মনে হচ্ছে রোগশয্যায় পড়ে ডক্‌টর ত্রিদিব বাসুর যেন দেড়যুগ আগেকার দিবুতে প্রত্যাবর্তন হয়েছে। প্রায় পনেরো দিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি বলে তিনি আজ এখানে এসেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিদিব বাসু কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা-সভায় যোগদান করতে কিছুদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রাজনীতি-শাস্ত্রের নির্বাচিত অধ্যাপকবৃন্দের সভা। ত্রিদিব বাসু স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রতিনিধি। গত পাঁচদিন হল তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে ফিরে এসেছেন। হয়তো বিদেশ বলেই নিজেকে কিছুটা সামলে রেখেছিলেন, স্বগৃহের স্বচ্ছন্দ হাওয়ায় রোগবৃদ্ধি হয়ে চরমে উঠেছিল। উপরন্তু বাড়ি ফেরার পর তিনি রমাকে যেন এক সম্পূর্ণ নতুন মূর্তিতে দেখলেন। অপূর্ব মমতাময়ী, সুন্দর প্রশান্ত শরীরের কোনো স্থানে ভর্ৎসনার রুক্ষতা নেই। স্বামীর রোগের জন্যে চিন্তিত, কিন্তু ধৈর্য ও আস্থায় অটল।

ত্রিদিব বাসু বলেছিলেন, 'সিতুকে খবর পাঠিও রমা, কিম্বা পাশের বাড়ি গিয়ে ওকে ফাইভ ও সেভেন্-এ একটা ফোন করে দিও।'

অবান্তর বোধে সে-কথার জবাব না দিয়ে রমা বসু শান্তকণ্ঠে বলেছেন, 'তুমি এই বার্লিটুকু খেয়ে নাও তো? না, না, ডাক্তার কিছুই দিতে বারণ করেছেন, আমি তবু গ্লুকোজ মিশিয়ে বার্লি দিচ্ছি—যা-তা খেয়ে অসুখ বাধিয়ে এলে, এখনো তোমার খাওয়ার বায়না!'

'সিতুকে তাহলে --'

ফিডিং কাপের নলটা স্বামীর মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে এবার রমা বসু আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছেন, 'স্মৃতিময়কে শুধু শুধু খবর দিয়ে কি হবে, যখন আসবার তখন সে নিজেই আসবে। আর—' রমা বসু

বলতে বলতে প্রথমটা থেমে গেছেন, তবু বলেছেন, 'ওর যখন-তখন এখানে আসা আমার ভাল লাগে না।'

ত্রিদিব বাসু অবাক হয়েছেন, কথাটা রমার মুখে সম্পূর্ণ নতুন এবং অপ্রত্যাশিত। বিয়ের পর স্মৃতিময়ের নামোচ্চরণও করত না সে। তারপর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসার পর স্মৃতিময় বারকতক এল এ বাড়িতে। সঙ্গে অর্পণা। রমা মৌখিক সৌজন্য দেখিয়েছে, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি ব্যাহত হয়নি, স্মৃতিময়কে আর আমল দিতে সে নারাজ। তারপর কিন্তু নিয়তের পৃষ্ঠপটে এই চিত্রটির বিপরীত ছাপ ফুটে উঠেছে, রমা যেন প্রতিদিন স্মৃতিময়ের আগমন অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। স্মৃতিময়ও আসত ঘন ঘন। সাধারণ স্বাভাবিকভাবে তো বটেই, অনেক আকস্মিক মুহূর্তেও তার আবির্ভাব ঘটত। এ অবস্থায় নীরব পাহারার পর্যবেক্ষণে রমাকে ঘিরে রাখা ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হত না। কিন্তু রমা চাইত স্মৃতিময় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাঁর অনুপস্থিতি। তাই সে স্মৃতিময়ের সুমুখেই তাঁকে সর্বাংশে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করত। কিন্তু স্মৃতিময়ের মাধুকরী প্রকৃতি, যা য়্যুনিভারসিটির শিক্ষক হওয়ার সুযোগে ষোলকলায় সমর্থিত হয়ে উঠেছিল, তা তাকে রমার প্রতি খুব বেশিদিন আকৃষ্ট থাকতে দেয়নি। সে নিজেই ক্রমশ সরে যাচ্ছিল, কিন্তু রমার আগ্রহ একটুও সংকুচিত না হয়ে বেড়েই গেছে দিন দিন। তবে আর ভয় ছিল না, কারণ স্মৃতিময় তার নীতিবোধ অথবা অনীহা, যাই হোক না কেন, তা নিয়ে রমার কাছ থেকে সরে সরেই থাকে।

ত্রিদিব বাসু ইদানীং যা আশা করেন না, বা আশা করতে সাহস করেন না, ফিরে আসার পর যেন রমার কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাই পেতে আরম্ভ করেছেন। শুধু পরিচর্যা ও মমতা নয়, এমনকি বোধহয় ভালবাসা পর্যন্ত। অথচ নিজের পঙ্গু ও অক্ষম প্রণয়াসক্তি নিয়ে তাঁর সাধ্য নেই রমাকে প্রতিদানে পরিতৃপ্ত করেন। তাই খানিকটা ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাকে তিনি স্মৃতিময়ের সাক্ষাৎ উপহার

দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, অথচ রমা অনিচ্ছুক। মৌখিক বিরক্তি প্রকাশ নয়, স্মৃতিময়ের নাম কানে যাওয়ামাত্রই তার সর্বাঙ্গে যেন কঠিন বিরূপতা ফুটে উঠেছে। তবু তিনি তাকে আর একবার বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন, 'কিন্তু তুমি নানা কাজে ব্যস্ত, আমার কি একা বিছানায় পড়ে থাকতে ভাল লাগে?'

'তাহলে তোমার প্রিয় ছাত্রটিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাশের ঘরে বসে পড়াশোনা করছে—এতদিন প্রাণ দিয়ে গুরুসেবা করল, এবার নয় এসে গুরুর সঙ্গে একটু বয়স্যতা করুক?' হাসতে হাসতে রমা বসু চলে যান, যেন আড়াই-তিন দশক আগেকার সেই রমা।

রমা ছাড়া আর একজনের প্রতি ত্রিদিব বাসু কৃতজ্ঞ। আধুনিক গুরু-শিষ্যের আদান-প্রদানমূলক সম্পর্কের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে নয়, অনেকখানি ভেতরে এসে অকুণ্ঠ আপ্রাণ সেবার নিদর্শন দিয়েছে কল্যাণব্রত। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় থেকেও তিনি অনুভব করেছেন, কল্যাণব্রতর পরিচর্যার হাতখানি যেন তাঁর দেহের সঙ্গে সদাসর্বদা লিপ্ত হয়ে আছে। একটু সংজ্ঞা ফিরতে তিনি বলেছেন, 'তুমি যাও কল্যাণব্রত, একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'যাচ্ছি স্যার।' কল্যাণব্রত অচিরেই জবাব দিয়েছে, কিন্তু তার উঠে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়নি।

শেষপর্যন্ত রমা বসু একরকম জোর করেই কল্যাণব্রতকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গেছেন, বুঝিবা একটু বকেওছেন তাকে, 'না, তোমায় রাত জাগতে হবে না। গুরু অসুস্থ, শিষ্য এবার রোগে পড়ুক, আর আমি দু'দিকে দুটি হাত বিস্তার করে দু'জনের সেবা করি!'

সেমিনারে যাবার আগে কল্যাণব্রতর ওপর কিছুটা ভার দিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর ত্রিদিব বাসু, 'বুঝলে কল্যাণব্রত, আমি যে ক'দিন না থাকি, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমার বাড়ির একটু খোঁজখবর নিয়ে যেও!'

'হ্যাঁ স্যার।' কল্যাণব্রত তখ্খনি সম্মতি জানিয়েছে, তারপর কিঞ্চিৎ বিনিময় চেয়েছে, 'স্যার, আপনি যে ক'দিন থাকছেন না,

আপনার নোটগুলো যদি আমায় দিয়ে যান, কিছু কিছু কপি করে রাখি ?'

চাহিদা এমন কিছু বিপুল বা অন্যায় নয়, কিন্তু খাতাগুলি হাতছাড়া করতে প্রাণ চায় না ডক্‌টর ত্রিদিব বাসুর। তাঁর সম্পূর্ণ বিদ্যার সবখানি ঐ খাতাগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সর্বত্র নয়,. ডক্‌টর সেনশর্মার কাছে তিনি বলেন, 'দেখ সিতু, লেখাপড়ার মতো আন-ইনটারেসটিং সাবজেক্ট আমার কাছে কিছু নেই। তোমরা বই পড়ে পি. এইচ. ডি., ডি. লিট. করেছ, আর আমার ডক্‌টরেট কাঁচির সাহায্যে সংগৃহীত।'

সরাসরি অস্বীকার করতে পারেন না ডক্‌টর ত্রিদিব বাসু, কিন্তু খাতাগুলি হাতছাড়া করতেও সাহস করেন না, শেষপর্যন্ত তাঁকে বলতে হয়েছে, 'তুমি বরং রোজ আমার বাড়িতে এসে লিখে নিয়ে যেও—আমার ওয়াইফকে বলে দিয়ে যাব।'

রমা বসু বোধহয় সদ্য বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন, পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুর কিম্বা কুমকুমের টিপ। টিপটির আয়তনের ক্ষুদ্রতা তার ঔজ্জ্বল্যে পূরিত হয়েছে, নিমেষেই চোখে পড়ে।

ডক্‌টর সেনশর্মা রমা বসুর দিকে তাকালেন, বহুদিন পরে এক অপরূপ স্নিগ্ধতা নজরে পড়ল। সেধে কথা বলার ইচ্ছে জাগল তাঁর। 'কি খবর রমা, কেমন আছ ?'

রমা বসু হাসলেন, মৃদু হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত 'আমার আর থাকাথাকি কি—রোগীর ঘর, রান্নাঘর এই করে চলছে। কিন্তু তোমরা দু'জনেই বেশ ভাল আছ বলে মনে হচ্ছে ?' বলতে বলতে রমা বসু আড়চোখে ত্রিদিব বাসুর দিকে তাকালেন, 'পাশের ঘর থেকে তোমাদের দু'বন্ধুর উচ্চহাসির রোল শুনছি !'

ত্রিদিব বাসু বললেন, 'কখ্‌খনো না, আমি হাসি না কখনো। তবে সিতু হাসছিল বটে !'

কি যেন বলতে গিয়ে রমা বসু হঠাৎ অতলে তলিয়ে গেলেন,

বহুকাল আগেকার কথা—সেইদিনই ত্রিদিব সাইন্স ছেড়ে আর্টসে ভর্তি হয়েছে। তারপর কি ব্যাপার নিয়ে ত্রিদিব আর স্মৃতিময়ের মধ্যে হাসাহাসি। অবশ্য হেসেছিল স্মৃতিময়ই, ত্রিদিবের কথা শুনে। ধরা পড়তে ত্রিদিব অধ্যাপকের কাছে সাফাই গেয়েছিল, 'আমি স্যার হাসি না কখনো, আমার ডাকনাম রামগরুড়।'

ত্রিদিবের এখনকার কথাটি শোনামাত্রই রমা বসু যেন শতাব্দী-কাল পেছনের সেই দিনটিতে ফিরে গেলেন। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলেটা তো বেশ মজার! আড়চোখে তার দিকে তাকিয়েও দেখেছিলেন তিনি। তারপর থেকে রমা সরকারের জীবন আপাত-সরল ভঙ্গি বজায় রেখেও বাঁকতে আরম্ভ করেছে—বাঁকতে বাঁকতে কোথায় এসে ঠেকেছে! শত চেষ্টা করলেও আর সে উৎসমুখে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু রমা বসু আজ তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা জটিল ও বক্রতাপ্রাপ্ত স্থানে দাঁড়িয়েও সেদিনকার আদি উৎসটি দেখতে পেলেন।

বিগত অতীতের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে স্মৃতিপূর্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে রেখে রমা বসু অন্যমনস্কের মতো বলেন, 'আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমরা বুঝি আবার সেই ছেলেবেলার দিন-গুলোয় ফিরে যেতে চাও?'

কেউ এ কথার উত্তর দিলেন না। ডক্টর সেনশর্মা নির্বিকার, ত্রিদিব বাসু নীরব। কিন্তু তাঁর মন ততটা নীরব নয়। দৃষ্টিও না। ঈষৎ চোরা চোখে তিনি রমা বসুর মুখ নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করছেন। স্মৃতিময়ের আবির্ভাব আজ কিভাবে গ্রহণ করেছে রমা! সাদর অভ্যর্থনায়, অথবা ত্যক্ত উপেক্ষায়? কারণ দিনতিনেক আগে পর্যন্ত সে স্মৃতিময় সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি তুলেছিল, 'কি দরকার একে-তাকে খবর দেবার, এসে অযথা বক্‌বক্ করে তোমার রোগ বাড়িয়ে দেবে!'

রমা দাঁড়িয়ে আছে, ত্রিদিব বাসুর মনে হল তাকে বসতে বলেন। এতদিনের পরিচয় ও নৈমিত্তিক জীবনের নির্দয় রুক্ষতা অতিক্রম করে

রমা যেন কমনীয়তার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। তাকে ঘিরে এক শুচিসাত্ত্বিক ভাবের পরিমণ্ডল। কিন্তু বসতে বললেই কি বসবে সে, এইমাত্র বৈকালিক স্নান সেরে বেরিয়েছে, এখনো পুজোর ঘরে ঢোকেনি। পাছে রমা তাঁর বাসনার আমল না দিয়ে চলে যায়, সেইজন্যে তিনি মনোগত ইচ্ছে আর প্রকাশ করলেন না।

রমা বসু নিজেই একটা আসন সংগ্রহ করে নেন। ত্রিদিব বাসুর খাটের পাশে একটি চেয়ার, সেটিতে ডক্টর সেনশর্মা, খাটের এপারে একটা টুলের ওপর রোগীর পথ্যের শূন্য থালা ও অর্ধপীত বার্লির গেলাস। সে-দুটি ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রেখে রমা বসু টুলটাতে বসলেন, তারপর একই দৃষ্টি ত্রিদিব ও স্মৃতিময় দু'জনের মুখের ওপর একবার ঘুরিয়ে এনে ফের স্মৃতিময়ের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমরা হঠাৎ চুপ করে গেলে কেন, দুয়ে মধুচক্র তো চলছিল বেশ, আমি এসে পড়ে তিনে রসভঙ্গ করলুম নাকি?'

ডক্টর সেনশর্মা হঠাৎ বলে ফেললেন, 'অন্যদিন হলে বোধহয় তাই হত, কিন্তু আজকের ব্যাপার আলাদা।'

'আলাদা কেন?' একটি সরল জিজ্ঞাসা রমা বসু এগিয়ে দিলেন।

ত্রিদিব বাসু যা ভাবছিলেন ডক্‌টর সেনশর্মার বর্তমান চিন্তাও কতকটা সেই রকমই। এ রমাকে তিনি বহুকাল দেখেননি। যেন কোনো আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি তার বিশুষ্কপ্রায় মনের দু'কূল প্লাবিত করে দিয়েছে। অজস্র পরিতৃপ্তিতে অসহনীয় রুক্ষতা বিদূরিত। কিন্তু ডক্‌টর সেনশর্মার জবাব এদিক দিয়ে গেল না, তিনি বললেন, 'কারণ আজ দিবু পুরো একখানা নেই, অসুখে পড়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে, তাই তার অর্ধাঙ্গিনী এখন আর অবাঞ্ছনীয় নয়, একান্তই প্রয়োজনীয় পরিপূরক।'

রমা বসু জবাব দিলেন, সেইসঙ্গে মৃদু অনুযোগও, 'অর্ধাঙ্গিনীর তাহলে খুব খাতির তোমার কাছে; কিন্তু নিজেরটিকে তো নিয়ে আস না আজকাল?'

হু'জনের কথার মাঝে ত্রিদিব বাসু নিজের মন্তব্য এগিয়ে দেন, 'সে খাতির পরস্ত্রীর ব্যাপারে।'

'না না' ডক্‌টর সেনশর্মা তাড়াতাড়ি বলেন, 'অর্পণা নেই এখানে, মাসছুই হল বাপেরবাড়ি গেছে।'

রমা বসুর চিরাচরিত নারী-কৌতূহল উঁকি দেয়, মুখটা রহস্যময় ও লাবণ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, 'তোমার তপুর কোনো দোসর আসছে নাকি?'

ডক্‌টর সেনশর্মা বৈরাগ্যপূর্ণ মুখভাব করেন, তাঁর ঠোঁট উল্‌টে যায়, 'কি জানি।'

ত্রিদিব বাসু যেন রমা বসুর উদ্দেশে বলেন, 'এ ব্যাপারে সিতু চিরশিশু, কোনোদিনই কিছু জানে না, বোঝে না—তুমি সিতুকে অযথা বিব্রত কোর না রমা, ওর অজ্ঞতা ধরিয়ে দিয়ে তোমার লাভ কি?'

ডক্‌টর সেনশর্মা হু'জনের মুখের দিকেই তাকালেন, তাঁকে নিয়ে পরিহাস সুরু করেছে দিবু আর রমা; এ যেন সেই বিস্মৃত যুগের প্রত্যাগম। তাঁর নিজের মনেও অপূর্ব পুলকানুভব। বিচক্ষণ ও স্বার্থসর্বস্ব মানুষের যুক্তিবাদিতা ও মনোভাব অপসারিত হয়ে এক অকারণ লজ্জায় তিনি যেন ডুবে যাচ্ছেন, এরা তাঁকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে নাকি! তিনি বোধহয় নিজের বুদ্ধিসুদ্ধির প্রমাণ দেবার জন্যেই বলেন, 'একটা কেউ আসবে বটে, তবে দেরি আছে—বেশ দেরি।'

'কনসীলমেণ্ট অফ ফ্যাক্‌ট, পানিসিবল অফেনস্—ফাইনড ওয়ান কে. জি. সন্দেশ, টু বি পেড উইদিন অ্যান আওয়ার।' ডক্‌টর সেনশর্মার কৈফিয়তের পিঠে নিজের রায় চাপিয়ে দিয়ে ত্রিদিব বাসু রমা বসুকে জিগ্যেস করেন, 'আজ কল্যাণব্রত আসেনি?'

রমা বসুর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠেই সরল হয়ে গেল, স্থিরশান্ত চোখে তিনি ত্রিদিব বাসুর দিকে তাকালেন, 'কেন বল তো?'

'সিতুর কাছে একটা টেনার নিয়ে এখুনি তাকে আদর্শ মিষ্টান্নে পাঠিয়ে দাও। এসেছে কি সে?'

'হ্যাঁ, এসেছে—তোমার খাতাপত্র নিয়ে মগ্ন এখন, সব কপি করে নিচ্ছে।' বলতে বলতে রমা বসু স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন, 'তোমার বিত্তের রহস্য আর দৌড় কিন্তু কল্যাণব্রতর কাছে জাহির হয়ে গেল—এরপর গুরু-শিষ্যের তারতম্য থাকবে না।'

'তা না থাকুক।' উদার স্বরে ত্রিদিব বাসু বললেন, 'কল্যাব্রতর সঙ্গে আমার আর সে ধরনের সম্পর্ক নেই রমা। আমার জন্যে অনেক করেছে সে। আজকালকার দিনে কারো কাছে অমন নিঃস্বার্থ সেবা আশা করা যায় না—এক তোমার মতন স্ত্রী ছাড়া।' কথা শেষ করেও তিনি রমা বসুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর ছড়ানো দৃষ্টি ক্রমশ গভীর ও একাগ্র হয়ে এল।

'হ্যাঁ, তা সত্যিই করেছে।' এইটুকু সমর্থন জানিয়ে রমা বসু চুপ করে গেলেন।

ত্রিদিব বাসু ডক্টর সেনশর্মাকে বললেন, 'সিতু, দশটা টাকা বের কর, সন্দেশ আনাতে হবে।'

ডক্টর সেনশর্মা বিনা ওজরে পাঞ্জাবির পকেটে হাত পুরতে যাচ্ছিলেন, রমা বসু বলে উঠলেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে স্মৃতিময়? যা-তা খেয়ে ওর অসুখ, এখনো শরীর বিষাক্ত হয়ে আছে, ডাক্তার প্রায় উপোস করে থাকতে বলেছেন, আর—'

বলতে বলতে রমা বসু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কারো অনুমতি না নিয়েই প্রস্থানোদ্যত হলেন তিনি। যেতে যেতে শুনলেন, ত্রিদিব বলছেন, 'জানিস সিতু, রমাকে পেয়ে আমি খুব সুখী হয়েছি, তারই সেলিব্রেশন করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু রমা আপত্তি করল।'

রমা বসু নিঃশব্দ পায়ে এ ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, চৌকাঠ অতিক্রম করে না এসে ওপার থেকেই স্থির অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে

কল্যাণব্রতকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার প্রতিটি ভঙ্গি এবং আচরণ, এমনকি যেন মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত।

টেবিলের সামনে একটি খাড়া পিঠের চেয়ারে কল্যাণব্রত বসে আছে। সাধারণত এ চেয়ারটিতে ডক্টর ত্রিদিব বাসুর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছাত্রই এসে মাঝেমধ্যে বসে। দিনপনেরো যাবৎ কল্যাণব্রত প্রত্যহই বসছে। টেবিলের ওপর তিন-চারখানি খাতা খোলা আছে, যার মধ্যে ডক্টর ত্রিদিব বাসুর জীবিকারহস্য নিহিত। ঐ খাতাগুলি রমা বসু দূর থেকেও চিনতে পারেন। কল্যাণব্রতর নিজেরও দু'-তিনটি খাতা রয়েছে ওখানে। একটি খোলা খাতার ওপর তার মুখখোলা অল্পদামের কলমটা পড়ে আছে। কিন্তু কল্যাণব্রত লিখছে না কিছুই, দেখে মনে হয় না এক মুহূর্তের জন্যেও সে পড়াশোনার কাজকর্ম করেছে। বোধহয় সন্ধ্যেবেলা এ বাড়িতে পদার্পণ করার পর থেকে অন্য কোনো চিন্তায় মগ্ন সে। অন্য কিছুর প্রতীক্ষারত।

ত্রিদিব বাসু বলেন, কল্যাণব্রতর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। রমা বসুও তাঁর সঙ্গে সহমত। ত্রিদিবের সেবাপরিচর্যার জন্যে তো বটেই, তাছাড়া তাঁর নিজের পক্ষ থেকেও।

রমা বসুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবার কল্যাণব্রতর বহিরাবরণ নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়। ভেতরে ওর কত ঐশ্বর্য, কিন্তু বাইরে অপরিসীম দীন। নম্র-নিরীহ। সহজে কারো চোখে পড়ে না। অথচ ঐ কল্যাণব্রতর জন্যেই তিনি আজ নিজেকে চিনতে পেরেছেন, আর তাঁকে বাকি জীবনের ভার বহনের চিন্তায় বিব্রত হতে হবে না, পাগল হয়ে থাকতে হবে না। ত্রিদিব তাঁকে অক্ষম জীবনলগ্নে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, আর একটু এগিয়ে গিয়ে শেষসন্ধির স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত করে রেখেছিল—কল্যাণব্রত সেই অপ্রাপ্ত জায়গাটিতে পৌঁছে দিয়েছে। একবার বা একমুহূর্তের জন্যে নয়, ত্রিদিবের অনুপস্থিতির সব দিনগুলি, এমন কি তার প্রত্যাবর্তনের পর রোগশয্যায় অতিবাহিত প্রতিটি রাত ও নিস্তব্ধ দুপুরগুলো। অবশেষে তিনি উপলব্ধি

করেছেন, এতদূর পৌঁছুতে না পারলেও জীবনের পূর্ণতা বিঘ্নিত হত না, নিজের অধিকারের সীমামধ্যে যতটুকু আছে তা'ও জীবনাস্বাদের অক্ষয় আকর। কিন্তু তা অনুসন্ধান করে নিতে জানা চাই। ভাল-বাসার মধ্যেই পরিতৃপ্তির সিদ্ধিমন্ত্র, এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নেই আর।

রমা বসু ঘরে ঢুকলেন, মাঝখানে টেবিল, তার ওপারে কল্যাণব্রত। রমা বসুর মুখে স্নিগ্ধ-কৌতূহল হাসি, বললেন, 'কি কল্যাণব্রত, লিখছিলে নাকি?'

কল্যাণব্রত চমকে উঠল, সামনের দরজা দিয়ে রমা বসু ঘরে ঢুকলেও সে তাঁকে দেখেনি এতক্ষণ। ঘাড় তুলল কল্যাণব্রত, মুখে সলজ্জ হাসি, কিন্তু কতকটা অনুযোগের মতোই বলল, 'না, লিখিনি কিছু। আমি কখন থেকে বসে আছি, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

রমা বসু এ প্রশ্ন বা অনুযোগের উত্তর দিলেন না, টেবিলের ওপর থেকে কল্যাণব্রতরই একখানা খাতা তুলে নিয়ে পাতা ওল্‌টালেন কিছুক্ষণ ধরে, 'বাঃ, এতদিনেও তোমার সাদা খাতা সাদাই রয়ে গেছে, সব খাতার বোধহয় একই অবস্থা?'

কল্যাণব্রত তার আনাড়ি সদ্যশিক্ষানুযায়ী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগে রহস্যময় হাসি হাসল সে, এই অবসরে রমা বসু বললেন, 'যাক, এর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি তোমার স্যারের সব খাতাই নিয়ে যাও, বাড়িতে বসে মন দিয়ে লিখে নিও, কিন্তু হারিয়ে ফেল না যেন!'

বিস্মিত কল্যাণব্রতর মুখে একটা প্রশ্ন এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু তা অতিক্রম করে রমা বসু আবার বললেন, 'ভয় নেই, তোমার স্যারকে বলব, আমিই খাতা নিয়ে যেতে বলেছি। তাঁর শরীর এখন অনেক সুস্থ, তোমায় আর এখানে এসে সময় নষ্ট করতে হবে না।'

রমা বসু দাঁড়ালেন না, কল্যাণব্রতর দিকে তাকিয়েও দেখলেন না আর। তার মুখভাব কেমন হল, তা দেখবার প্রয়োজন নেই। তাঁর তরফ থেকে কল্যাণব্রতর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কল্যাণব্রত যদি

এখনো আঁকড়ে থাকতে চায় তা তাঁর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। অতিরিক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এবং বিরক্তিকর। তবু একটি কথা তিনি আজ স্বীকার করেন, কল্যাণব্রতর কাছে তাঁর ঋণ অপরিসীম। অপরিশোধ্য। এ ঋণ তিনি কখনো বিস্মৃত হবেন না। ঋণ বিস্মৃত হওয়া, কল্যাণব্রতকে ভুলে যাওয়া—এর অর্থ ই নিজেকে আবার সেই বিচিত্র মানসিক রোগের বেদন-শয্যায় নির্বাসিত করা। ক্ষোভের শ্বাস ফেলতে ফেলতে স্বাভাবিক জীবন-শ্বাস বিস্মৃত হওয়া।

রমা বসুর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনি কখন অন্ধকার সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন ; অথচ অন্ধকারটা চোখে পড়েনি ! কোন্ রৌরব থেকে এতখানি আলো ছুটে এসেছে যাতে তাঁর চিত্তের মোহান্ধকার দূরীভূত হয়েছে, দৃষ্টি থেকে বহির্জগতের মসীময়তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

রমা বসু তাঁর সমস্ত বিস্ময় নিজেরই অন্তরে প্রবিষ্ট কবে দেন, বিপুল তন্ময়তার অন্তঃসলিলে ক্রমশ্ তলিয়ে যেতে থাকেন। জীবনের বিক্ষুব্ধ বহিরাবরণের নিচে এতখানি প্রশান্তি, এতদিন পর্যন্ত এ তাঁর কল্পনার অগোচর ছিল।

বাইশ

অন্ধকারের আবর্তে অম্লুলেখা যেন বাঘিনীর মতো ওৎ পেতে বসে ছিল। কিন্তু মানবী দেহধারিণী বলে তার চোখদুটি অগ্নিপ্রকাশ-হীন। ঘরের আবহাওয়াও কোনো হিংস্র প্রাণীর উপস্থিতি-গন্ধে ভারাক্রান্ত নয়।

অন্ধকারের মাঝে ঠায় বসে থেকে অম্লুলেখার দৃষ্টি অনেকখানি আঁধারভেদী হয়ে উঠেছে, কিন্তু শিলাদিত্যর সবেমাত্র আলো থেকে অন্ধকারে প্রবেশ। প্রতিটি জিনিষের অবস্থান মুখস্থ, তাই সে সহজ পদক্ষেপেই ইলেকট্রিকের সুইচটার দিকে এগিয়ে যেতে পারছে—হঠাৎ তাকে চমকিত করে দিয়ে ঘরের একপাশ থেকে অম্লুলেখার কণ্ঠস্বর ছিটকে এল, 'কি ভেবেছ তোমরা ?'

'অ্যাঁ, আমি, মানে আমরা—' বলতে বলতে শিলাদিত্য সুইচের কাছ থেকে সভয়ে পিছিয়ে আসে, তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে আবার এগিয়ে গিয়ে আলো জ্বালে, 'আমায় বলছিলে, কি বলছিলে ?' প্রশ্ন করেই সে আবার অম্লুলেখার দিকে তাকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগুনচাপা চোখের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

অম্লুলেখার অবস্থান একটুও বদলায় না, যেখানে দাঁড়িয়েছিল, খোলা জানলার কোল ঘেঁষে, সেখান থেকেই উঁচু গলায় জবাব দেয়, 'তোমায় না তো কাকে! এখন আমার মাসি-পিসি কে এখানে আছে ? কিন্তু বলা উচিত ছিল তোমার সেজকাকাকে, আমি বলেই মুখ বুজে সব সয়ে গেছি!'

বসবে না দাঁড়িয়েই থাকবে, চিন্তা করতে করতে শিলাদিত্য প্রশ্নময় স্বগতোক্তি করে, 'সেজকাকা—?'

'হ্যাঁ, তিনিই—তিনি নয়, সে-ই।' বলতে বলতে অম্লুলেখা কি-করি কি-করি ভাব নিয়ে আলনার কাছে এগিয়ে গেল। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আলনায় সাজানো জামা-কাপড়গুলো দেখল একবার, তারপর

সমস্ত উজাড় করে ঘরের চতুর্দিকে নিক্ষেপ করতে করতে বলল, 'তোমরা, এ সেট অফ্ ন্যাস্টি ফুলস্, তোমরা সকলে মিলে আমায় পাগল করে তুলেছ। তোমার সেজকাকা, চরিত্র যার রামায়ণের পাতায় মুড়ে রাখবার মতন, সে আমার চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলে! আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, সবাই যদি এভাবে আমার পিছু লেগে থাক, আমিও কালকেউটের মতন এই পরিবারের মানসম্ভ্রমের গোড়ায় মরণ কামড় দিয়ে তারপর মরব—তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা শিলাদিত্যর বোধগম্য হয়। কিছুদিন যাবৎ সেজকাকা জীবনভূষণ তাকে কিছু একটা বলবেন বলবেন করছিলেন। এই শোন্, আচ্ছা থাক—এই ধরনের দু'একটি চকিত শব্দ উচ্চারণ করেই থেমে যাচ্ছিলেন তিনি, অর্থাৎ ইতিমধ্যে আলোচনা করার উপযুক্ত করে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন। যখন বুঝতে পেরেছেন কাজের কথাগুলো বলতে গিয়ে লজ্জা সংকোচে জড়িত হয়ে পড়বেন না, তখনই শিলাদিত্যর পথ আগলে দাঁড়িয়ে যা বলবার তা অসংকোচ ভাষায় বলেছেন।

এগারোটা কুড়ির ক্লাশ অনুলেখার, তার জন্যে মাছ কিনতে যাচ্ছে শিলাদিত্য। হাতে চটের থলি ঝুলিয়ে বাজার করায় এখনো সে অভ্যস্ত নয়, ফিরতি পথে মাছের থলিটা অবশ্য হাতে করেই বয়ে আনতে হয়, কিন্তু খালি থলি হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে কেমন যেন লাগে। নিয়তই মনে হয়, এতখানি বয়েস পর্যন্ত যা কখনো করেনি, আজ অনুলেখার অনুদারতার চাপে পড়ে তাই করতে হচ্ছে—ছোটলোকের মতো কাজও অনেক। এগুলো সে যতটা সম্ভব আড়াল রেখেই করবার চেষ্টা করে, সেইজন্যে একটা সিল্কের শাড়িছেঁড়া ন্যাকড়ায় মাছের থলি সেলাই করিয়ে নিয়েছে,

বাজার যাবার মুখে সেটা রুমালের মতো প্যান্টের পকেটে লুকনো থাকে।

ফটকের সামনে দাঁতনমুখে পায়চারি করছেন জীবনভূষণ, পরনে মাদ্রাজী লুঙ্গি, গায়ে জালি গেঞ্জি। পায়ে বাটা-হাওয়াই। ষাটের কাছাকাছি বা ওপারে গিয়েও তাঁর স্বাস্থ্যে তিরিশের জৌলুস। এর কারণ, শিলাদিত্যর মনে হয় সেজকাকার জীবনে কোনো গতকাল নেই, চিন্তাময় ভবিষ্যৎও নেই, তিনি চিরদিনই নিশ্চিত বর্তমানের বুকে অধিষ্ঠিত।

দাঁতনমুখে জীবনভূষণ শিলাদিত্যর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বুড়ো আঙুলের মতো মোটা নিমদাঁতন সুদৃঢ় দাঁতের সাহায্যে আধ-চির করতে করতে অস্পষ্টস্বরে বললেন, 'একটু দাঁড়া, কথা আছে।'

আধফাঁক দাঁতন বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাকি আধখানার সাহায্যে জিভ ছুললেন জীবনভূষণ, মুখের দু'কশ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ল, সেদিক থেকে শিলাদিত্য চোখ ফিরিয়ে নিল। পরনের লুঙ্গির প্রান্ত তুলে জীবনভূষণ মুখ মুছলেন, তারপর বললেন, 'ক'দিন থেকে তোকে বলব ভাবছিলুম, আবার এ-ও মনে হচ্ছিল, হয়তো সব সামলে যাবে, কিন্তু—। কোন্ একটা প্রফেসরকে নিয়ে লেখা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে—বাড়ির বাইরে তো কান পাতা যায় না।'

জীবনভূষণ এবং বাড়ির সবাই অনুলেখার নাম ধরে সম্বোধন করেন, কারণ এ পরিবারের বধূ হয়ে আসবার আগে থেকেই তার মামার বাড়ির সঙ্গে দত্ত-পরিবারের বন্ধুত্ব-সম্পর্ক। অনুলেখা আশৈশব পরিচিত, এই সূত্রেই শিলাদিত্যর সঙ্গে তার প্রেম, পরিণয়।

নিজের স্ত্রীর প্রসঙ্গে এতখানি অনুদার মন্তব্য শুনে শিলাদিত্যর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠা উচিত ছিল, তা সে নিজেও স্বীকার করে, কিন্তু পরিবর্তে কতকটা নির্লজ্জের মতো অনুলেখার পক্ষে সাফাই দেবার চেষ্টা করে সে, 'ওসব বাজে কথা সেজকা'—আমি তো জানি।'

জীবনভূষণ রুক্ষস্বরে বলেন, 'বাজে কি সত্যি তা আমি জানি না, কিন্তু স্ত্রীর বদনাম কানে এলে স্বামীর উচিত সাবধান হওয়া।'

এবার বোধহয় শিলাদিত্যের মগজে একঝলক রক্ত চলকে ওঠে, সে উত্তর দিতে যায়, 'তাহলে তো আমার বাবারও তাই উচিত ছিল।' কিন্তু কথাটা সে বলতে পারে না, মা'র মৃত্যুদৃশ্য ও তাঁর দুটি পায়ের পাতায় মুখ গুঁজে সেজকাকার কান্না তার কণ্ঠাগত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাক্রমণ যেন।

সেজকাকার রুক্ষতার সঙ্গে নিজের গলার শান্ত দৃঢ়তার তাল দিয়ে শিলাদিত্য বলে, 'লেখা প্রফেসরের বাড়ি পড়তে যায়। যদি রাস্তার লোকের বাজে কথায় কান দিয়ে তার পড়া বন্ধ করে দিতে হয়, তাহলে তো কথা নেই!'

এবার জীবনভূষণ উন্নতকণ্ঠে একটা কঠিন নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলেন, 'আমি অতশত জানি না, বউএর পড়া ছাড়াও, নয়তো তাকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে বিদায় হও।' কিন্তু একেবারে এতটা না বলে বললেন, 'বাড়ির খবর তুমি রাখ কি? তোমরা না হয় জন্মাবধি আমার চোখের সুমুখে আছ, আমি তোমাদের একটু ভিন্নভাবে দেখি, কিন্তু শুনেছ কিনা জানি না, মেজদার চাকরির এক্সটেনশান্ শেষ হয়ে গেছে, রিটায়ার করবে এবার, মানে এখানে এসে থাকবে। আর একটা কুখবর প্রায় একসঙ্গেই এসেছে, তোমার নতুনকাকা অর্থাৎ স্বনামধন্য আই. টি. ও. সাসপেনড্ হয়েছে—চাকরি যাবে, বাড়ি ফিরবে শিগ্‌গিরই। এরা কেউ লেখার চালচলন পছন্দ করবে না; এই নিয়ে পারিবারিক বিরোধ হয়, তা তুমিও বোধহয় চাও না?'

শিলাদিত্য জবাব দিল না। যে দুটি মহাসংবাদ জীবনভূষণ পরিবেশন করলেন, তার কোনোটাই জানত না সে। মেজকাকা জ্যোতিভূষণের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে, এখানে এসে থাকবেন, অথচ সে শুনেছিল তিনি পাটনায় বাড়ি করেছেন। এখানকার বাড়ির বাঁটোয়ারা করে নিজের অংশ ভাড়া দেবার ইচ্ছে ব্যক্ত করে কিছুদিন আগে জীবনভূষণকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন তিনি।

জীবনভূষণ গা করেননি। পরিবারের অবিবাহিত পুরুষটির আধিপত্য একদিক দিয়ে একটু বেশি হয়, তাই জীবনভূষণের নীরবতাজনিত অসম্মতি অগ্রাহ্য করে কেউ আর বাড়ি ভাগ করার কথা তোলেননি।

নতুনকাকা অমিয়ভূষণের সাসপেনড্ হবার খবরটা অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক। প্রায় একমাস আগে খবরের কাগজে একটি শীর্ষ-নামা দেখেছিল শিলাদিত্য। ইনকামট্যাক্স অফিসার সাসপেনডেড্। বাকি সংবাদটুকু পড়ে দেখার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ ছিল না। মনে হয়েছিল, এসব লোকের চাকরির মেয়াদ রদ করাই যথেষ্ট নয়, গুলি করে মারা উচিত। চতুর্দিকে দুর্নীতির বেড়াজাল। শিলাদিত্যর নিজের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকলে এদের গাছে টাঙিয়ে গুলি করে মারার আদেশ দিত। এ ধরনের চিন্তা বহুবারই হয়েছে, তার মধ্যে খবরের কাগজের হেডলাইন দেখার পর নিজের অজান্তে নতুন-কাকা অমিয়ভূষণকে কেন্দ্র করেও একবার।

জীবনভূষণ বললেন, 'চুপ কেন, কি ভাবছিস ?'

শিলাদিত্য ঘাড় নাড়ে, 'কিছু না তো !'

'বেশ, তাহলে লেখাকে বলিস কথাটা, আমার পক্ষে বলতে যাওয়া ভাল দেখায় না।' একটু বিরতি দিয়ে জীবনভূষণ আবার বললেন, 'তোকেও আমি বলতে চাইনি, ভাবছিলুম নিজেই সাবধান হবি। ব্যাপারটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে—পরশু রাত্তিরে লেখা বাড়ি পর্যন্ত ফেরেনি।'

এই প্রসঙ্গে শিলাদিত্যর মনে আগে থেকেই একটা ষোল আনা মিথ্যে সৃজিত হয়ে ছিল। পরশু রাতে অম্লুলেখা বাড়ি ফেরেনি, ডক্টর সেনশর্মার ওখানে কাটিয়েছে। প্রায় ভোর পাঁচটা নাগাদ পায়ে হেঁটে একা এসেছে। বোধহয় একটু ভয়ও পেয়েছিল সে। শিলাদিত্যর প্রায় সারারাত জাগরণেই অতিবাহিত হয়েছে। অম্লুলেখাকে খুঁজতে যাবার কিছু নেই, যথাস্থানে গিয়ে নিয়ে আসবারও নেই, ইদানীং সে একা একাই যাওয়া-আসা করছে।

ডক্‌টর সেনশর্মার বাড়ির অপর পারের বাড়িটির রকে বসে কয়েকটি চ্যাংড়া ছোকরা আড্ডা দেয়। অনুলেখার গতায়াত লক্ষ্য করে তারা। 'দিদিমণি আমাকেও একটু, আমাদের কি পছন্দ হয় না ম্যাডাম, ডক্‌টরেট না হলেও নেহাৎ ফ্যালনা তো নই'—ইত্যাদি টিটকিরি ও মন্তব্য শোনায়। অনুলেখা শোনে, গ্রাহ্য করে না। শিলাদিত্য না-বুঝ ভান করে থাকে।

সেদিন দু'জনে রিক্সা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওপারের রক্‌ থেকে একটি গানের কলি ভেসে এল। পরিচিত সুরের স্বেচ্ছাকৃত অশ্লীল বেসুরো বিকৃতি। 'আমার হাত ধো-ও-রে তুমি নিয়ে চ-অ-লো স্‌-সখা আমি যে পথ চিনি না-আ-আ।...ও দাদা, পড়ে যাবে যে, রাস্তা হারিয়ে ফেলবে, হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে আসুন!'

গায়কের গান ও অনুরোধোক্তি থামিয়ে দিয়ে তাঁর পার্শ্ববর্তী একজন কোনো অপরিচিত কবির কবিতার দু'কলি আবৃত্তি করে, সম্ভবত দু'একটি শব্দ বদলে দিয়ে।

'চুপ চুপ গেও নাকো দেখ সঙ্গোপনে
বারাঙ্গনা যায় আজ পতি সম্ভাষণে!'
'হাফ্‌ বুড়োটা মাইরি খুব ফরচ্যুনেট্‌।'
'চল্‌ আমরাও শেয়ার ক্লেম করি।'
'একা-একা—'
'চলবে না, চলবে না।'
'আমাদের দাবি—'
'মানতে হবে।'
'ভাগ দিয়ে—'
'খেতে হবে।'
'ইন্‌কিলাব—'
'জিন্দাবাদ!'

অনুলেখা অপরিসীম লজ্জা পেয়েছিল, শিলাদিত্যর তখনো পর্যন্ত অনধিগম্যতার ভান; ওদের গান কবিতাকলি মন্তব্য আর শ্লোগান

অনুলেখার কানচাপা দেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করেছে, 'তুমি কতক্ষণ পড়বে, আমি ক'টায় নিতে আসব ?'

অনুলেখা কিছুক্ষণ পর্যন্ত জবাব দিতে পারেনি, তারপর কণ্ঠে কষ্ট-গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলেছে, 'আসতে হবে না, তুমি যাও। পড়া হয়ে গেলে আমি নিজেই বাড়ি ফিরে যাব।'

শিলাদিত্য লক্ষ্য করেছে অনুলেখার গম্ভীর কণ্ঠস্বরের নিচে লজ্জার প্রবাহ, গলায় কম্পনের আভাস। পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে শিলাদিত্য, মাঝে মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে নেহেরু পার্কে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অপমানসিক্ত মনের গ্লানি শুকিয়েছে, কিন্তু বাড়ি এসে দেখে অনুলেখা তার আগেই পৌঁছে গেছে। চুপ করে বসে আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, ডক্টর সেনশর্মার বাড়িতে ঢোকেনি, শিলাদিত্য পেছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ফিরেছে।

তারপর অনুলেখা দু'দিন ডক্টর সেনশর্মার বাড়ি যায়নি, নিয়মিত ক্লাশ করে এসেছে - সন্ধ্যের পর থেকে বাড়িতেই, শুকনো নিস্পৃহতা অবলম্বন করে গুম হয়ে থাকা। তৃতীয় দিন থেকে আবার সান্ধ্যাভিসারে যেতে আরম্ভ করেছে, একাই যায়, একাই ফেরে। ববং আগের চেয়ে বেশি রাত করেই।

দু'তলার অন্ধকার বারান্দা। অন্ধকার রাস্তার দিকে একাগ্র অথচ অন্যমনস্ক দৃষ্টি মেলে শিলাদিত্য দাঁড়িয়ে। তার জীবনের যা খোয়া যাবার তা তো যাচ্ছেই, সর্বদিক দিয়ে ক্রমশ নিচেই নেমে যাচ্ছে সে, তবু একটা মিথ্যে মানসম্ভ্রমের খোলস এখনো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে আছে, এটাও অনুলেখা কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। রাত্রিশেষে অনেক পাঁক গায়ে মেখে ফিরবে অনুলেখা, কিন্তু শিলাদিত্যর একটিমাত্র প্রার্থনা, যেন রাতেব অন্ধকার থাকতে থাকতেই লোকচক্ষুব অন্তরালে সে বাড়ি ফিরে আসে।

ক্রমশ অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, চোখের দৃষ্টি অনেকখানি রাস্তা স্বচ্ছভাবে অতিক্রম করে যায়। দু'একজন পথচারীও দৃষ্ট হতে লাগল। শিলাদিত্য দেখল, তারা প্রত্যেকেই এ বাড়ির গায়ে একবার

করে নজর বিঁধিয়ে তবেই গেটের সুমুখটুকু অতিক্রম করে যাচ্ছে। অনুলেখাকেও দেখা গেল, রিক্সা নেয়নি, পায়ে হেঁটে ফিরছে। গেটের সুমুখে এসে থমকে দাঁড়াল, তারপর যেন বিপুল সাহস একীভূত হল তার—গেটের মাথার হুক খুলে গেটটা একটু ফাঁক করে সেই সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে নিজের দেহটা ভেতরে গলিয়ে আনল সে। তারপরই শিলাদিত্যর সম্মোহনী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি আবদ্ধ হল তার, চোখজোড়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থির হয়ে রইল। শিলাদিত্য দেখল অনুলেখা নিজের চোখ দুটিকে তার দৃষ্টির শাসন থেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শেষপর্যন্ত শিলাদিত্যর মায়া হল, সে নিজেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অনুলেখার শাসন-শৃংখলিত চোখজোড়ার মুক্তি দিল।

অনুলেখা পাশে এসে দাঁড়ায়, শিলাদিত্যকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে কৈফিয়ৎ দেয়, 'একটা খুব নীরস বিষয় লিখতে লিখতে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।'

তখনো অনুলেখার হাতে 'ধর্মের ডাক' বইপত্র, শিলাদিত্যর কাছে কৈফিয়ৎ দেবার আগে সাহস করে ওগুলো ঘরে রেখে আসতে পারেনি। কিন্তু এই যৎসামান্য এবং অকিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ অনুলেখার নিজেরই সন্তোষজনক মনে হয় না, একটা খাতা খুলে দেখাতে যায়, 'দেখ না, কি সব হিজিবিজি, যাচ্ছেতাই—।'

খাতাটার দিকে শিলাদিত্য তাকিয়ে দেখে না, অনুলেখার দিকেও নয়, কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য নিঃসন্দেহ ও স্বাভাবিক রেখে বলে, 'তার জন্যে আর কি হয়েছে, অমন তো সবারই হয়!'

তেইশ

অনুলেখার সেদিনকার কৈফিয়তের মতো শিলাদিত্যেরও একটা কৈফিয়ৎ পূর্বরচিত ছিল, জীবনভূষণের অভিযোগের উত্তরে সে জবাব দিল, 'ওঃ, তুমি পরশুর কথা বলছ, সেদিন লেখা তার এক কলেজ-বান্ধবীর বিয়েতে গিয়েছিল, সেখান থেকে রাত্তিরে বাড়ি আসতে দেয়নি!'

জীবনভূষণ সে কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করলেন না, না করুন, শিলাদিত্যর ক্ষতি নেই কিছু। সে নিজেও অনুলেখার কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করেনি, অনুলেখারই বা কি ক্ষতি হয়েছে তাতে!

জীবনভূষণ তাঁর কণ্ঠের সন্দিগ্ধভাব বজায় রেখেই বললেন, 'তা হবে—'

শিলাদিত্য পাশ কাটাবার পথ খুঁজছে, মাছের বাজারের দেরি হয়ে যাচ্ছে. 'আমি যাই তাহলে?'

'হ্যাঁ।' জীবনভূষণ আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'মনে করে বলিস কিন্তু লেখাকে। ঘরের বউ, যদি একবার বদনাম ছড়িয়ে যায় তা বংশপরম্পরায় টিকে থাকবে।'

শিলাদিত্যর জিভ আবার সুড়সুড় করে উঠল, বলতে গেল, 'এ বোধ তোমার কি আজই হল? একটা কলংক তো আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছ! হয়তো তোমার অপরাধ বাস্তবিকই ছিল না, কিন্তু তবু তোমার কি সাবধান হওয়া উচিত ছিল না?' কিন্তু কোনো কথা না বলেই সে ফটক ঠেলে বেরিয়ে গেল।

শিলাদিত্যর পিসতুতো ভাই, তারই সমবয়সী, মামার বাড়ি বেড়াতে এসে শিলাদিত্যকে একটি ধাঁধা বা গোলকধাঁধা জিগ্যেস করেছিল। ধাঁধা গোলকধাঁধা কথাটা তারই পিসতুতো ভাই অমলের। বলেছিল, 'বল্ তো আদি, এমন এক ছেলে যে বাপকে কাকা বলে, আর বাপ ছেলেকে ছেলে বলতে না পেরে ভাইপো বলে

—বল্ তো, তাদের মনে কি কষ্ট, বল্ তো এই হতভাগ্য মানুষ দুটি কে?' কথাটা অর্ণবের সামনেই বলেছিল সে। অর্ণব নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিল না তখন। সে ছল্ছল্ চোখে সেখান থেকে উঠে গিয়েছিল। শিলাদিত্য লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিয়েছিল, আর অমল হো-হো করে হেসে উঠে বলেছিল, 'এই লজ্জাতে আমার মামার বাড়ি আসতে ইচ্ছে করে না।' যাক, সে অমল আর ইহজগতে নেই, এক বৃহত্তর লজ্জার দায় কাটাতে গিয়ে বছরসাত আগে আত্মহত্যা করেছে, তবে তা এই দত্তবাড়ির লজ্জার সূত্রে পাওয়া কোনো লজ্জা নয়।

জীবনভূষণ চিন্তা করলেন, অনুলেখাকে নিজের মুখে কিছু বলতে চান না তিনি, তবে বলতেই হবে। শিলাদিত্যর হাবভাব দেখে মনে হল তাঁর কথায় সে রুষ্ট হয়েছে; তা হোক না-হোক, অনুলেখাকে সাবধান করে দেবে সে সাহস নেই তার। বরং তারই আস্কারা পেয়ে অনুলেখা অতটা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে। সাংঘাতিক রকমের বেআব্রু ও বেপরোয়া! বিয়ের পর বছর-দুই পর্যন্ত শিলাদিত্য নতুন স্বর্গপ্রাপ্তির মোহে আচ্ছন্ন ছিল। অনুলেখার মামার বাড়ির সঙ্গে পরিচিত বা দূরসম্পর্কে সম্পর্কিত উঁচু মহলের ব্যক্তিবর্গের ছোঁয়ায় নিজে উঁচুতে উঠতে গিয়ে অনুলেখাকে স্বর্গের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল সে। তখনো তার পিতা বর্তমান। তাঁর নিজেরও কিছুটা সামাজিক মর্যাদা ও মানপ্রতিষ্ঠা ছিল। আর্থিক সঙ্গতিও। সেগুলির সাহায্যে শিলাদিত্য যদি নিজের ভবিষ্যতের মূলপত্তন করবার চেষ্টা করত, তাহলে এতদিনে পুরোপুরি মানুষ না হোক কিছুটা অন্তত হতে পারত সে। এদিক দিয়ে কেউ তাকে উৎসাহিত করেনি, এমনকি অমূল্যভূষণও নয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি অর্থব্যয়ের মাধ্যমেই সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শিক্ষিত এনজিনিয়ার ছিলেন অমূল্যভূষণ। বিলিতি ছাপও ছিল। কিন্তু চাকরি করেননি তিনি। ঠিকেদার ছিলেন। উপার্জন যথেষ্ট। প্রতিটি সন্ধ্যেয় তার বৃহত্তর অংশ নিজের ক্ষয়িত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও চিত্তবিনোদনের জন্যে খরচ করতেন।

নীলিমাদেবী জীবনভূষণকে ডাকতেন কুমারী কন্যা। তাঁর সঙ্গে জীবনভূষণের সম্বন্ধ অনেকটা খেলাঘরের জুটির মতো ছিল। নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ঘনিষ্ঠতা। অমূল্যভূষণের অমনোযোগের দরুন তাই হয়তো কখনো সখনো রহস্য কৌতুকের সীমা অতিক্রম করে গেছে। তাও কতকটা ক্রীড়া-কুতূহলে। এদিক দিয়ে নীলিমাদেবীর ভ্রষ্টা অপবাদ অন্যায় দোষারোপ। ভালবাসা শ্রদ্ধা এবং সমবয়স্কতা-সুলভ মনোভাবের সংমিশ্রণে জীবনভূষণের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক ছিল, তার ব্যাখ্যা প্রণয় নয়, বন্ধুত্বও না। সে সম্বন্ধ যেন অনন্য-সংজ্ঞা। সম্ভবত নৈতিকতাময় পৃথিবীর পক্ষে তা অদ্বিতীয়। নীলিমাদেবী স্খলিতা ছিলেন না। সতীরমণী—তা'ও নয়। স্বামীর সম্বন্ধে তাঁর অন্তঃপ্রোথিত ঘৃণাভাবই ছিল, জীবনভূষণ ছাড়া অপর কারো তা বোধগম্য হত না। এমনকি স্বয়ং অমূল্যভূষণেরও।

ঐ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে জীবনভূষণও সদ্‌ব্যক্তি নন। তাঁর যথার্থ পরিচয় নীলিমাদেবীই জানতেন, জীবনভূষণের বিচার শুধু তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। লোকের মন্তব্য নীলিমাদেবী যেমন শুনতে পেতেন, তেমনি জীবনভূষণও—কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতেন না, কারণ দোষারোপ সর্বৈব মিথ্যে। কবে কোন্ বিশেষ অবসরে ক্রীড়ামাত্রা এক-আধবার ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তবু প্রকৃত পক্ষে তা খেলাই এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘনিষ্ঠতা। নীলিমাদেবী অথবা নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় মনোভাব থাকলে তিনি আজ শিলাদিত্যকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার স্ত্রীর চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলতে পারতেন না। একটা দিন অপেক্ষা করে তারপর তিনি নিজেই অম্লুলেখাকে যা বলা উচিত বলবেন, এ-ও স্থির করতে পারতেন না। বলবেন সাবধান হতে। যদি সে তা অগ্রাহ্য করে তাহলে তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিতে তিনি দ্বিধা করবেন না।

তাই জীবনভূষণ অম্লুলেখাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অম্লুলেখা আসতে দেরি করেনি। এসে জিগ্যেস করল, 'আমায় ডেকেছিলেন সেজকা ?'

জীবনভূষণ একটু চমকে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেকেছি তো। বোস না।' অনুলেখার বসবার জন্যে তিনি নিজের আরামচেয়ারটার দিকে আঙুল দেখালেন।

কিন্তু জীবনভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন, তাই অনুলেখা না বসেই বলে, 'ঠিক আছে। আমায় কিছু বলছিলেন?'

'আদিত্য বলেনি তোমায়?' অনুলেখার দিকে একেবারে সরাসরি না তাকিয়ে জীবনভূষণ প্রশ্ন করেন।

অনুলেখা একটু চিন্তা করে, 'উঃ কই, না তো—কবে?'

'আজ-কালের মধ্যে?'

'না! কেন বলুন তো?'

জীবনভূষণ চুপ করে রইলেন। এসব কথা কি তাঁরই মুখ দিয়ে প্রকাশিত হওয়া একান্ত দরকার? কিন্তু শিলাদিত্য তো মানুষ নয়, সে কখনোই বলতে পারবে না, অন্য কেউ কিছু বললে তারও প্রতিবাদ করবে। এ বাড়িতে জীবনভূষণের আরো দুই ভাই আছে, শিলাদিত্যর অপর দুই কাকা, অনিলভূষণ, সুনীলভূষণ—দুটি সম্পূর্ণ অপদার্থ জীব। তাদের স্ত্রীরা আছে, তারাও যেন নিজের নিজের স্বামীর অসম্পূর্ণ ও অপদার্থ ব্যক্তিত্বের অংশবিশেষ। অনুলেখা ঐ ক'টি মানুষকে মোটেই আমল দেয় না। এদের বাদ দিলে জীবনভূষণ একাই—দত্তবাড়ির মান-গৌবব ও মর্যাদার একমাত্র প্রতিভূ ও রক্ষাকর্তা, অতএব তাঁকেই বলতে হবে।

স্থিরসংকল্প হয়ে জীবনভূষণ বলেন, 'তুমি বড্ড বেশি বাইরে যাচ্ছ, এ নিয়ে পাঁচজনে কথা তুলেছে।'

এতক্ষণ অনুলেখা জীবনভূষণের সম্ভ্রম রেখে কথা বলছিল, এবার তার কণ্ঠস্বর পাল্টে যায়, 'পাঁচজনে কে কি বলছে তা তো আমার কানে আসেনি, আজই প্রথম আপনার মুখ থেকে শুনছি, কিন্তু আমার বড্ড বেশি বাইরে যাওয়ায় কার কি ক্ষতি হয়েছে?'

'জিনিষটা ভাল নয়।'

'কার পক্ষে ভাল নয়?'

'তোমার আর বাড়ির পক্ষে।'

অনুলেখা স্থির হয়ে দাঁড়াল, কণ্ঠস্বরের কর্কশতা অবলুপ্ত করে দিয়ে গাম্ভীর্য টেনে এনে বলল, 'আমার সম্বন্ধে চিন্তার ভার আমার নিজেরই ওপর ছেড়ে দিন সেজকা। আর আপনার যদি মনে হয় আমার জন্যে এ বাড়ির অপবাদ ছড়িয়েছে, তা নিয়েও আপনি ভাববেন না, কারণ এ ধরনের অভিযোগ দত্তবাড়ির পক্ষে নতুন নয়, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। প্রচুর অপবাদ আর কলংক মাথায় নিয়েও যে স্বর্গে যাবার গেছে, যে বেঁচে থেকে নীতিকথা আওড়াবার সে তা আওড়ে চলেছে।'

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলল অনুলেখা। ইঙ্গিত নয় প্রত্যক্ষ দোষারোপ, জীবনভূষণের সমস্ত ধৈর্য ঘুচে গেল। এভাবে কেউ কখনো তাঁকে বলতে পারে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। নীলিমাদেবীর সঙ্গে একই প্রাঙ্গণে তাঁর যৌবন উত্তীর্ণ হয়েছে, অনেক উচ্ছ্বাস অনেক মান-অভিমান হাসি-কান্নায় অনেক তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন অতিবাহিত করেছেন তাঁরা, কারো কারো চোখে তা দৃষ্টিকটু ঠেকে থাকবে; কিন্তু সামনে এসে তুচ্ছতম কটাক্ষ করেনি কেউ। আড়ালে আলোচনা চলেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ শ্রদ্ধাহীনতা দেখা যায়নি।

জীবনভূষণের ইচ্ছে হল, অনুলেখার গালে ঠাস্ ঠাস্ করে গোটা-কতক চড় মারেন। তার যে গালদুটি নিত্য সন্ধ্যেয় কোন্ এক অধ্যাপকের দ্বারা চুম্বিত হয়, আজ সন্ধ্যাপূর্বমুহূর্তে সেই গালদুটিতে কয়েকটি কালশিরার দাগ টেনে দেন। কিন্তু এই ভেবে তিনি এতখানি উত্তেজনা সংযত করে নিলেন, সময়ের পলি পড়ে আজ খানিকটা মিথ্যে দৃঢ় সত্যের রূপ ধারণ করে বসে আছে, অনুলেখাকে শাস্তি দিয়ে সে দৃঢ়তা শিথিল করা যাবে না, বরং সে ভাববে অপ্রিয় সত্য পরিপাক করতে না পেরে তিনি ক্ষেপে উঠেছেন।

তাই উষ্মা প্রকাশের পরিবর্তে জীবনভূষণ হাসলেন একটু, তারপর একজন সংসারাভিজ্ঞ দার্শনিকের মতো বললেন, 'তোমার বয়েস কম লেখা, তাই ভাবছ মানুষ বুঝি নিজের ভার নিজেই বহন করে, কিন্তু

তা নয়। প্রতিটি মানুষের পরিপূর্ণ ভার তার সমাজের ওপর, সে নিজে যতটুকু করে তা একান্তই গৌণ; তাই তাকে সমাজের কথায় কান দিতেই হয়। যে আশ্রয় দেয়, দায়িত্ব নেয়, তার অভিভাবকত্ব ক্ষুণ্ণ করতে যাওয়া মানে নিজেকে অসহায় করে তোলা—এটা বুদ্ধিমান বিবেচকের কাজ নয়।'

অনুলেখা চুপ করে থেকে জীবনভূষণের বাণী শুনছিল, কথার মাঝে বাধা দেয়নি, শেষ হবার পরও কোনো বিরোধ বা মন্তব্য না করে শুধু বলল, 'যাচ্ছি আমি।'

'আচ্ছা।' জীবনভূষণও তদতিরিক্ত কিছু বলতে পারলেন না, পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে দমিত করে দিয়েছে। তাঁর এতখানি অভিভাষণ অনুলেখা তার নিজের মনের সামান্যতম স্থানও স্পর্শ করতে দেয়নি!

অনুলেখা বলে, 'চুপ করে থাকা চলবে না, তোমায় এর প্রতিকার করতে হবে।'

শিলাদিত্য ঘাড় বাঁকিয়ে মেরুদণ্ডের প্রথম গ্রন্থির কাছে চুলকোতে থাকে, চোখেও খানিকটা স্বভাবজাত সন্দিগ্ধ অথচ বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে, বলে, 'আমায় তুমি কি করতে বল?'

'আমি যা বলি তা কি তুমি পারবে?' একটু আস্কারা দিয়েই অনুলেখা তার বক্তব্যের ভূমিকা রচনা করে।

শিলাদিত্য যেন হালে পানি পায়, বুঝি কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি বাদানুবাদ নয়, একটা দাম্পত্য আলোচনা, তাই সে ধীরেসুস্থে গায়ের কামিজ খুলে আলনায় টাঙিয়ে দিয়ে এসে নিজের খাটের এককোণে পা ঝুলিয়ে বসে। এটুকু সময়ের জন্যে অনুলেখা তাকে বিরক্ত করে না।

অনুলেখা দেখে শিলাদিত্য গুছিয়ে গাছিয়ে, প্রস্তুত হয়েই বসেছে; তখন একটা উদ্‌গত হাসি চেপে নিয়ে গম্ভীর অথচ অনুজ্ঞাপ্রার্থিত গলায় বলে, 'বলি তো, তুমি কিছু মনে করবে না?'

ঘাড় নাড়ে শিলাদিত্য, অনুমতি দেয়।

বহুদিন পরে, যেন কত যুগ, অনুলেখা এসে শিলাদিত্যর পাশে বসল। তার বাঁ হাতটা নিজের কোলের মধ্যে টেনে এনে আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'তুমি বরং বাড়ি পার্টিশান করিয়ে নাও, একবার তো কথা উঠেছিল, তোমার সেজকাকার জন্যেই হয়নি, আলাদা ব্লক হয়ে গেলে আমরা যা খুশি করতে পারি, নাচি কুঁদি কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

শিলাদিত্য হেসে ফেলল, এ ধরনের হাসিতে মনের ক্লেশই ঝরে পড়ে, সুখৈশ্বর্য নয়। 'পার্টিশান হলে আমাদের ভাগে থাকবে কি? তিন শেয়ার তো এদিকেও! অর্ণব নিজের ভাগ চাইবে, বোনটিও এসে অংশ চাইবে, আর—'

বলতে বলতে শিলাদিত্য থেমে গেল। পার্টিশান মানে ইট-কাঠের খণ্ডতা ছাড়াও অনেক কিছু। এতবড় বাড়ির বহু অংশেই ভাড়াটে বাসা। বাইরের কাকারা এ নিয়ে মাথা ঘামান না। ভাড়ার আদায়টুকু বলতে গেলে শিলাদিত্যই আত্মসাৎ করে। যে কাকাদুটি এখানে থাকেন জীবনভূষণের ভয়ে তাঁরা কিছু বলতে পারেন না। তাছাড়া পিতামহর আমলের ধানজমি—সে আয় অনিলভূষণ সুনীল-ভূষণ ও শিলাদিত্য ভাগ করে নেয়। জীবনভূষণের প্রাপ্য শিলাদিত্যর তরফে জমা হয়। পার্টিশান হলে বাড়ি নয় শুধু, জমিজিরেত এবং আমবাগানটাও—সর্বাধিক ক্ষতি শিলাদিত্যরই।

শিলাদিত্যর পিতৃদেব নগদ টাকাকড়ি বিশেষ রেখে যেতে না পারলেও গোটা তিনেক ব্যাঙ্কে যা ছিল, তাও মন্দ নয়। জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে টাকা রাখতেন অমূল্যভূষণ, নিজেব ও শিলাদিত্যর নামে। পিতার মৃত্যুর পর এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান চলেছিল, জীবনভূষণের হাঁক-ডাকে প্রসঙ্গ লুপ্ত হয়ে যায়।

সবদিক বিবেচনা করে শিলাদিত্য অসমাপ্ত কথাটির সূত্র ধরে আবার বলল, 'বুঝলে না লেখা, পার্টিশান হওয়া মানে আমাদের মহাশূন্যে ভেসে যাওয়া।'

অম্বুলেখা যেমন আকস্মিভাবে শিলাদিত্যর পাশে এসে বসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ সেখান থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার বাবার যা কিছু তা একা তোমারই। তোমার বোন তার বাবার বাড়ির ভাঙা ইটের পাঁজার ভাগ নিতে কলকাতা থেকে এখানে ছুটে আসবে না। আর অর্ণব কেন ভাগ পাবে, সে তো তোমার সেজকাকার সবাই জানে। তোমরা লজ্জা পাবে বলে আমি কিছু বলি না। সেজকাকা আজ বিকেলে আমায় খুব ধর্মকথা শুনিয়েছেন, ধর্মত অর্ণবের প্রাপ্য শুধু তাঁর কাছেই, তোমার স্বর্গত বাবার কাছে নয়—হি ওয়াজ এ মেয়ার নেমলেণ্ডার। পরিষ্কার ভাষায়, বেনামী পিতা!'

শিলাদিত্য মাথা নিচু করে অম্বুলেখার অভিভাষণ শুনছিল, মাঝখানে একটিও কথা না বলে নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিল। অম্বুলেখার বক্তব্য ও মন্তব্য শেষ হয়ে যেতে সে চিৎকার করে উঠল, 'লেখা, তুমি এতক্ষণ যা বললে তার প্রতিটি কথা মিথ্যে—আমি জানি। মা মারা যাবার পর তাঁর দু'পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে আমি সেজকাকাকে কাঁদতে দেখেছি।'

অম্বুলেখা হেসে ফেলল, 'তাতেই বুঝি যত পাপের ইতিহাস ধর্মকথিকায় পরিণত হল? কি সত্যি, কি মিথ্যে, তা কি তুমি তোমার মাকে কখনো জিগ্যেস করেছিলে?'

শিলাদিত্য আর সামলাতে পারল না, বলে ফেলল, 'লেখা, নিজেকে দিয়ে সকলকার বিচার করতে যেও না।'

'হোয়াট ডু য়্যু মীন, হোয়াট ডু য়্যু মীন?' অম্বুলেখা শিলাদিত্যর কাছে এসে তার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল। তার চোখদুটিতেও ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা নেচে উঠেছে।

শিলাদিত্য জবাব দেয় না, তখন অম্বুলেখাই আবার বলে, 'তুমি প্রফেসরের কথা বলছ, তার সঙ্গে আমার ইলিসিট রিলেশন? হ্যাঁ, ইয়েস, আছে। আমি প্রফেসরকে ভালবাসি, বউ না থাকলে এতদিন তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যেত। প্রফেসরের সঙ্গে আমার ইলিসিট রিলেশন নেই, বরং তোমার সঙ্গেই ছিল। তুমি কি পুরুষ

মানুষ ? ফিমেল হাজব্যাণ্ড বলে অভিধানে কোনো শব্দ নেই। তোমার জন্যে আমি নতুন ধরনের সমাজচিন্তা করতে চাই না ; আমি চাই না লোকে আমাদের সমজাতীয় পেয়ার বলে হাসাহাসি করে।'

অনুলেখার উন্মাদ কবল থেকে শিলাদিত্য নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে না, শুধু মুখে বলে, 'লেখা, আমার কাছ থেকে তুমি সরে যাও।'

'সরে তো আমি আছিই, তাই বলে হ্যাগার্ড ডিভোর্সীর মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব নাকি ? তোমার বাবা যেমন নীলিমা-দেবীর বেনামী স্বামী ছিলেন, তেমনি তোমাকেও থাকতে হবে।' বলতে বলতে অনুলেখার কিছু কিছু প্রাচীন কথা মনে পড়ে যায়, 'তোমার মনে নেই, বিয়ের ছ'মাস না যেতেই তুমি কি আরম্ভ করেছিলে ? ফারাক্কা দেখতে যাবার সময় আমায় মিস্টার অমবস্টের গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে গেলে ট্যাক্সিতে, কি না তাঁর সঙ্গে তুমিও ভি. আই. পি. বাংলোয় উঠবে—লোককে বলবে, উনি আমার বন্ধু।'

মিথ্যে নয়, একটি বর্ণও-না। সেদিন কিন্তু অনুলেখাই মাঝপথে গাড়ি থামাবার নির্দেশ দিয়ে শিলাদিত্য যে ট্যাক্সিতে আসছে সেটির জন্যে অপেক্ষা করেছিল। শিলাদিত্যর ট্যাক্সি এসে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে অনুলেখা তাকে গাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছিল। তারপর দু'জনে অফিসারের গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। অনুলেখা অবশ্য মিস্টার অমবস্টের পাশেই বসেছিল। মধ্যে অনুলেখা, দু'পাশে দু'জন—পতি ও পতিত্বকামী পুরুষ। পুরুষটির অভিসন্ধিগ্রস্ত হাত মাঝে মাঝে অনুলেখার গায়ের নানা জায়গায় ছিটকে ছিটকে আসছিল, অগত্যা হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়ে অনুলেখা বলেছিল, 'আমার মামাতো ভাই অধীরদা আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, না ? আপনারা তো একসঙ্গেই মিলিটারি সার্ভিসে ঢুকেছিলেন ? অধীরদা নেফা অপারেশনের সময় মারা গেলেন, আপনি বুঝি তখন ক্যালকাটা ফোর্টে ? যুদ্ধের পর আই. এ. এস. নমিনেশন পেয়ে আপনি অন্য সার্ভিসে গেলেন, অধীরদাও বেঁচে থাকলে হয়তো বড় চাকরি পেতেন।'

এরপর কর্মতৎপর ব্যক্তিটি নিজের হাত অনুলেখার হাতের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ির একপাশে সরে গিয়ে বসেছিলেন। মুখ গোমড়া করে রাস্তা দেখছিলেন। ফারাক্কা দেখার পর অনুলেখা আর সেখানে রাত্রিবাস করতে চায়নি, তার শরীর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

ঐ এক ক্ষেত্রে যা কিছু যুক্তি শিলাদিত্যর বিপক্ষে হলেও, অনুরূপ ঘটনা বহুতর আছে যেখানে অনুলেখারই উদ্দীপনার প্রকাশ, শিলাদিত্যর তরফের নীরব নিষ্ক্রিয় অসম্মতি। এমনকি ফারাক্কাপর্বের কিছুদিন পর থেকে অনুলেখাই যেন মিস্টার অমবস্টের সাক্ষাতের জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকত। শিলাদিত্যর গলায় পা চাপিয়ে জিভ ছিঁড়ে আনার মতো করে তার সাধ্যাতীত অবস্থার ওপর জুলুম চালিয়ে বাড়িতে পার্টির আয়োজন করত। তাতে শুধু মিস্টার অমবস্টই নয়, অপরাপর উচ্চ মান ও পদের ব্যক্তিরও সমাগম হত। ইদানীং প্রায় তিনবছর, অনুলেখা একটু রেহাই দিয়েছে, ইতিমধ্যে বাড়িতে কোনো উৎসব বসায়নি।

শিলাদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, অনুলেখা বলল, 'যাচ্ছ, যাও— তবে বাড়ির বাইরে যেও না ; একটু পরে একবার ঘরে এস, দরকার আছে।'

ঘুরে দাঁড়াল শিলাদিত্য, মান অপমান ও তিক্ততার সমস্ত রেশ গা-ঝাড়ায় ফেলে দিয়ে জিগ্যেস করল, 'কি কাজ, বল না ?'

অনুলেখা ঠোঁট কামড়াল, ভাববার চেষ্টা করল, তারপর সিদ্ধান্ত নির্ণয় করতে না পেরে বলল, 'পরে বলছি, তুমি একটু ঘুরে এস।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শিলাদিত্য বারান্দার অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ির চৌহদ্দিতে খোলা জায়গা খানিকটা, আগে বাগান ছিল, এখন নামটুকুই। বাগানের ওপারে রাস্তা, ইলেকট্রিক পোস্টএ আলো জ্বলছে একটা— অর্থাৎ আজ আকাশে চাঁদ ওঠার তিথি নয়। শুক্লপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তায় আলো জ্বালায় না —লাইট কমিশনার কমল ঘোষের ব্যয়-সংক্ষেপ পরিকল্পনা।

চব্বিশ

অনেকখানি এগিয়ে গেছে অনুলেখা। ডক্টর সেনশর্মার দেহমনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অস্তিত্বের মূল প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। ডক্টর সেনশর্মাও তা জানেন। তাই আজকাল অনুলেখা লক্ষ্য করে দু'খানি দায়িত্বের ভারে তিনি যেন ন্যুব্জ। স্ত্রীকে ভুলতে পারেন না, অপরপক্ষে অনুলেখাকেও অস্বীকার করতে পারেন না। তবু ভাবনাচিন্তাগুলো দূরে ঠেলে দিয়ে প্রতিটি সন্ধ্যে— একটি তো পরিপূর্ণ রাত—ব্যয়িত হচ্ছিল। কিন্তু সে পথও রুদ্ধপ্রায়। চিঠি এসেছে অর্পণা ফিরছে এবার। মাস তিনেক বাপেরবাড়িতে কাটল, আর কত! ডক্টর সেনশর্মার কথার ভাবে অনুলেখা বুঝতে পেরেছে অর্পণা সন্তানসম্ভবা। খবরটা শুনে সে প্রথমে এক ধরনের জ্বালা অনুভব করেছিল, পরে সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখেছে, তার সঙ্গে অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠতা হবার আগে এই জীবসৃষ্টি—এ হিসেবটুকু তার দাহের ওপর খানিকটা স্বস্তির প্রলেপ। কিন্তু হৃদয়-মনের কথা বাদ দিয়েও অনেক হিসেব-নিকেশ থেকে যায়। অর্পণা ফিরে আসা মানেই অধ্যাপকের সঙ্গে অনুলেখার সম্পর্কচ্ছেদ। আরো কিছুদিন সে বাপেরবাড়ি থাকলে পারত। গর্ভস্থ সম্পদটিকে সমস্তিপুরের মাটিতে অবতরণ করানোর জন্যে অতিরিক্ত যে ক'মাস সময় দরকার, এবং তারপরও কিছুটা বিশ্রাম-কাল। ইতিমধ্যে অনুলেখা নিজের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেবার সময় পেত।

গত সোমবার রাত্তিরের কথা, নৈশসুখে পরিশ্রান্ত দেহটা অর্পণার খাটের বিছানায় এলিয়ে দিয়ে অনুলেখা পড়ে আছে। পাশে অধ্যাপক শয়ান। অনুলেখার মাথাটা তাঁর কাঁধ ও বুকের সন্ধিক্ষেত্রে। কড়িকাঠে টাঙানো সিলিং ফ্যান। হঠাৎ অনুলেখার চোখ পড়ে, পাখার চকচকে বলয়টিতে তাদের দু'জনের ছায়া—ধাতব আয়নায়

প্রতিফলিত সুস্পষ্ট ছবি। অধ্যাপকের দৃষ্টি ঐদিকেই। গম্ভীর। শ্রান্তির নিস্তব্ধতা নয়, মুখে অন্যমনস্ক চিন্তাভাস।

অধ্যাপকের চোখের ওপর নিজের একটা হাত চাপা দিয়ে অনুলেখা বলে, 'ওখানে কি দেখছ, বল তো ?'

'ছবি।' ডক্‌টর সেনশর্মা আলগা সুরে জবাব দেন।

অনুলেখা মাথা নাড়ে, 'উঁহু, দেখতে নেই, চোখ ফিরিয়ে নাও।'

অধ্যাপক জবাব দেন না, যেমন ছিলেন তেমনি নিশ্চুপ।

অনুলেখা বলে, 'আজ সন্ধ্যে থেকে তুমি কি যেন ভাবছ ; আমায় বাড়ি ফিরতে দিলে না, অথচ মনে হচ্ছে, আজ আমাকে চিনতেই চাইছ না!'

ডক্‌টর সেনশর্মা এবার পাশ ফিরে অনুলেখার ঠোঁটদুটি নিজের মুখের মধ্যে টেনে নেন, সুদীর্ঘ চুম্বন করেন একটা, তারপর বলেন, 'আজ তো সারাক্ষণই তোমায় আদর করছি!'

'আমাকে করছ, কি কাকে করছ!' বলতে বলতে অনুলেখা কথা ঘুরিয়ে নিল। 'আজ তুমি এত অন্যমনস্ক, কি হয়েছে বল তো ?' তারপর সে নিজেই প্রশ্নময় জবাব এগিয়ে দেয়, 'তোমার বউএর কথা ভাবছ বোধহয়, তার খবর কি ?'

ঠিকই, এই একটি মাত্র কথা ডক্‌টব সেনশর্মা আজ সকাল থেকে চিন্তা করছেন। অর্পণার চিঠি এসেছে, আগামী সপ্তাহে ফিবে আসবে—তারপরই তো এই প্রণয়-পরিচ্ছেদে যবনিকাপাত। অনুলেখার বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় তিনি আদৌ উদ্বিগ্ন নন। প্রথমদিকে একটু আগ্রহ জেগেছিল, তারপর তাকে আর একতিলও ভাল লাগেনি তাঁর। নিয়মবাঁধা গৎএর মতো উপভোগের কথাটা স্বতন্ত্র, এর সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ভাললাগার বিশেষ সম্বন্ধ নেই—যে বয়েসে থাকে, সে বয়েস তাঁর অতিক্রান্ত। অর্পণাকে বিবাহ করার পর কতজনেব সঙ্গে তিনি সাময়িক মেয়াদে পরিণয়াবদ্ধ হয়েছেন, বিনিময়ে তাদের পাশ করিয়ে দিয়েছেন। তারা অনেকেই আজ বিবাহোত্তর জীবনে স্বাভাবিক সংসারধর্মে লিপ্ত। কেউ বা একটি বৃত্তির মাধ্যমে দিনাতি-

পাত করছে। কিন্তু অনুলেখার অভিপ্রায় অনুমান করা দুষ্কর। বিশেষত তার কার্যকলাপ শিলাদিত্যর পরিপূর্ণ সমর্থনে পুষ্ট। বলতে গেলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনুলেখা তারই হাত ধরে এখানে সান্ধ্য-বিনোদনে এসেছে। তাকে পৌঁছে দিয়ে দোরগোড়া থেকেই শিলাদিত্য ফিরে গেছে। উচিত সময়মাত্রা হিসেব করে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে সে।

কি চায় অনুলেখা, কি চায় শিলাদিত্য—অনুলেখার মতো একটি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীর ভবিষ্যৎ রচনা করে দেবেন তিনি? অনুলেখা তৃপ্তজীবন নয়, শিলাদিত্যর পরিচয় ও আশ্রয়ের আড়াল নিয়ে কোনোমতে এম.এ. পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে? হয়তো বা পাশ করার পর তাঁর অধীনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার নামে আরো কয়েকটি বছর দৈহিক ব্যসনে লিপ্ত থাকবে। শিলাদিত্যও অনুলেখার হাত থেকে অব্যাহতি চায়, তাই সে আজ অসীম ধৈর্য ও লাঞ্ছনা সহের পরীক্ষা দিচ্ছে। এই যদি এদের উদ্দেশ্য ও কামনা হয়, ডক্টর সেনশর্মা সেখানে কল্পতরু। অনুলেখার সেকেণ্ড ক্লাশ অবধারিত, তারপর যদি সে কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা সদ্যজাত মহিলা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকরি চায়, তাও পাবে। কিন্তু এ যেন আভাসিত, অনুলেখার দাবি আরো দূরপ্রসারী, ডক্টর স্মৃতিময় সেনশর্মার প্রকাশ্য জীবনে প্রবেশ-বাসনা। এবং তার জন্যে অর্পণার সঙ্গে উন্মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতেও সে দ্বিধান্বিত নয়। অনুলেখা জানে না, স্মৃতিময় সেনশর্মার পক্ষপাতিত্ব পূর্ণরূপে অর্পণার জন্যেই সংরক্ষিত। কিন্তু সামাজিক অপপ্রচারের আশংকা; অর্পণা তাঁর কিছু ইতিহাস জানে, সে-ই কি এতটা সহ্য করতে পারবে? তাছাড়া তপু বড় হয়ে উঠছে, হয়তো পিতার ইতিহাস পূর্বস্মূরীয় অপকীর্তির মতো তার জীবন ও চরিত্রের নিয়ন্তা হয়ে পড়বে।

অনুলেখা বলল, 'কই, জবাব দিলে না যে?'

ডক্টর সেনশর্মা তাঁর কণ্ঠস্বর সাধ্যমতো নিরুদ্বিগ্ন করেন, 'আজ চিঠি এসেছে, অর্পণা দু'চারদিনের ভেতরই ফিরে আসছে।'

অম্বুলেখা যেন নিজের অজ্ঞাতেই খানিকটা ছিটকে সরে গেল, তারপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। ডক্টর সেনশর্মা তার অবারিত শঙ্খশুভ্র পিঠে নিজের একখানি হাত আলতোভাবে রাখলেন। অধিক কিছু নয়।

অল্পক্ষণ পরে ডক্টর সেনশর্মার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে ঘাড় তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অম্বুলেখা খিলখিল করে হেসে উঠল, 'এতেই ভয় পেয়ে গেছ, তুমি না পুরুষমানুষ! আমি মেয়েছেলে হয়ে কতখানি এগিয়ে এসেছি তা দেখে তোমার সাহস হয় না? বউ বউ, প্রণয়িনী প্রণয়িনী—দু'জনকে দু'ভাবে দেখতে পারলেই হল!'

যে চিন্তায় ডক্টর সেনশর্মা বিব্রত অম্বুলেখা যেন সে স্রোত খানিকটা ঘুরিয়ে দিল, তবু আরো একটু নিঃসন্দেহ হবার জন্যে তিনি বললেন, 'কিন্তু অর্পণা আসার পর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কোথায় হবে?'

'কেন, এখানেই!'

'তা কি হয়?'

'নয় কেন, আমি আমার স্বামীর চোখের ওপর মেলামেশা করছি, তুমিও তোমার স্ত্রীর চোখের সামনে করবে। আমি যদি পারি, তুমি পারবে না কেন? তোমার সামাজিক মানমর্যাদা কি আমার চেয়ে বেশি?'

'অম্বুলেখা!'

অম্বুলেখা সে ডাকের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে বলল, 'তাহলে অর্পণাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বিয়ে কর। মোটের ওপর আমি তোমায় একদিনের জন্যেও ছেড়ে থাকতে পারব না।'

যেন এক আসন্ন ঝঞ্ঝার ভয়ে অম্বুলেখা ডক্টর সেনশর্মার দেহের উপকণ্ঠে এসে আশ্রয় নিল। তিনি তাকে প্রসারিত বাহুর অন্তরালে গ্রহণ করে নীরব প্রেরণায় সাহস যোগাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর নিজের অন্তঃস্তল অম্বুলেখার চেয়ে অধিক দুস্থ। সবিশেষ সন্ত্রস্ত।

তারপর বাকি রাতটা গড়িয়ে যেতে লাগল। দুজনেই নীরব, কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যবিচ্ছিন্ন নয়। নীরবতার অবসরে ডক্টর সেনশর্মা মুক্তির উপায় খুঁজছেন এবং অনুলেখার চিন্তা, অর্পণার প্রত্যাগমের পর কিভাবে এই দেখাসাক্ষাৎ বজায় থাকবে। তৃপ্তির অনুসন্ধান বিঘ্নিত হবে না।

মামার বাড়ির কথা অনুলেখার মনে পড়ে, ওখানে নিজেকে স্থানান্তরিত করলে হয়। মেজমামা তাকে ভালবাসেন। অপদার্থ শিলাদিত্যকে পছন্দ করেন না। বিয়েটা অবশ্য মেজমামার বাড়ি থেকেই হয়েছিল, তাতে অনুলেখার মা-বাবা আসেননি। সম্প্রদান করেছিলেন মেজমামা, বিয়ের দিনও তিনি বলেছিলেন, 'এখনো ভেবে দেখ লেখা, শিলাদিত্য কোনো দিক দিয়েই তোর উপযুক্ত নয়, অশিক্ষিত মূর্খ, তাছাড়া ওর বাপের ক'টা পয়সাই বা আছে? শিলাদিত্যর শুধু বাইরের চেহারাটা, কিন্তু ও রূপ দু'দিন খেতে না পেলেই শুকিয়ে যাবে।' বলতে বলতে তিনি দুঃখের হাসি হেসে-ছিলেন, 'তুই নাকি তোর মামীর কাছে বলেছিস, শিলাদিত্য হচ্ছে ক্রীম অফ্ দ্য সিটি; দু'দিন পরে বুঝতে পারবি ক্রীম নয়, গার্বেজ অফ দ্য সিটি—জঞ্জাল।' এখনো মেজমামা বলেন, 'ও পাপটাকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে দে, তোর আমি আবার বিয়ে দেব।'

অনুলেখার মামাতো ভাই অধীরদা, মেজমামার একমাত্র সন্তান, সে যুদ্ধে মারা গেলে মেজমামাই নীরা বৌদির বিয়ে দিয়েছেন। 'কেন তুমি বিয়ে করবে না নীরা, তোমার একটি সন্তান বলতেও তো নেই—আমার এ সংসারে তুমি কিসের মোহে আটকে থাকবে?' নীরা বৌদির নতুন স্বামী মেজমামার বন্ধুপুত্র, উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ অফিসার। নীরা বৌদির দুটি মেয়ে হয়েছে। তাদের নিয়ে সে মাঝে মাঝে মেজমামার বাড়ি আসে, দু'চার দিন থেকে যায়। নীরা বৌদি তো সুখী হয়েছে, খুবই সুখী। কলেজে পড়তে নীরা বৌদি একটি ছেলেকে ভালবাসত, তার সঙ্গে বিয়েরও ঠিক হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের ক'দিন আগে ছেলেটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কারণ নাকি,

তার ভাবী-পত্নীর স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। নীরা বৌদি যতদিন অধীরদার স্ত্রী হয়ে ছিল, তাকে দেখে অনুলেখার একবারও মনে হয়নি, তার চরিত্রে একটুও ভেজাল আছে। মেজমামা বলতেন, 'শুনেছি বৌমার স্বভাবচরিত্র নাকি ভাল ছিল না, আমার কিন্তু মনে হয় এমন স্বভাবসুন্দর পুত্রবধূ মানুষ বহুপুণ্যে লাভ করে।'

শাশ্বত নিষ্ঠা বলতে মেজমামার কাছে কিছু নেই। এই মুহূর্তের সত্যকে তিনি চিরদিনের সত্যরূপে স্বীকার করেন না। সুখান্বেষণেই তিনি বিশ্বাসী। একদিনের সুখস্মৃতি নিয়ে চিরকাল দুঃখের জাবর কাটাকে শ্রদ্ধেয় বৃত্তি মনে করেন না। অনুলেখা যদি তাঁকে গিয়ে বলে, 'আমি আর শিলাদিত্যকে পছন্দ করি না; প্রফেসরকে ভালবাসি, তাকেই চাই।' মেজমামা সে কথায় সানন্দ-সম্মতির শিলমোহর দিয়ে দেবেন।

সারারাত জেগে, মাঝে মাঝে পরস্পরের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেবার জন্যেই বোধহয় একটু আদর বা একটা চুম্বনের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে গেল। ডক্টর সেনশর্মার বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে অনুলেখা উঠে পড়ল।

'আমি যাই এবার?'

'একা?' ডক্টর সেনশর্মাও বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

'উঁহু' অনুলেখা তার বেশবাস ও মাথার চুল গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তুমি আমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে চল।'

'হ্যাঁ, চল।' ডক্টর সেনশর্মা মুখে বললেন বটে, কিন্তু চিন্তা করতে লাগলেন, রাস্তায় হঠাৎ কারো চোখে পড়ে যাবেন না তো! তারপর জানলার সামান্য ফাঁক দিয়ে বাইরে দৃষ্টি গলিয়ে দেখলেন, ভোর হয়েছে বটে, তবে আঁধারবিলুপ্ত সকাল নয়। তিনি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলেন, অর্থাৎ গায়ে সিল্কের ড্রেসিং গাউন, পকেটে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই, পায়ে বাথরুম স্লিপার।

অনুলেখার পাশে পাশে চলেছেন ডক্টর সেনশর্মা। অনুলেখা কখনো তাঁর কাছে ঘেঁষে আসছে, কখনো বা একটু দূরে। রাস্তা

নির্জন। সারা পথ জুড়ে মাত্র এই দু'জন পথচারী, কিন্তু একটিও বাক্যালাপ নেই।

নিজের ভীরুচিত্তের গ্লানি কাটাবার জন্যে ডক্টর সেনশর্মা বললেন, 'এই, একটা চুমু দাও?'

অনুলেখা দাঁড়িয়ে পড়ল, চকিত চোখে শূন্য রাজপথের দু'প্রান্ত দেখে নিয়ে ডক্টর সেনশর্মার বুকের ভেতর চলে এসে বলল, 'উঁহু, তুমি দাও; একটা নয়, একশ'টা।'

ডক্টর সেনশর্মা ও অনুলেখার একটি রাত্রি এবং পরদিন প্রত্যূষ-মুহূর্ত পর্যন্ত জীবননিষ্ঠ দম্পতির মতো অতিবাহিত হল। অনুলেখাকে প্রায় বাড়ি অবদি পৌঁছে দিয়ে ডক্টর সেনশর্মা বিদায় নিলেন। অনুলেখাই বলল, 'এবার তুমি যাও, আমার পতিদেবতা হয়তো রাত জেগে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এই হংসমিথুন জুটি একসঙ্গে দেখলে মনোবেদনায় হার্টফেল করবেন।'

অনুলেখার অনুমান শিলাদিত্য সারারাত ঘুমোতে পারেনি, জেগেই আছে এখন পর্যন্ত। হয়তো গেটের কাছে বা ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্বিষ সাপের মতো ফোঁসফাঁস করছে। নিষ্ফল আক্রোশে নিজেরই চেতনাকে দংশন করছে সে। কিন্তু আত্মপীড়নে কি লাভ! অনুলেখা তো চিরদিনের মতো তার কাছ থেকে সরে গেছে, তা বুঝতে পেরেও অমন হুতাশ প্রত্যাশা কেন? কেন রাত্রি জাগরণ, কেন আত্মনিগ্রহ? সত্যিসত্যিই অনুলেখার বুকের ভেতরটা শিলাদিত্যর জন্যে সহানুভূতি ও সমবেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

সন্তর্পণে গেটের কাছে এসে দাঁড়ানোমাত্রই অনুলেখার প্রথম দৃষ্টি দু'তলার বারান্দার দিকে চলে যায়। অবিচল মনোভাব নিয়ে সারারাত্রি ধরে রচিত জীবন সম্বন্ধে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি একটু কেঁপে ওঠে যেন, চোখদুটিও সেইসঙ্গে বিব্রত হয়ে পড়ে। অথচ কিসের আকর্ষণে তা যেন শিলাদিত্যর দুটি চোখের সঙ্গে গিয়ে আটকে যায়। শিলাদিত্য নিজে থেকে অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত সে মুক্তি পায় না। ফটক ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে না।

একঘণ্টা পার হয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত অম্বুলেখার সাড়াশব্দ নেই। ঘরের বাইরে উত্তরমুখী বারান্দায় শিলাদিত্য রেলিং হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গা অদূরেই, যদিও এখান থেকে দেখা যায় না, কিন্তু একটু ক্ষীণ ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজ আসছে।

এরপর কি হতে পারে সে সম্বন্ধে শিলাদিত্যের কোনো ধারণা নেই। তাছাড়া আজকাল সে দিনগত পাপক্ষয়ের হিসেবটাই করে বেশি, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সাহস হয় না। ভবিষ্যৎ মানেই তো বৃহত্তর অধপঃতনে চিহ্নিত আরো কয়েকটা বছর, জীবন ও মর্যাদা রক্ষার অসার্থক প্রয়াস। এ পথের অনেকখানি দেখা হয়ে গেছে, বিবাহিতা স্ত্রীর হাত ধরে তাকে অভিসারে পৌঁছে দিয়ে এসেও দেখেছে, যদি তার নিষ্ঠুরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যদি অম্বুলেখা তার চারিত্রিক মর্যাদা বিলিয়ে দেওয়ার খুশিতে তথাকথিত স্বামীর মেকি মানটুকু বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু তা হবার নয়, শিলাদিত্যের সর্বস্ব ঢালু জায়গার গড়ানে পড়ে গেছে, একেবারে অন্তিমে না পৌঁছনো পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই।

অতএব আর ইতস্তত না করে শিলাদিত্য এবার শুধু নিজের দিকেই তাকাবে। অম্বুলেখাকে আস্কারা দেওয়া দূরের কথা, তাকে আমলই দেবে না সে। কিন্তু পরিণতি? অম্বুলেখা রাস্তায় নেমে গিয়ে হইচই করবে—আইন-আদালত কোর্ট-কাছারি! তাও ভাল। অম্বুলেখার বিকৃত চেতনার সদাজাগ্রত আঁচের সংস্পর্শে থাকার চেয়ে তাকে সামগ্রিকভাবে জ্বলে ওঠার সুযোগ দেওয়া ঢের বেশি স্বস্তিময়। এই আগুনের ভস্মসার পরিণতি থেকে অম্বুলেখা নিজেও রেহাই পাবে না।

অম্বুলেখার সাড়াশব্দ নেই, কিন্তু শিলাদিত্য কান পেতে শুনতে পায় ঘরের মধ্যে যেন একটা খুটখাট শব্দ চলছে। ভ্রূ কুঁচকে সে ভাববার চেষ্টা করে, কি করছে অম্বুলেখা, ঘরে আগুন লাগাবার আয়োজন নাকি!

মস্তিষ্ক এবং মুখ, এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবধান রচনা

করে শিলাদিত্য ঘরের দিকে পা বাড়াল। একান্ত অভ্যাসবশেই সাড়া দিল একবার। সাড়া না দিয়ে আসা অম্লুলেখা পছন্দ করে না। স্বামী বা যে কেউ হোক্, সবার পক্ষেই এ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ অসভ্যতা, তাই সে নিজেও সাড়া দিয়ে ঢোকে।

শিলাদিত্য ডাকল, 'লেখা, আসি আমি?'

'হুঁ।'

ঘরে এল শিলাদিত্য, মুখে একপ্রস্ত হাসি টেনে নিয়েই এসেছিল, অম্লুলেখাকে দেখিয়ে সেটি আরো বিস্তৃত করল, 'ব্যাপার কি, বাক্স-প্যাঁটরা গোছানো হচ্ছে, কোথাও যাবে নাকি?'

খোলা সুটকেশের ডালাটা ঝপ করে ফেলে দিয়ে অম্লুলেখা ঘাড় ফেরাল, 'দেখে তোমার কি মনে হয়?'

অম্লুলেখাকে উত্তপ্ত করে তোলার জন্যেই শিলাদিত্য স্মিতব্যঙ্গময় জবাব দেয়, 'কি আবার, তোমার খেয়াল একটা!'

এ ধরনের উত্তর অম্লুলেখা আশা করেনি, সে ভ্রূ কুঁচকোয়, 'যদি বলি আমি চলে যাচ্ছি?'

অধিকতর প্রকাশ্য হাসি হাসতে গিয়ে হাঁই তুলল শিলাদিত্য, 'এত রাত্তিরে হঠাৎ যাবেই বা কোথায়? প্রফেসরের বাড়ি, কিন্তু সেখান যাবার জন্যে তো আর বাক্স গোছাবার দরকার হয় না। সাধারণ দেখাসাক্ষাৎ, তাছাড়া তার ওখানে গিয়ে তো তুমি থাকতে পার না? আর যাই করুক সে তোমায় চিরদিনের মতো রাখতে পারে না, তার স্ত্রী-পুত্র আছে। পুরুষ ভ্রমরেরও বাসা থাকে একটা, নিজের সংসার পরিবার থাকে।'

কি হল শিলাদিত্যর, অম্লুলেখার ভেতরটা যেমন বিস্মিত, তেমনিই বিদ্যুৎস্পর্শিত। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখে সে, এবং এই সংযমটুকু হারিয়ে ফেলবার আগেই বলে, 'না, সেখানে নয়; আমি মেজমামার বাড়ি যাচ্ছি, তুমি একটা রিক্সা আনিয়ে দাও।'

শিলাদিত্য ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করে, 'সঙ্গে কি যাবে, তোমার মালপত্তর?'

'আমার সবই।'

'তাহলে তো দু-তিনটে রিক্সা লাগবে।' বলতে শিলাদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অম্বুলেখা ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করে, 'না, রিক্সা আনতে হবে না। এখানে থেকেই আমি তোমায় সমূলে উৎখাৎ করব।'

তবু শিলাদিত্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল, অম্বুলেখার বাড়ি-ফাটানো চিৎকার তার কানে ঢোকেনি যেন!

পঁচিশ

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল, 'নমস্কার।'

দেখামাত্র তাকে চিনতে পেরেছিল শিলাদিত্য, বছর কয়েক আগে নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুলেখার কাছে আসত প্রীতম কাওর। কেমন আছেন, মিসেস দত্তা আছেন বাড়িতে, এই ধরনের ছোটখাট প্রশ্নোত্তর বিনিময় হয়েছে তার সঙ্গে। প্রীতম কাওরকে সাহায্য করবার জন্যে অনুলেখা বাড়িতে একটা ভোজের আসর করেছিল, নিজেকে দেখাবার লোভই তার ছিল বেশি, কিন্তু প্রীতমের কাজটুকুও সে সযত্ন প্রয়াসে করে দিয়েছিল। তখনকার দিনগুলো তবু ছিল একরকম। শিলাদিত্যর পিতা অমূল্যভূষণের পরলোক-প্রাপ্তির সেটা তৃতীয় বছর। তাঁর ব্যাংকগচ্ছিত টাকার অনেকখানিই শিলাদিত্যর হাতে, উপরন্তু অনুলেখা সম্বন্ধে সে তখন কিছুটা মোহমুক্ত হয়ে এলেও তা একেবারে ঘুচে যায়নি।. তাছাড়া উঁচু সমাজে জায়গা করে নেওয়ার বাসনা থেকে সে নিজে তখনো মুক্ত নয়। বাবার মৃত্যুর শোক তাকে যতখানি স্পর্শ করেছিল, ততখানি কাউকে নয়, কারণ তিনি ছিলেন সর্বসহায়। কিন্তু সে মৃত্যুতেও একটা উঁচুদরের সান্ত্বনা ছিল। জওহরলাল ও অমূল্যভূষণের মৃত্যুতিথি একই, সেদিক দিয়ে তাঁর মৃত্যু এক জাতীয়-ইতিহাস বিশেষ!

প্রীতম কাওরের সঙ্গে পূর্বপরিচয় ছিল বলেই শিলাদিত্য তার বিব্রত চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু একবার ঘরে ঢুকে পড়ার পর বেরিয়ে যেতেও পারছিল না সে। অগত্যা প্রীতমের নমস্কারের উত্তর দিল, 'নমস্কার।' তারপর মুখে অমায়িক হাসি টেনে এনে জিগ্যেস করল, 'আপনি?'

স্মিত-মধুর হাসল প্রীতম কাওর, সুগন্ধিমাখা ছোট্ট রুমালটা গালে বুলিয়ে নিল, 'আপনি তো মিসেস দত্তার হাজব্যাণ্ড? কতদিন

আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, কিন্তু দেখছেন তো, আমি আপনাদের ভুলিনি।'

খানিকটা প্রীতম কাওরের দিকে আর খানিকটা তার মাথা টপকে পেছনের জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শিলাদিত্য বলল, 'আমিও আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।'

শিলাদিত্যকে দেখে প্রীতম কাওর উঠে দাঁড়িয়েছিল, শিলাদিত্য তাকে বসবার অনুরোধ জানাল, 'বসুন না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে দুটি চেয়ারে বসার পর প্রীতম কাওর জিগ্যেস করে, 'মিসেস দত্তা কেমন আছেন?'

শিলাদিত্য বলতে পারল না, প্রায় তিনমাস যাবৎ সে মিসেস দত্তার খবর রাখে না। এখানে, এই শহরে, তার মামার বাড়িতে আছে যদিও, সে বাড়ি শিলাদিত্যর বাড়ির এক-আধ মাইলের মধ্যেই, তবু সে জানে না মিসেস দত্তা মিসেস দত্তা হয়েই আছে, না মিসেস সেনশর্মা রূপে পরিচিত হবার হীন অথবা মহান উদ্দেশ্যে নিজের পূর্বপদবীতে ফিরে গেছে।

অনুলেখা বাড়ি থেকে চলে যাবার পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই শিলাদিত্য শুনেছিল, তার মেজমামা নাকি ভাগ্নীকে বিবাহবিচ্ছেদ মোকর্দমা করার সদুপদেশ দিয়েছেন, ইতিমধ্যে সে প্রস্তাব কতদূর কার্যকরী হয়েছে তা জানে না। তাই প্রীতম কাওরকে সে একটা পাশ-কাটানো জবাব দেয়, 'ভাল—ভালই!'

হাতের ব্যাগ খোলে প্রীতম কাওর, একটা ছোট আয়না বার করে মুখ দেখে সেটি আবার ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে বলে, 'মিসেস দত্তার কাছে আমি ঋণী; কতবার ভেবেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, কিন্তু হয়ে ওঠেনি।'

শিলাদিত্য তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়, 'না, না, ঋণ কিসের, সামান্য একটু সাহায্য করেছিল, তার জন্যে তো আপনি তাকে অনেক কৃতজ্ঞতা-ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, আবার বিশেষ করে-দেখা করার কি আছে?'

প্রীতম কাওর শিলাদিত্যর ভীতিকেন্দ্রটা দেখতে পায় না। ভাবে শিলাদিত্য চায় না সে তাদের বাড়ি আসে, সম্ভবত তার কারাকাহিনী সর্বত্র প্রচারিত হয়ে পড়েছে তাই। এক নিমেষের জন্যে তার মুখটা অপ্রতিভ হয়ে যায়, তারপর জোর করে সে দুর্বলতা অপসারিত করে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করতে থাকে, ও মনে মনে চিন্তা করে একবার অন্তত মিসেস দত্তার কাছে যাবেই সে। দেখে আসবে, জেলে না গিয়ে তারা কত উঁচুতে আছে, আর কারাবাসের পর সে নিজে কতখানি নিচে নেমে গেছে।

ছাদের সিলিংএর দিকে তাকায় প্রীতম কাওর, পাখা বন্ধ আছে, মাঘের শেষ হয়নি এখনো। কিন্তু গরম বোধ হচ্ছে একটু। শিলাদিত্যর সুগৌর কপালটা তো ঘামে চক্‌চক্‌ করছে!

প্রীতম কাওর উঠে গিয়ে ফ্যানের সুইচ টিপে দেয়, সেখানে দাঁড়িয়েই একটু হেসে বলে, 'বেয়ারাটি বেশ, সরকারী অফিসের লোক মাত্রেই এইরকম—যে আসছে তাকেই সাহেবের ঘরে ঢুকে গিয়ে বসতে বলছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে একটু খোঁজখবর নেবে তা নয়। এদিক থেকে প্রাইভেট কোম্পানীর ব্যবহার কত ভাল! সরকারী অফিসের প্রত্যেকের উচিত ডিসিপ্লিন জিনিষটা তাদের কাছ থেকে শিখে আসা।' বলতে বলতে প্রীতম কাওরের পূর্ব প্রসঙ্গের জিদ আবার চাড়া দিয়ে ওঠে, তাই ফিরে এসে নিজের চেয়ারটিতে বসে সে জের টানে, 'না, কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের জন্যে না হলেও, আমার উচিত একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসা। কখন গেলে তাঁর অসুবিধে সৃষ্টি করা হয় না?'

হাসবে কী গম্ভীর গলায় জবাব দেবে স্থির করতে না পেরে শিলাদিত্য প্রথমটা একটু হাসে, তারপর গাম্ভীর্য ধারণ করে, 'অসুবিধের কি? তবে রাত বারোটার পর যখন আপনার খুশি—আজকাল লেখাপড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত কিনা।'

'পড়ছেন বুঝি উনি?'

'এম. এ.।' শিলাদিত্য সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটা পিন্ পিন্ করে ঘুরছে শুধু। মাঝে মাঝে বিশ্রী শব্দ বেরুচ্ছে একটা, যন্ত্রের তৈলাভাব প্রচার। দেয়ালের গায়ে ঝুল, গা-ভর্তি ধুলো রংচটা আলমারি, জানলার পাখিভাঙা খড়খড়ি, মসীময় সেক্রেটারিয়েট টেবিল—সবদিক দিয়ে উঁচুদরের সরকারী মহাকর্মীর আদর্শ একান্ত-কক্ষ।

প্রীতম কাওর মাঝে মাঝে আড়চোখে শিলাদিত্যর দিকে তাকায়, তার প্রতিযোগী হয়ে এল নাকি লোকটা—সরাসরি জিগ্যেস করাও যায় না। কিন্তু আবির্ভাবের উদ্দেশ্য জানতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিভাবে কথার আবতারণা করবে সেই চিন্তাই নানাভাবে ভাঁজে সে।

প্রায় একই কথা ভাবছে শিলাদিত্য। প্রীতম কাওর ব্যবসা-ট্যবসা করে, এখানেও হয়তো সেই উদ্দেশ্যে এসেছে। কিন্তু প্রীতমকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হচ্ছে না, কারণ এ পথে তার নিজের পদার্পণই হয়নি। কিছুটা কাজের আশায় এসেছে বটে, কিন্তু সিদ্ধি না হলে বিশেষ দুঃখিত হবে, তা নয়। তবে প্রীতমের সামনে সে এস. ঈ-র কাছে আবেদন ব্যক্ত করতে চায় না, আপত্তি এইটুকুই। শিলাদিত্য স্থির করে. প্রীতম কাওর তার কাজ সেরে চলে যাবার পর সে নিজের বক্তব্য পেশ করবে। সেজকাকা জীবনভূষণ যা বলতে বলেছেন এস. ঈ-কে তাই জানাবে।

অনুলেখা মামার বাড়ি চলে যাওয়ার ঠিক দু'মাস পাঁচদিনের মাথায় গুজবটা প্রচারিত হল, জীবনভূষণ শিলাদিত্যকে ডেকে পাঠালেন, 'শুনেছিস তো, লেখা কি বলছে?'

শিলাদিত্য জবাব দিল না, ঘাড় নাড়ল, শুনেছে।

বুড়ো আঙুলের মত মোটা নিমদাঁতন চিবনোতে বিরতি দিয়ে জীবনভূষণ বললেন, 'তুই গিয়ে ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ফিরিয়ে আন, তারপর ঘরে বন্ধ করে চাব্‌কে আধমরা করে দে।' অতঃপর তিনি সুর পালটে বলেন, 'তোর যে কোন্‌খানটা পুরুষ তা তো আমি বুঝি না। পয়সা না থাকলে কি এ যুগের বউ বশ হয়? তারা অক্ষম স্বামীর সেবা করে, তাকে পালন করে, কিন্তু স্বামী অপদার্থ হলে তার মুখে লাথি মেরে চলে যায়। এদিক দিয়ে লেখার দোষ নেই। তোর মতন স্বামীর মুখে লাথি না মেরে মুখ বুজে মামার বাড়ি চলে গেছে, সেখানে গিয়ে বলছে ডাইভোর্স করব—নেহাৎ ভদ্র আর ভাল মেয়ে বলেই বলছে।'

শিলাদিত্য সেজকাকার কোনো মতেরই জবাব দেয় না, সমর্থন করে না, প্রতিবাদও নয়।

জীবনভূষণ আবার বলেন, 'লেখা বেচারি কি এমন চায়—বড় ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, একটু ভালভাবে থাকা, একটু মান-খাতির, স্বামী বলে যে মর্কটের গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে, তার একটু গৌরব। তাছাড়া ভবিষ্যতে তুই করবি কি, বেগ-বরো-ষ্টিল?'

ভর্ৎসনার পালা চুকলে জীবনভূষণ বললেন, 'নীলকণ্ঠ সেনাপতি এখানে সুপারইনটেনডিং এনজিনিয়ার হয়ে বদলি হয়ে এসেছে। দাদার আমলে এখানেই অ্যাসিসটেণ্ট সিভিল এনজিনিয়ার ছিল, আমাদের বাড়িতে তো প্রায়ই আসত, তোর মনে আছে?'

এই একটি কথার জবাব দিল শিলাদিত্য, 'হ্যাঁ।'

'কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছিল, দাদা মারা গেছে শুনে দুঃখ করল, ছেলেরা কে কি করছে জানতে চাইল। তুই নাকি একবার ওকে মাতাল মনে করে পকেট থেকে সিগারেট চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলি, সেকথা তার এখনো মনে আছে। জিগ্যেস করল, কি করছে আদিত্য আজকাল, কোথাও মেডিক্যাল অফিসার বোধহয়—আপনার দাদার তো ইচ্ছে ছিল, ওকে ডাক্তার

করেন।' বলতে বলতে জীবনভূষণ চটে উঠলেন, বুড়ো আঙুলের সমান মোটা নিমদাঁতন দাঁতের সাহায্যে দু'চির করে আধখানা দিয়ে জিভ ছুলে দুটি টুকরোই ফটক টপকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নীলকণ্ঠকে আমি কি জবাব দেব, কি করে বলব আদিত্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত বউএর শাড়ি কাচত, এখন বউ পালিয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ বেকার।'

কখনো নরম কখনো গরম, জীবনভূষণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রায় একতরফা কথা বলে গেলেন, তারপর উপদেশ দিলেন শিলাদিত্য গিয়ে ধরুক নীলকণ্ঠকে, তার কাছ থেকে ছোটখাট ঠিকেদারি আদায় করুক। পুঁজি বলতে তো তার মাকাল ফলের মতো চেহারাটাই কেবল, জীবনভূষণের নিজস্ব রেস্ত যা আছে তা সামান্যই, তবু খাল-বিল ছেঁকে হাজার পাঁচ-সাত তিনি বার করতে পারবেন, সেটা দেবেন শিলাদিত্যকে—একমাত্র সর্ত অম্লুলেখাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তারপর ভালবেসে হোক, চাবুক মেরে হোক, বশ করতে হবে।

কিন্তু শিলাদিত্যর চিন্তা স্বতন্ত্র, ঠিকেদারি অর্থাৎ চুরিজুচ্চুরি কুলিমজুর ছোটলোক হরতাল মালিক-নিগ্রহ, ঝড়-জল-রোদ, দিন-দুপুর-রাত্রি।

শত চিন্তায় পর্যুদস্ত শিলাদিত্যকে ধমক দিয়ে জীবনভূষণ জাগিয়ে তোলেন, 'কি ভাবছিস, কি?'

শিলাদিত্য ঘাড় বাঁকিয়ে মেরুদণ্ডের প্রথম গ্রন্থির কাছে চুলকোতে থাকে, 'কিছু না তো।'

'তাহলে যা, গিয়ে নীলকণ্ঠ সেনাপতির সঙ্গে দেখা কর।'

'তুমি একটা চিঠি লিখে দাও।'

'হোয়াট, চিঠি—নিজের কাজ নিজে করতে পার না? লেখার সঙ্গে পিরীত করতে যাবার সময় কি আমাদের চিঠি নিয়ে

গিয়েছিলে? তখন প্রেমের গরজ ছিল, এখন বুঝি পেটের গরজ নেই?'

দরজার বাইরে থেকে বেয়ারা হঠাৎ পর্দাটা একপাশে টেনে ধরল, তা দেখে আত্মস্থ প্রীতম কাওর ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। তার দেখাদেখি শিলাদিত্য। নীলকণ্ঠ সেনাপতি ঘরে ঢুকলেন, পশ্চাতে বেয়ারা। মাথার টুপি খুলে বেয়ায়ার হাতে দিয়ে নিজের চেয়ারটির দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। গোলগাল সুপুষ্ট চেহারা, মুখে উদার হাসির প্রলেপ।

প্রীতম কাওর সশ্রদ্ধ স্মিতমুখে বলল, 'নমস্কার স্যার।'

'নমস্কার।' নীলকণ্ঠ সেনাপতি জিজ্ঞাসু চোখে শিলাদিত্যর দিকে তাকিয়ে প্রীতমের নমস্কারের জবাব দিলেন।

শিলাদিত্য বলল, 'নমস্কার।'

নীলকণ্ঠ সেনাপতি শিলাদিত্যর নমস্কারের উত্তর দিলেন, তখনো তাঁর দৃষ্টি থেকে জিজ্ঞাসা কাটেনি, আশা করে আছেন কিছু বলবে সে, নিজের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে। কিন্তু শিলাদিত্য কিছুই বলল না, নীলকণ্ঠ সেনাপতির দিকে তাকিয়ে ছিল সে—আগেকার চেহারা মনে পড়ে, ছিপছিপে সুদর্শন যুবক। গায়ের রং এখনকার তুলনায় উজ্জ্বল, কিন্তু একটু রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ। এখন সে পোড়া ভাবটা নেই-ই প্রায়, তবু আগেকার তুলনায় কালো। স্থূল দেহ তো বটেই। মাথা ভর্তি কালো কোঁকড়ানো চুলের জায়গা নিয়েছে কিছু কিছু পাটের শোঁয়া—একসঙ্গে গুছিয়ে একগাছি সরু দড়ি পাকানো যায় বড় জোর।

শিলাদিত্য কিছু বলছে না দেখে প্রীতম কাওর তাকে পরিচিত করবার জন্যে এগিয়ে আসে, যতটুকু জানে ততটুকুই বলে সে, 'ইনি মিস্টার দত্তা, প্রিন্স রোডের মোড়ে বড় বাড়িটা—'

এবার শিলাদিত্য খেই খুঁজে পায়, বাকি পরিচয়টুকু নিজের মুখে ব্যক্ত করতে যায় সে, কিন্তু তৎপূর্বেই নীলকণ্ঠ সেনাপতি হো-হো

করে বলে ওঠেন, 'ও হো-হো, বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি অমূল্যভূষণ দত্তর ছেলে শিলাদিত্য, না?'

শিলাদিত্য ঘাড় নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'সেদিন তোমার কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তোমাদের খবর জিগ্যেস করেছিলুম—আমি তো ভেবেছিলুম তুমি ডাক্তার হয়েছ। তা কি করছ আজকাল? আরে, দাঁড়িয়ে কেন, বোস বোস। এই বেয়ারা, বেয়ারা!'

আন্তরিক সুরে নীলকণ্ঠ সেনাপতি কথা বলছিলেন, শিলাদিত্যর ভাল লাগছিল, এবং এদের সম্পর্ক দেখে প্রীতম কাওর খানিকটা হতাশ হয়ে পড়ছিল।

বেয়ারা আদেশ নিয়ে গেল, 'তিনকাপ চা, তাড়াতাড়ি।'

শিলাদিত্যর প্রয়োজন সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি স্থগিত রেখে নীলকণ্ঠ সেনাপতি প্রীতমের দিকে তাকান, 'তারপর—?'

প্রীতম কাওর শিলাদিত্যর দিকে তাকায়, দত্তা বিদায় না হওয়া পর্যন্ত নিজের বক্তব্য পেশ করবে না বলেই ভাবে সে, তাই নীলকণ্ঠ সেনাপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে, 'আগে এঁর কাজ হয়ে যাক, তারপর বলছি।'

শিলাদিত্য কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সেদিকে কান না দিয়ে নীলকণ্ঠ সেনাপতি বলেন, আদিত্যর কোনো কাজ নেই, কাকার কাছে খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আদিত্যর বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, সে আমলের একজন বড় কনট্রাকটর, নিজেও এনজিনিয়ার, ফরেন রিটার্নড্। আপনার কি দরকার বলুন, আদিত্যকে ভয় পাবার কিছু নেই, আমাদের কথাবার্তা নিয়ে ও মাথা ঘামাবে না।'

অগত্যা প্রীতম কাওর নিজের অনুযোগ পেশ করে, 'নেহেরু পার্কের ওয়াটার ট্যাংকের জন্যে আমার কোটেশনই সবচেয়ে কম ছিল, তবু আমার টেন্ডার গ্রাহ্য হল না কেন? আরো দু'তিনটি টেন্ডারে আমি এই ব্যাপারই দেখছি। আপনারা কি আমার

কাজে অসন্তুষ্ট? কিছু না-হলেও অন্তত দু'লাখ টাকার কাজ আমি ইতিমধ্যে করেছি, কোনোটাতেই আজ পর্যন্ত দোষ বেরোয়নি।'

নীলকণ্ঠ সেনাপতি জবাব দিতে যান, তার আগে টেবিলের ওপর খুঁজে দেখেন তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এসেছে কিনা, তারপর বলেন, 'তা নয়, মিস কাওর—আপনার পেছনে শত্রু লেগেছে। আপনার ঐ ব্যাপারটা নিয়ে ওপর মহলে নালিশ হয়েছে, এমন মানুষকে সরকারী কাজ দেওয়া হয় কেন?'

প্রীতম কাওর যেন চিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'আইনে বাধা আছে? কোথায় কোন্ আইন, দেখান তো?'

নীলকণ্ঠ সেনাপতি হাসলেন, 'আপনি দেখছি খুব রেগে আছেন। দেখুন, কোথায় কি আইন আছে তা আমি জানি না, আপনাকে কাজ দেওয়া সম্বন্ধে আমার নিজেরও কোনো আপত্তি নেই।'

প্রীতম কাওর দৃঢ়স্বরে বলল, 'বেশ, তাহলে আমি মিনিস্ট্রি পর্যন্ত মুভ করব, আপনাকে দরখাস্ত দেব—আপনি রেকমেণ্ড করবেন। করবেন না-ই বা কেন, এ রাইট কজ্?'

প্রীতম কাওরের কথা শুনে নীলকণ্ঠ সেনাপতি গুম্ হয় গেলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রীতমের দোষ নেই। আগে কি করেছে না-করেছে বলা যায় না, তবে তার ঠিকেদারি কাজ অনেকের চেয়ে সন্তোষজনক। ঐ জেলখানার ছাপ নিয়েই যত গণ্ডগোল। অন্যান্য ঠিকেদাররা তাকে পথ থেকে সরানোর জন্যে ওপর মহলে দরখাস্ত ছেড়ে চলেছে, প্রীতমকে কাজ দেওয়ার অর্থ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া। প্রীতম যদি এ নিয়ে মন্ত্রীমহলে আলোড়ন তোলে এবং সে আপিল তাঁর মাধ্যমে পেশ করতে চায়, তাহলে নৈতিক কারণে তিনি সুপারিশ করতে বাধ্য। কিন্তু নৈতিক কারণ এক জিনিষ, চাকরি বজায় রাখা আর এক। প্রশ্ন উঠবে কি তাঁর স্বার্থ, প্রীতম কাওরের সঙ্গে কি কোনো বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতা আছে?

নীলকণ্ঠ সেনাপতি চিন্তিত মুখে বলেন, 'আপনার কথার উত্তর একটু ভেবেচিন্তে দিচ্ছি মিস কাওর, অপেক্ষা করুন।…তারপর আদিত্য, তোমার কি খবর, কি করছ আজকাল ?'

চেয়ারে বসেই শিলাদিত্য ঘাড় ঝাঁকিয়ে মেরুদণ্ডের প্রথম গ্রন্থি চুলকে নেয় একবার, জবাব দেয়, 'কিছুই তেমন করছি না, ভাবছি ঠিকেদারি করব।'

সামনে একটা ক্র্যাকার ফাটলেও নীলকণ্ঠ সেনাপতি অতটা চমকাতেন না, যতটা তিনি শিলাদিত্যর কথা শুনে চমকে উঠলেন, 'সে কি হে, তুমি ঠিকেদারি করবে? শুনেছি তোমাকে তোমার মা হলুদগুঁড়ো মিশিয়ে দুধের সর মাখাতেন, পাছে গায়ের রং পুড়ে যায় সেই ভয়ে রোদে বেরুতে দিতেন না। না হে না, তোমার কনস্‌টিচ্যুশন্ খেটে খাবার মতন নয়; অমূল্যবাবু তো গুছিয়ে গাছিয়ে গিয়ে থাকবেন, সেগুলো দেখাশোনা করে, নেড়েচেড়ে চালাও। ছোটলোকদের সাম্রাজ্যে এসে তোমার আম যাবে, বস্তাটাও যাবে।'

নীলকণ্ঠ সেনাপতির অসম্মতিতে শিলাদিত্য বোধহয় খুশিই হত, কিন্তু তিনি যেভাবে তাঁর অপদার্থতা ঘোষণা করলেন, বিশেষত প্রীতম কাওরের সমক্ষে, তার জন্যে সে খানিকটা আহত উল্লাস নিয়ে বলে উঠল, 'কেন পারব না, সবাই যা পারে, তা আমি পারব না? সেজকাকা আমায় এইজন্যেই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'ওঃ, তাই নাকি!' নীলকণ্ঠ সেনাপতি চুপ করে গেলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রীতম কাওর বলল, 'তাহলে স্যার—'

নীলকণ্ঠ সেনাপতি তাকে মধ্যপথেই থামিয়ে দিলেন, 'আপনার কথাই ভাবছিলুম, দেখুন ঝগড়া করলে ব্যবসা চলে না। তাছাড়া আপনার ম্যাটার রেকমেণ্ড করতে গিয়ে আমিও বিপদে পড়তে পারি। প্রথম প্রশ্ন, আমার কি দায়, কি ইনটারেস্ট! আপনি বরং এক কাজ করুন, অন্যের বেনামীতে টেন্ডার দিন। খিরনীচকে

চানান নদীর ওপর যে ব্রিজ ছিল সেটা গত বর্ষায় ভেঙে গেছে, এখন একটা টেমপোরারি পুল আছে সেখানে। চার মাসের মধ্যে পারমানেন্ট ব্রিজ তৈরি করতে হবে, প্রায় তিনলাখ টাকার কাজ। কালই টেন্ডার ডাকা হয়েছে, দেখেছেন?'

'দেখে আমার লাভ!' প্রীতম কাওর হতাশস্বরে বলে, 'কিন্তু কার বেনামীতে কাজ করব, হিসেবের সময় তো সে ষোলোআনা নিয়ে সরে পড়বে, তখন আমি যাব কোথায়?'

'ভাল লোক খুঁজুন।'

'ভাল লোক বলতে, আমার ভাই সর্দার কল্‌দীপ সিং। কিন্তু সে ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে এমন জড়িয়ে পড়েছে যে, এ কাজটা তার ঘাড়ে চাপানো আমার উচিত হবে না। উপরন্তু তার মাথায় দু-দুটো মাইনিং অ্যাক্‌টের মামলা ঝুলছে।'

প্রীতমের বুদ্ধি বিফল হওয়ার পর নীলকণ্ঠ সেনাপতি তাকে পথ প্রদর্শন করবার চেষ্টা করেন, 'তাহলে আদিত্যকে নিন, এর বেনামীতে কাজ করুন। আপনার কথায় তো মনে হয় আপনাদের পরিচয় আছে?'

'তা আছে।' একটা প্রায়-নিস্তব্ধ উত্তর দিয়ে প্রীতম চুপ করে গেল।

নীলকণ্ঠ সেনাপতি বলেন, 'একেবারে বেনামীই বা কেন, আপনারা পার্টনারসিপ করুন। আদিত্যরও কিছু অভিজ্ঞতা হবে। কি হে, তোমার হাতে টাকাকড়ি আছে কিছু?'

শিলাদিত্য জানায়, 'সেজকাকা পাঁচ-সাত হাজার দেবেন বলেছেন।'

এবার যেন প্রীতম কাওর একটু ভরসা পায়, বলে, 'তিনলাখ টাকার কাজ, অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ হাজার নিয়ে না নামলে চলে না। যাক্ তাতে কিছু যায় আসে না, আমাদের শেয়ার আধাআধি হবে। পার্টনারসিপ এগ্রিমেন্ট কবে করবেন, রেজিস্টার্ড ডীড্ হওয়াই ভাল।'

শিলাদিত্য প্রীতম কাওরের মুখের দিকে শূন্যচোখে তাকায়, মুখে বলে, 'অ্যাঁ।'

নীলকণ্ঠ সেনাপতি হাসলেন, 'শুনলেন তো সবই, ও নিজের পায়ে চলতে পারে না, আপনাকেই চালিয়ে নিতে হবে।'

মুচকি হাসি হাসল প্রীতম কাওর, তারপর কিছুটা লজ্জাবশে ঘাড় নিচু করে মৃদুস্বরে বলল, 'আচ্ছা।'

ছাব্বিশ

আকাশে জলভরা মেঘের সঞ্চার। দখিনা বাতাস বন্ধ হয়ে মাঝে মাঝে গুমোট। ইতিমধ্যে দু'একদিন এক-আধ ফোঁটা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। অবশ্য পাঁজিপুঁথি ধরে বর্ষার আগমনে দেরি আছে এখনো, কিন্তু এবছর যেন সব ঋতু একটু তাড়াতাড়ি দর্শন দিয়ে যাচ্ছে। মধ্য-মাঘের দুপুরগুলো ঘোর গ্রীষ্মকাল বলেই মনে হত। বসন্ত কবে এসেছে, কবে গেছে, টের পাওয়া যায়নি।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রীতম কাওরের হৃৎকম্পনের সূত্রপাত। তার দেখাদেখি শিলাদিত্যর।

আট আনার অংশীদার প্রীতম কাওর কাজের সময় বুঝি রেজিস্ট্রি দলিলের শর্তগুলো ভুলে যায়। শিলাদিত্য তার হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল, তারপর কত পাঁচ হাজার যে প্রীতম নিজে ঢেলেছে, তার হিসেব করতে সাহস হয়নি শিলাদিত্যর। ইতিমধ্যে আংশিক বিল থেকে প্রীতম তাকে কিছু লাভাংশ দিয়েছে, তাও প্রায় হাজার খানেক। এদিক দিয়ে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই, মনোভাবও অসমান নয়। বরং হাত পেতে টাকা নিতে শিলাদিত্যই লজ্জা বোধ করেছে, প্রীতম বলেছে, 'অসংকোচে নিতে যদি না পার দত্তা, দিতেও পারবে না কোনোদিন। তবে তুমি ভেব না, আমি তোমার পাওনা সর্তের চেয়ে বেশি দিচ্ছি, আমার হিসেবে ভুল পাবে না।'

প্রীতম কাওরের স্বভাবের এ অধ্যায়টা সহনীয়, বরং অনুকরণযোগ্যই, কিন্তু কাজের সময় সে যেন শিলাদিত্যকে নস্যি করে রাখে। ভুলে যায় তারা সমান সমান, উপরন্তু সরকারী কাগজপত্রে শিলাদিত্য ষোলআনা মালিক, কনট্রাকট্ তারই নামে, প্রীতম কাওর কেউ নয়।

অথচ একজন মাইনেকরা ভৃত্যের চেয়ে—তা'ও একেবারে নিচু-মানের চাকর—ভাল ব্যবহার সে শিলাদিত্যর সঙ্গে করে না। বরং সরকারী চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়া যে একজন ওভারসিয়ারকে সে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেছে তার কদর ঢের বেশি। সে ভাগ্যবান ব্যক্তির এক মিনিট দেরি হলে প্রীতম ছটফট করে। শিলাদিত্যর ওপর হুকুম জারি হয়, 'যাও দত্তা, আমার স্কুটার নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ, পাণ্ডে আসছে না কেন!' তারপর পাণ্ডে এসে পড়লে একগাল হেসে তাকে আপ্যায়ন করে সে, 'ওঃ, আপনি আমায় পাগল করে রেখেছিলেন মিস্টার পাণ্ডে। সাইট-এ সবাই এসেছে, কাজ চলছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল কেউই বুঝি আসেনি, সব বন্ধ হয়ে গেছে! এমন কেন হয় বলুন তো?' পাণ্ডে খুশি, তার গালভর্তি পান আর মুখভর্তি হাসি মিলেমিশে একাকার। পাণ্ডের জন্যে প্রীতম নিজের হাতে পান সেজে আনে, ঝুলি থেকে পান বের করে দেয়, 'নিন, দোকানে কেনা পান ফেলে এই পান খান। অতদূর থেকে আসছেন, একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর কাজে নামবেন, আমার মাথার দিব্যি রইল। বাবাঃ, এমন কাজ-পাগল মানুষ আমি দেখিনি!'

প্রীতমের হাতের চম্পাকলি ছুঁয়ে পাণ্ডে পান নেয়, মুখে দেয়, কিন্তু তারপর যেন অবাধ্যতা দেখাবার জন্যেই বিশ্রাম নেওয়ার পরিবর্তে হন্তদন্ত পায়ে নদীর পাড় ভেঙে নিচে নামতে থাকে। নিচে, যেখানে শুকনো নদীর বুকে কংক্রিট পুলের ভিৎ গাঁথা হচ্ছে সেখানে গিয়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত সে থামে না, পিছু ফিরে তাকায় না।

পাণ্ডে অন্তর্হিত হলে প্রীতম কাওর মুচকি হাসি হেসে শিলাদিত্যর দিকে তাকায়, 'সত্যিই তুমি একটা ফালতু আদমি। সেদিন যখন সেনাপতি সাহেব তোমায় লক্ষ্য করে বললেন, দত্তা আর কি বলবে, ও নিজের পায়ে চলতে পারে না, তোমায় চালিয়ে নিতে হবে; সেদিন আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি, ক্রমশ হচ্ছে। আচ্ছা, এখন যাও, কুলি-সর্দারের কাছে গিয়ে হাজরি মিলিয়ে এস।

চোখ বন্ধ করে খাতায় সই দিও না, ক'টা লোক এসেছে গুনে দেখ। যে কোনো জিনিষ আয়ত্ত করার প্রথম পাঠই হচ্ছে মেহনৎ, কথাটা মনে রেখ।'

শিলাদিত্য আদেশ পালনে তৎপরতা দেখাতে যাচ্ছে, প্রীতম পেছন থেকে হাঁক দেয়, 'ঐ একটা কাজ নিয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে এস না, তোমায় এখুনি শহরে যেতে হবে, মডার্ন ইলেকট্রিক স্টোর্স-এ চারটে ডায়নামো সেট ভাড়া পাঠাবার কথা বলে এসেছিলুম, কালই এসে যাওয়া উচিত ছিল, গিয়ে জেনে আসবে পাঠায়নি কেন। শুধু জেনে আসা নয়, সঙ্গে নিয়ে আসবে—চারটে যদি আজ না-ও হয়, অন্তত দুটো।'

জবাব না দিয়ে শিলাদিত্য নদীর কিনারা ধরবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে, কুলি-সর্দার ঐ বালুময় শুকনো নদী-বক্ষের কোন্ একটা জায়গায় লাঠির মাথায় ছাতা বেঁধে তার অফিস খুলে বসেছে সেখানে। প্রীতমের কথার উত্তর দেওয়া না-দেওয়া সমান, কারণ কাজের ব্যাপারে সে গাফিলতির কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করে না। মাইনে-করা লোকগুলোকে যদিও বা: একটু সহ্য করে, কিন্তু শিলাদিত্যর ক্ষেত্রে আদেশ জারির অর্থ একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত। শিলাদিত্যর নিজেরও যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে, তা যেন তার মনেই হয় না। প্রথম প্রথম শিলাদিত্য অল্প-বিস্তর মতামত দিতে যেত, ভ্রূভঙ্গি সহকারে প্রীতম শুনতও তা, তারপরই বলত, 'ওগো দত্তা, একটু ধীরে, এই তো তোমার হাতেখড়ি। শুনব, তোমার কথা শুনব বইকি, তোমার কথামতোই চলব, কিন্তু তখনই, যখন বুঝব তোমার ওপর নির্ভর করা চলে, তোমার সব ইচ্ছে চোখ বুজে গ্রহণ করা চলে।'

প্রীতমের আদেশ শিরোধার্য করে শিলাদিত্য এগিয়ে চলেছে, পেছন থেকে তার স্বগতোক্তি শোনা যায়। শিলাদিত্যকে শুনিয়েই সে বলে কি? কিন্তু শিলাদিত্যর কানে সুস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসে, 'ওঃ, একটা বোঝা, যখন যার মাথায় থাকবে, তখনই তার কপাল ভাঙবে।'

অম্লুলেখা এখন কোথায়, কেন, কি অবস্থায়, তা আর প্রীতমের অজ্ঞাত নেই, সে মাঝে মাঝে মন্তব্যও করে, 'তোমার বউ পালাবে না তো কার বউ পালাবে? কোথায় তুমি তার সব ভার বহন করবে, না নিজেই এক দায় হয়ে ছিলে।'

একদিক দিয়ে অম্লুলেখা ও প্রীতম একই প্রকৃতি, দু'জনেই শিলাদিত্যর ওপর আধিপত্য করতে চায়। এই দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোনো নারীকে সে এত কাছ থেকে দেখেনি, তাই স্থির সিদ্ধান্তে বলতে পারে না, সব নারী একই ধাতু এবং এক তাপমাত্রায় স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত কি না।

তবে প্রীতম কাওর এবং অম্লুলেখার স্বভাবমূলে বিপুল পার্থক্য। অম্লুলেখা আত্মসর্বস্ব, প্রীতম তা নয়। নিজেকে নিয়ে প্রীতম কতখানি মাথা ঘামায় কে জানে! একমাত্র যখন সে অত্যধিক মদ্যপানে ঘোর উন্মাদ হয়ে পড়ে তখন তার অসহায় প্রলাপ কান পেতে শুনে এবং বক্তব্যের যোগবিয়োগ করে কিছুটা অর্থাবিষ্কার হয়। এটুকু বোঝা যায়, প্রীতমের মনে দুর্বার প্রেম-প্রবণতা আছে, তাতেই ডুবে থাকতে চায় সে। তার এ ভালবাসা বুঝি ব্যক্তি-বিশেষে সীমাবদ্ধ না হয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে উন্মুখ। আবার যেন বিশেষ কোনো ব্যক্তিত্বের শরণাপন্ন হওয়াই তার শেষ এবং চরমতম কামনা। মাতাল প্রীতমকে দেখে মনে হয়, জনসমাজের একজন হয়েও সে একান্তবাসী। অথচ একান্তপ্রয়াসী নয় সে।

প্রীতম কাওর সর্বাংশেই ঝুঁকিশীলা। উদ্দাম উত্তাল ঢেউএর মাথায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় নাচতে চায় যেন। দিনের সুখ রাতের শান্তি বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত পরিতৃপ্তি নেই। চিরাচরিত পথে চলতে গিয়ে যদি তার মনে হয় এ পর্ব দীর্ঘসূত্রিতার নামান্তর, তখনই

সে প্রত্যক্ষ অনিয়ম। প্রীতমের এ প্রকৃতি শিলাদিত্যর সহ্য হয় না। কিন্তু সে যেন শিলাদিত্যকে সর্বব্যাপারে নিরুপায় করে রেখেছে।

প্রীতম বলে, 'একটি কথা আমি সার জানি দত্তা, মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না, তবে কেন এত ভয়?' কখনো আবার বলে, 'জানো দত্তা, আমরা আজ যেখানে আছি, এটা কোনো বিশেষ যুগ নয়; যুগ বিবর্তনের সন্ধিক্ষণ।' প্রীতম যেন আর বলতে চায় না, স্বীকার করতে চায় না, তবু বলে ফেলে, 'বর্তমান সময়টা বড় বিচিত্র দত্তা, আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে ব্যর্থতা। ব্যক্তিগত অধিকার এত বেশি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, সরল মনে সরল প্রাণে একটা নিঃশ্বাস নেওয়াও দায়। তবে কেন আমি আইন মানতে যাব, কেন মানব সমাজ? দত্তা, এ যুগে জীবনের একটি মাত্র অর্থ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ।' একটু বিরতি দেয় প্রীতম, তারপর আবার একনিঃশ্বাসে বলে, 'সময়বিশেষে বিক্ষোভ কাম্য আর তা অপরিহার্য, কিন্তু তার স্থায়িত্ব যেমন কাম্য নয়, তেমনি আমাদের এই যুগোপযোগী জীবন-রীতিও অনভিপ্রেত। জানো দত্তা, মৃত্যুই আমাদের মুক্তিমন্ত্র।'

জন্মাবধি যেন এক অন্ধ বিবরে অতিবাহিত করার পর আজ শিলাদিত্যর দৃষ্টি-উন্মীলন হয়েছে। সমস্ত যুগটা পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার সুমুখে আবির্ভূত। প্রীতম কাওরই কি যুগ-প্রতিভূ! তাকে দেখে মনে হয়, এ যুগের অগ্রগামিতার মাধ্যম ক্রমবিবর্তন নয়, আকস্মিক অথচ সদাপ্রস্তুত বিক্ষোভ। সুচিন্তিত ধীরস্থির পদক্ষেপ নয়, অস্থির গতিতাড়না। শতাব্দীব্যাপী তপস্যায় জীবনোন্নয়ন নয়, নিমেষে লক্ষ্য উৎসর্গণ। বর্তমান যুগের পরিচিতি সময়ের দ্বারা চিহ্নিত নয়, কালস্পর্শবিমুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যুগাধ্যায়। অস্থির জীবনবোধ দ্বারা পরিচালিত প্রীতম-দলের গণমানস। এদের পরিপ্রেক্ষিতে শিলাদিত্য যেন এক চিরকালীন পরাজিত সত্তা।

প্রীতমের সংস্পর্শে এসে শিলাদিত্যর শূন্য অচঞ্চল মনে প্রতি-নিয়তের অস্থির ধ্বনি-মূর্চ্ছনা, নিরুপদ্রব প্রতীক্ষার আবরণে আর

জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না। আদি-অন্ত সমগ্র জীবনটাকে এক নিমেষের মধ্যে দেখে নেবার অসীম আগ্রহ জাগে তার। অনুলেখা-পরিচ্ছেদের অচিরাৎ অবলুপ্তি, প্রীতম-পর্বের আকস্মিক উন্মোচন সে সমলগ্নে দেখতে চায়। নিজের চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে তার মনে হয়, অস্থির চঞ্চলতা নিয়ে এগিয়ে যেতে না পারলে তাকে নিঃশেষ সমাধিতে অন্তর্হিত হতে হবে। শিলাদিত্য অনুভব করে প্রীতমের দার্শনিকতা ও প্রভাবে যুগোপযোগী মনোভাব তার প্রস্তুত হয়ে গেছে, কিন্তু এতটা বয়েস পর্যন্ত আয়াসহীন দিনযাপন করার দরুন দৈহিক জড়তা এখনো কাটেনি। প্রীতমের সমকক্ষরূপে সে তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি ; পাশের প্রীতম, স্পর্শের প্রীতম, যেন আদর্শগত প্রীতম হয়ে অনেকটা অগ্রবর্তিনী হয়ে রয়েছে।

আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে উপরি উপরি ক'দিন একটু সজল মেঘ দেখা গেলে প্রীতমের নাস্তিক মনও ভয়ভীত হয়ে উঠল, 'দত্তা, লক্ষণ ভাল নয়, কাজ এখনো অনেকটা বাকি, যদি বর্ষা নামে আমাদের এতখানি পরিশ্রমের সব চিহ্ন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। খরচের জন্যে আমি ভাবি না, আমার ভাই কল্‌দীপ সিং টাকার তোড়া খুলে বসে আছে, কিন্তু ভয় হয়, যদি শেষ পর্যন্ত কাজ গুছিয়ে তুলতে না পারি।'

তারপরই অবশ্য সে কথা ঘুরিয়ে নেয়, 'যেখান থেকে হোক আরো কুলি মিস্ত্রী যোগাড় করতে হবে। ওভারসিয়ার পাণ্ডে ব্যাটাকে এবার লাথি মেরে বিদেয় করে দেব, তার জায়গায় কোয়ালিফায়েড্ এনজিনিয়ার নিয়ে আসব। দিনরাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলবে। তোমার ওপর একটা বিশেষ ভার, পি. ডাবলু. ডি. অফিসে ধর্ণা দেওয়া। এগজিক্যুটিভ এনজিনিয়ারকে এনে মাঝে মাঝে প্রগ্রেস চেক্ করিয়ে নেওয়া, কারণ ব্রিজ শেষ হবার আগে যদি ভেসে যায়—! বলা যায় না, পাহাড়ী নদী, রাতারাতি তার

চেহারা বদলে যেতে পারে—আমাদের প্রপোরসানেট্ বিল পাশ হতে যাতে অস্থবিধে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ওয়ার্কস্‌-সাইট থেকে শহর মাত্র সাত মাইল, কিন্তু রাত্তিরে আর বাড়ি ফেরে না প্রীতম কাওর। সাইট-এর অতি সন্নিকটে পাশাপাশি ছুটো তাঁবু ফেলিয়েছে, একটা তার নিজের। অপরটা শিলাদিত্যর। ইলেকট্রিক জেনারেটার বসিয়ে জায়গাটা চব্বিশ ঘণ্টার দিবাসন্ধি করে রেখেছে। ওখানে সন্ধ্যে নামে না, রাত হয় না।

নিজের তাঁবুতে ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে শিলাদিত্য, মন-মেজাজ ভাল নেই বিশেষ। আকাশে মাঝে মাঝে গুর্‌গুর্ মেঘগর্জন, ওপাশের তাঁবুতে প্রীতম কাওরের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তাই চিন্তা করছে সে। প্রীতম অবশ্য মদের বোতলে নিমজ্জিত। কিছুদিন আগে সে একবার শিলাদিত্যকে খাওয়াতে এসেছিল, কিন্তু গেলাসের কাছে মুখ নিয়ে গিয়েও শিলাদিত্য চুমুক দিতে পারেনি, 'আমি পারব না প্রীতম, বড্ড ছুর্গন্ধ!' 'বেশ, তাহলে আমিই খেয়ে নিচ্ছি, তোমায় জোর করব না।' তারপর প্রীতম আর কখনো অনুরোধ করেনি, কিন্তু মাঝে মাঝে তার মাতলামি শিলাদিত্যকে সহ্য করতে হয়। সহ্য বলতে, প্রীতমের প্রলাপের সময় নিবিষ্ট শ্রোতার মতো মুখভঙ্গি করে বসে থাকা। কিছুক্ষণ অনর্গল বকে যাওয়ার পর টলায়মান পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রীতম তার তাঁবুতে চলে যায়।

শিলাদিত্যর কতদিন মনে হয়েছে প্রীতমকে নিজের ক্যাম্পখাটে শুইয়ে একটু পাখার বাতাস করে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। প্রীতমের যত কিছু লম্ফঝম্প উদ্দামতা যেন নিদারুণ অসহায়তার প্রকাশ। শিলাদিত্যর ইচ্ছে হয় নিজেকে তার মানসিক অবলম্বনে পরিণত করে। পারস্পরিক নিবিড়তার মধ্যে খানিক সময় ব্যয় করে আগামী প্রত্যূষে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপযুক্ত কিছুটা শক্তি নিজের জন্যে সঞ্চয় করে রাখে, কিছুটা প্রীতমের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। কিন্তু ইচ্ছের ডানা নেড়ে সে প্রকৃত তৎপরতার আকাশে ভাসতে পারে না, মনের অপ্রকৃতিস্থ গতি তার শারীরিক প্রয়াস

বিচিত্রভাবে স্থাণু করে রাখে। অসহায় প্রীতম অনাস্বাদিত অবস্থাতেই বিদায় নিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অনুলেখা অনেকখানি এগিয়েছে। জজ্ আদালতের নোটিশসহ তার বিবাহবিচ্ছেদের মোকর্দমার আর্জির নকল এসেছিল শিলাদিত্যর কাছে। হিন্দু বিবাহ বিধির ত্রয়োদশ ধারা মন্থন করে অনুলেখার উকিল আর্জির প্রতিটি ছত্রে মিথ্যোক্তির প্রবাহ দিয়েছে, নোটিশ নির্দেশিত তারিখে কিন্তু শিলাদিত্য নিজের সাফাই-গাওনা দিতে আদালতে হাজির হয়নি।

জীবনভূষণ প্ররোচনা দিয়েছিলেন, ধমক-ধামক দিয়েছিলেন, নিজে তিনি উকিলবাড়ি ছুটেছিলেন পরামর্শ নিতে, ফিরে এসে শিলাদিত্যকে বলেছিলেন, 'আমি পুলক সেন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছি, তোকে দেখা করতে বলেছেন —অনুলেখার কেস টিকবে না। তাছাড়া এখন যে দ্বি-পত্নীক জজ আছে সে ডাইভোর্স ডিক্রী দিতেও চায় না।'

শিলাদিত্য পরিষ্কার উত্তর দেয়নি, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে, ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে মেরুদণ্ডের প্রথম গ্রন্থি চুলকোতে চুলকোতে বলেছে, 'হ্যাঁ, হুঁ—তাই তো!'

জীবনভূষণ তাকে তাতিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'লেখা তার আর্জিতে বলেছে, তুই পতিতা নিয়ে থাকিস; কার কথা, ঐ পাঞ্জাবী মেয়েটা, যার সঙ্গে তোর ব্যবসা।'

শিলাদিত্য এ অভিযোগের সরব প্রতিবাদ করেছে, 'না, না, প্রীতম কাওর পতিতা—কখ্খনো না। লেখা, অনুলেখা নিজেই একটা পতিতা।'

জীবনভূষণ শিলাদিত্যর উত্তাপ আমল দেননি, 'হয়েছে, ঢের বাহাদুরী দেখানো হয়েছে, বিয়ে করা বউ পতিতা!'

এবার যেন শিলাদিত্য তার প্রত্যক্ষদর্শনে নির্বিক্ত মন্তব্য জীবনভূষণের সামনে বাজি-জেতা তাসের মতো মেলে দিয়েছে, 'সে তো ঐ প্রফেসরটার রক্ষিতা, কে না জানে। তুমিও তো তাই বলেছিলে?'

এ কথায় জীবনভূষণ নিরুত্তর, কিন্তু ক্ষোভ এবং ক্রোধ প্রকাশ করতে তিনি ভোলেননি, শিলাদিত্যর গালে আচমকা একটি চড় কষিয়ে দিয়েছেন, 'যাঃ, দূর—দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে।'

এই নিগ্রহের মাধ্যমে জীবনভূষণ কি বলতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায়নি, কিন্তু সে দিনটির পর আর এ প্রসঙ্গ তোলেননি তিনি।

তারপর জজ আদালতের মোহরাংকিত রেজিস্ট্রি পোস্টকার্ড এসেছে। প্রীতম কাওর ব্যবসাবাণিজ্যের সুলুক সন্ধানে নিয়মিত প্রাদেশিক গেজেট ওলটায়, সে বলেছে, 'গেজেটে নোটিশ বেরিয়েছে, আগামী তারিখে হাজির না হলে তোমার অনুপস্থিতিতে একপক্ষীয় শুনানী হবে।' শিলাদিত্য গ্রাহ্য করেনি।

প্রীতম জিগ্যেস করেছে, 'ব্যাপার কি দত্তা, একেবারে চুপ করে গেলে যে?'

শিলাদিত্য অনুভব করে প্রীতমের প্রশ্ন শোনামাত্রই তার চোখ-দুটো প্রবল অর্থময় হয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি প্রীতমের দিক থেকে দৃষ্টি অপসারিত করে নিয়ে সে তাচ্ছিল্য সহযোগে জবাব দিয়েছে, 'কেন আবার! তার যা ইচ্ছে তাই করুক সে।'

'তা বললে চলে না দত্তা।' মাতাল প্রীতম কাওরের বিজ্ঞ উপদেশ, 'তোমার বউ হয়তো একটা অভিমান বা ঝোঁক নিয়ে ছুটে চলেছে, একবার গিয়ে তার সামনে হাজির হও তুমি, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে।'

প্রীতম কাওরের সুমুখ থেকে মদের বোতলটা সরিয়ে দিয়েছে শিলাদিত্য, 'আপাতত আর না খেয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে ভাববার চেষ্টা কর, অনুলেখাকে নিয়ে আমি কি করব?'

'কেন?'

'তার সঙ্গে প্রফেসরের খারাপ সম্পর্ক।'

প্রীতম হেসে ফেলেছে, তার হাসি শিলাদিত্যর ভাল লাগেনি, দৃষ্টিও আহত হয়েছে। প্রীতমের গোলাপগৌর মুখের ওপর থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, প্রীতম লক্ষ্য করেছে তা, তাতেও হেসেছে,

'দত্তা, ভুলে যাও কেন, তুমি আজ কোথায়, কোন্ যুগে আছ!
প্রফেসরের সঙ্গে তোমার বউএর যদি সংসর্গ ঘটেই থাকে, তাতে এমন কি ক্ষতি হয়েছে! দেহের গ্লানি যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন নিজের মনটাকেও কেন ঐভাবে তৈরি করে নাও না? এই বিশ্লেষণী যুগে কারো মানস-ব্যবচ্ছেদ করতে যেও না, এত বেশি দেখে ফেলবে যে, তোমার নিজেরই স্বস্তি ব্যাহত হবে।'

কিছুদিন যাবৎ শিলাদিত্যর সমস্ত চেতনা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত, কাজকর্মের নেশা ও উদ্যম এবং বিভিন্ন গোলযোগ ছাপিয়ে একটি ভাবের বিলয়হীন অবস্থান তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আবর্তিত হয়ে চলেছে—প্রীতম। প্রীতম কাওর। কিন্তু প্রীতমের প্রায় স্পর্শের মধ্যে থেকেও সে রুদ্ধস্রোত। মনে হয় কাজপাগল চিন্তাজর্জরিত প্রীতম কি ভাববে এতে! সন্দেহ জাগে প্রীতম বুঝি তার নিজের জন্যে কোনো প্রাণমুখর অবসর রাখতে চায় না, নিভৃত জীবনানুভূতি কামনা করে না। অথচ একদিন নয়, কত অসংখ্য দিন মাতাল প্রীতম উদার ব্যাপকতায় তার মনোভাব শিলাদিত্যর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সে ভালবাসতে চায়, ভালবাসার জন্যেই বাঁচতে চায়। কিন্তু সুস্থমস্তিষ্ক প্রীতম ও আকণ্ঠ মদ্যপানে চেতনা-বিলুপ্ত প্রীতমের মানসিক গঠনের ব্যবধান এত বেশি যে, তা অতিক্রম করে শিলাদিত্য নিজের প্রণয়াবেদন প্রকাশ করতে সাহস করেনি।

আজকের কথাবার্তায় প্রীতম আবার শিলাদিত্যকে তার কামনার জায়গাটিতে এনে ফেলে, 'দেখ দত্তা, তোমার ধারণা ভুল, আমি কিছু চিন্তা করি না, ভাবি না, তা নয়। আমি ভেবে দেখেছি অম্লুলেখা সত্যিই দোষী; কিন্তু একজনের অপরাধের শাস্তি দিতে গিয়ে তুমি আত্মনিগ্রহ করছ, তাই বা কেন? অম্লুলেখা অনর্থ বাধিয়ে বসে আছে বলে তুমিও নিজের জীবনটাকে উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন করে রাখবে?'

শিলাদিত্য এতক্ষণ অসাবধান প্রীতমের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে ছিল, প্রীতমের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি

পূর্ণতর হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই সে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পরিবর্তে অবাধ্য কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে, 'উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন নয়, আমি আবার বিয়ে করব—প্রীতমকে।'

বোধহয় স্বেচ্ছায় এ জবাব প্রীতম আমন্ত্রণ করে এনেছে, তাই চমকাল না, বলল, 'কিন্তু অনুলেখার যা অপরাধ আমারও তো তাই? আমার জীবনে প্রথম ব্যক্তি কে, আমি তা'ও কোন্‌কালে ভুলে গেছি। সেদিক দিয়ে অনুলেখা আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে, সে তোমায় ভুলে যায়নি।'

শিলাদিত্য এখনো প্রীতমের দিকে তাকাতে পারে না, কিন্তু হঠাৎ যে কথাটি বলবার অবসর পেয়েছে তাতে স্থগিতও দেয় না, 'তোমার কথা আলাদা।'

'আলাদা কেন?'

'আমি আগেকার প্রীতম কাওরকে জানি না, যাকে জানি তার কোনো দোষ আমি দেখিনি, তাই তাকে ভালবেসেছি।'

প্রীতম হাত বাড়িয়ে মদের বোতলটা কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করে, শিলাদিত্য তাড়াতাড়ি সেটিকে আরো দূরে ঠেলে দেয়, 'এখন থাক, আগে কথা শেষ কর।'

'শেষ করব, কোন্ কথা শেষ করব?' প্রীতমের পক্ষে প্রশ্ন করা ও আশ্চর্য হওয়ার মুহূর্ত, সে স্থিরবিস্মিত চোখে কিছুক্ষণ শিলাদিত্যর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মদের বোতলটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'আমি তো পাথর নই দত্তা, এ কথা তোমায় আজ বলতেই বা হল কেন, প্রশ্ন করলে কেন?'

এতক্ষণে শিলাদিত্য তার ইতস্তত ছিটিয়ে রাখা দৃষ্টি সাগ্রহে কুড়িয়ে এনে সবটাই প্রীতমের ওপর বর্ষণ করে, 'ভুলবে না তো?'

'না।'

'যখন মদের ঝোঁকে থাকবে না তখনো—?'

'না, তখনো ভুলব না।' বলতে বলতে প্রীতম হাসল, 'তুমি এত দেরি করে এলে দত্তা, কিন্তু আমি তো প্রথম দিন থেকেই তোমার

পার্টনার। অবশ্য একদিন আমার কি হয়ে গেল জানি না, পার্টনারসিপ দলিল আমি ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। সেদিন থেকে আমার সবটাই তোমার হয়ে আছে, নিজের সরিকানা কোথাও প্রমাণ করতে পারব না। অবশ্য নকল বের করতে পারি, কিন্তু নকল দেখিয়ে আসল জিনিষের প্রমাণ করা, বড় বেশি লজ্জার ব্যাপার নয় কি?'

প্রীতম হাত বাড়িয়ে মদের বোতলটা তুলে নিয়েছিল, কিন্তু কি মনে করে সেটা আবার নামিয়ে রেখে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ক্যাম্পখাটে সটান শুয়ে পড়ল সে, 'তুমি আর এ তাঁবুতে থেকো না দত্তা, তোমার তাঁবুতে যাও। আমার জন্যে অপেক্ষা কোর, আমি নিজেই তোমার কাছে যাব।'

শিলাদিত্যর অপ্রত্যাশিত মনে অনেকখানি আশার তড়িৎ প্রবাহ খেলে যায়, সে সুখময় বিব্রত গলায় প্রশ্ন করে, 'তুমি আসবে, কখন?'

প্রীতমের মুখ দেখা যায় না, সারা দেহের একটা অংশও নয়, সবটাই কাশ্মিরী আলোয়ানের নিচে বিলীন, কিন্তু আভাসে সমগ্রতা ফুটে রয়েছে। প্রীতম জবাব দেয়, 'কবে কখন জানি না, কিন্তু অপেক্ষা কোর; যদিও এ পৃথিবীতে অপেক্ষা করার দিন বলতে আর কিছু নেই। ভালবাসা নেই, তবু ভালবাসতে চাই, এক মুহূর্ত দাঁড়াবার অবসর নেই, তবু অপেক্ষা করি; নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, কিন্তু শুধু দীর্ঘশ্বাসই ফেলি।'

শিলাদিত্য অপেক্ষা করতে লাগল, মনে হল প্রীতম যেন আরো কিছু বলবে, কিছুক্ষণ পরে ভুল ভাঙল তার, প্রীতম ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নিঃশ্বাসে সুদীর্ঘ শান্তি অথবা প্রচণ্ড আক্ষেপ, কোনোটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। নিজের মনের মতো একটা অর্থ রচনা করে শিলাদিত্য এগিয়ে যাবে ততটা আত্মপ্রত্যয় নেই তার, প্রীতমের তাঁবু থেকে সে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল।

সাতাশ

রাত একটা। নিঝুম গ্রামীণ পরিবেশ। অদূর ওয়ার্কস্‌ সাইট-এ পুরোদমে কাজ চলছে, সেখানকার কিছু কিছু শব্দ তাঁবুর ভেতর থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একাগ্র কানে ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটারের একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ ভেসে আসে, কিন্তু সবকিছুর ওপরই যেন রাত্রিময় নৈঃশব্দ।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত শিলাদিত্য সাইট-এই ছিল, সবার কাজের গায়ে সজাগ দৃষ্টি ছুঁইয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়িয়েছে, কোথাও বা অকারণে দাঁড়িয়ে পড়ে অযথা খানিকটা মালিকসুলভ উপদেশ বিতরণও। বালুময় নদীগর্ভে দাঁড়িয়ে উঁচু পাড়ের কোলঘেঁষা প্রীতমের তাঁবুর দিকে বার বার তাকিয়েছে সে। পাশের তাঁবুটা শিলাদিত্যর। দুটির প্রবেশমুখ উল্‌টো দিকে, যেদিক থেকে দখিনা বাতাস বয়ে আসে। নদী থেকে তাঁবুর ভেতরটা কোনো-মতেই দেখা যেতে পারে না, তবু প্রীতমের আকর্ষণ তার দৃষ্টি বার বার ঐ দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

অন্যান্য দিন এই সময়গুলো প্রীতম পাশে থাকে, মদের ভারি নেশা আর কাজ করার উদ্দাম নেশায় আচ্ছন্ন। শিলাদিত্যও নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তার নেশা প্রীতমের নিকটতম সান্নিধ্য। আজ প্রীতম সন্ধ্যের আগেই তাঁবুতে গিয়ে ঢুকেছে, তারপর বার হয়নি। শিলাদিত্য জানে প্রীতম এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, পরিকল্পনার খানিকটা আভাস সে গতকালই দিয়েছিল, কিন্তু তা শিলাদিত্যর মনঃপুত হয়নি।

প্রীতম ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, রেগে গিয়েছিল, এমনকি শিলাদিত্যর জাত তুলে কাপুরুষতার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছিল, 'বাঙালী, তোমাদের নীতিধর্মের একমাত্র মানে কাপুরুষতা। গ্রাম ভেসে যাবে, লোকজন পশুপক্ষী মরে যাবে—। যাবে তো যাবে, তাতে তোমার আমার

কি ? এই যে এতদিন ধরে কাজ হচ্ছে, তার মধ্যে আমি কোন্ অপরাধটা করেছি ! আজ যদি সুপারইনটেনডিং এনজিনিয়ার ছুটি নিয়ে বাড়ি না যেতেন, সে জায়গায় নারীভুখ এগজিক্যুটিভ এনজিনিয়ার ইনচার্জ হয়ে না বসত, তাহলে আমাদের এতখানি কাজের মাপজোক যথাসময়ে হয়ে যেত। ওঁদিকে যখন উপায় নেই, তখন মাত্র দশ-বারোটা দিন বর্ষার ধাক্কা বাঁচিয়ে রাখা, ইতিমধ্যে এস. ঈ. ফিরে আসবেন, আমাদেরও অনেকখানি কাজ এগিয়ে থাকবে।'

প্রীতমের মতো এত কথা শিলাদিত্য বলতে পারেনি, ভাষার চেয়ে ভঙ্গিব তীব্রতাই ফুটিয়েছিল বেশি, 'না প্রীতম, ওখানে বাঁধ দিও না, নদীব গতি হঠাৎ বদলে গিয়ে অনেক গ্রাম ভেসে যাবে।'

প্রীতম কাওব আব কথা বাড়ায়নি। তর্ক তোলেনি। ভাষার কঠোরতা ও অধৈর্য অভিব্যক্তি পরিত্যাগ করে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তর্মুখী চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। শিলাদিত্যর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে সে, কিন্তু তার সমস্ত অস্তিত্ব অন্যমনস্কতার মধ্যে লুপ্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামতের দ্বন্দ্ব থেকে কর্তব্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে।

আকাশের অবস্থা ভাল নয়, যে কোনো মুহূর্তে একটি ধারাবর্ষণ—তারপরই এখানকার সমস্ত প্রয়াসের অবলুপ্তি। নীলকণ্ঠ সেনাপতির অনুপস্থিতিতে এগজিক্যুটিভ এনজিনিয়ারই গদিয়ান। প্রীতম শিলাদিত্যকে বারকয়েক তার কাছে পাঠিয়েছে। অকুস্থলে তার শুভাগমনের জন্যে আকুতি জানিয়েছে শিলাদিত্য, যতখানি কাজ হয়েছে তার নিরিখ নিয়ে যাওয়া। তারপর বর্ষা নামুক, নদী প্রবাহিত হোক, প্রীতমরা নিশ্চিন্ত। তাদের পরিশ্রমের হিসেব সরকারী খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে তখন। এগজিক্যুটিভ এনজিনিয়ার প্রীতমের মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপার অবগত হওয়ার বাসনা করেছিল, প্রীতম যায়নি, এক বিকল্প আয়োজন হয়েছিল। আত্মদানের

পরিবর্তে অর্থ প্রবহণ। কিন্তু সে দক্ষিণা মঞ্জুর হয়নি। অনুরূপ সমস্যা ছ'মাস আগে দেখা দিলে প্রীতম কাওর দেহোৎসর্গের দ্বারাই তার কর্মজগতের সিদ্ধিদাতা দেবতাকে তুষ্ট করত। কিন্তু শিলাদিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে প্রীতমের প্রকৃতির এ ভাবটা পঙ্গু ও আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কোনোমতেই নিজেকে এই সহজতম পথে নিয়ে যেতে পারে না সে।

নীলকণ্ঠ সেনাপতি দিন দশেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন, তারপর সমস্ত সমস্যার সরল সমাধান। লোকটি স্বভাবতই ভাল, নিজের বাঁধা 'শতকরা' ছাড়া অন্য কিছুর লোভ নেই। তদুপরি মানুষের দুঃখ-দুঃসময়ের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। উপরন্তু শিলাদিত্য তাঁর প্রীতিভাজন।

কিন্তু এই দশটা দিন যেন দশ যুগ। অন্তহীন কারাজীবন। প্রীতম পাগল হয়ে গেছে। তাই সময়ের সম্ভাব্য বৈরিতা জয়ের এক নিষ্ঠুর আয়োজন করেছে সে। এখান থেকে আধমাইল দূরবর্তী নদীবক্ষের একটি জায়গায় অনেকগুলি দুর্ধর্ষ সমাজবিরোধী মোতায়েন। বর্ষা যদি নামে নিমেষে তারা নদীর বুক বেঁধে দেবে। বিস্তার ওখানে মাত্র দেড়শ' হাত। জলের প্রবাহ একবার ঘুরে গেলে প্রীতমের ওয়ার্কস্ সাইট নিরাপদ। এ পরিকল্পনায় অবশ্য অনেকগুলি গ্রামের জীবন সংহার। রুদ্ধপথ জলস্রোত অপর যে নদীটিতে অনুপ্রবেশ করবে সেটির দূরত্ব প্রায় আধমাইল। ব্যবধানের অঞ্চলগুলির সম্ভবপর দুরবস্থা অকল্পনীয়।

কিছুক্ষণ পরে প্রীতম সুস্থস্বরে বলেছে, 'না, তোমার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই, আমি নিজেই ভেবেচিন্তে যা হয় করব। করতেই যে হবে, তা নয়, প্রয়োজন নাও হতে পারে। একশ'টা লোককে পুষতে রোজ কত খরচ হচ্ছে বল তো? তাছাড়া এরা সাধারণ কুলি-কাবাড়ি নয়', বলতে বলতে প্রীতম হঠাৎ হেসে ফেলেছে, তারপর হাসি থামিয়ে বলেছে, 'সমাজবিরোধী গুণ্ডা— এদের দাম সাধারণ নিরীহ মানুষের চেয়ে বেশি। যে ক'টা টাকা

খরচ করলে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া যায়, একটি অভিজ্ঞ খুনীর সার্ভিস নিতে হলে তার বহুগুণ খরচ করতে হয়।'

প্রীতমের বক্তব্য কি শেষ হয়ে গেছে, দেখে মনে হয় না—শিলাদিত্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রীতম আবার বলে, 'খরচ ছাড়াও আশপাশের গ্রামের লোকের সন্দেহ—ব্যাপার কি, কারা এসে জুটেছে! ওরা বলছে, স্বপ্ন পেয়েছে ঐ জায়গায় মহাবীরজীর মন্দির তৈরি হবে, তার আগে একমাস রাম-নাম। অবশ্য তারা নিজেরাও জানে না, কেন রাখা হয়েছে তাদের, যথাসময়ে জানানো হবে।' কথা শেষ করে প্রীতম অন্যমনস্ক হাসি হেসেছে।

'ওঃ!' এইটুকু বলেই শিলাদিত্য নীরব।

এরপর প্রীতম কাওর হঠাৎ শিলাদিত্যর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলেছে, 'দত্তা, তোমায় বাঙালী-বাঙালী বলে যা বলেছি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা কোর। তোমাকে যা খুশি বলার অধিকার আমার আছে, তোমার জাতকে নয়। কিন্তু শুধু তোমার কাছেই তো বলেছি, তার জন্যে আমায় তুমি মাফ্ করে দাও!'

রাত একটা, শিলাদিত্যর ঘুম আসছে না। খবর পাওয়া গেছে, একতরফা শুনানীর পর অনুলেখা বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রী পেয়েছে। উপরন্তু তিনশ' টাকা মাসোহারা। আর্থিক খেসারৎ দেবার দায় নিয়ে শিলাদিত্য এখন চিন্তা করে না। প্রীতম তাকে এখনো পর্যন্ত যতই কাঁচা মনে করুক, এ পথটা সে শিলাদিত্যকে খুব ভাল করেই চিনিয়ে দিয়েছে। আর এই মাসোহারা ক'দিনের জন্যেই বা! অনুলেখার ভাগ্য এখন সরলগতি। ডক্টর সেনশর্মা ইতিমধ্যে বিপত্নীক হয়েছেন, তিনি হয়তো স্বহস্তেই পথ পরিষ্কার করে নিয়েছেন। ভেতরের ব্যাপার যাই হোক, শিলাদিত্যর পক্ষেও এটি সুসংবাদ,

অর্পণার মৃত্যুতে তার নিজেরও প্রীতমের কাছে পৌঁছুবার রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু মাথার ওপর থেকে ঝন্‌ঝট্‌ না সরা পর্যন্ত সে নীরবই থাকবে। তাছাড়া প্রীতম বলেছে, আমি নিজেই তোমার কাছে যাব, তার এ ইচ্ছের মূল্য-মর্যাদা রাখবে।

তাঁবুর পর্দা হঠাৎ নড়ে উঠল, আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে, টলায়মান পায়ে ভেতরে ঢুকল প্রীতম কাওর, অর্ধ-মুদিত চোখে শিলাদিত্যর ক্যাম্পখাটটা খুঁজল! 'তুমি কোথায় দত্তা?'

হেসে ফেলল শিলাদিত্য, এই অপরিসর জায়গায় এসে দাঁড়িয়েও প্রীতম অন্ধ! যাইহোক সে সাড়া দিল, 'এই তো, তোমার সামনেই —ক্যাম্প চেয়ারে।'

'ওঃ!' স্থির পায়ে দাঁড়াতে না পেরে প্রীতম শিলাদিত্যর বিছানায় বসে পড়ে, 'এখনো ঘুমোওনি দত্তা, কি করছ—বউএর কথা ভাবছ বুঝি?'

'হুঁ!'

প্রীতম সান্ত্বনা দেয়, 'কি করবে ভেবে, সে তো গেছেই; তবে সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছেদের চেয়ে মৃত্যু দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ভাল। তাতে খেদ থাকে, কিন্তু ক্ষোভ থাকে না।'

শিলাদিত্যর উত্তর লঘু-গম্ভীর, 'যে গেছে তাকে ভাবছি না, যে আসবে বলে কথা দিয়েছে তার কথাই ভাবছি।'

'খুব ভাল করছ, এর জন্যে আমি তোমায় ভবিষ্যতে পুরস্কৃত করব।' তার পরই প্রীতমের কণ্ঠস্বর বদলে যায়, 'দত্তা, কি করছ তুমি, মানুষ হও, পুরুষ মানুষ হও। আমার সব ভাবনাচিন্তা তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি, এমন হও তুমি। কিন্তু তুমি আমায় এমন বিপদে ফেলে রেখেছ কেন?'

'বিপদ, মানে—?'

'মানে আবার কি', শিলাদিত্যর দুর্বল পৌরুষের চিন্তায় প্রীতম জ্বলে ওঠে, 'এগজিক্যুটিভ এনজিনিয়ারটাকে আনতে পারলে না, আমার পরিকল্পনাও সমর্থন করতে পারলে না। আমি ওখান থেকে

লোকজন সরিয়ে দিয়েছি, বৃষ্টি যদি নামে সব ভেসে যাবে। তা যাক, তোমার যাতে অমত, তা আমি করব না। আমি কারো ক্ষতি বা ক্ষোভের কারণ হতে চাই না।'

শিলাদিত্য খুশি হয়, 'আমি জানতুম প্রীতম, এ কাজ তুমি পারবে না।'

প্রীতম কাওর অর্থময় অথচ শীর্ণ দুর্বল হাসি হাসে, 'না, তুমি তা জানতে না, বরং তোমার সন্দেহই ছিল, আমি মতলব আঁটছি। কিন্তু একটা সামান্য কাজও তুমি করতে পারলে না দত্তা!'

নিরাশস্বরে শিলাদিত্য বলে, 'কি করি, এগজিকুট্যিভ এনজিনিয়ার কিছুতেই এল না—বলে, এস. ঈ. না ফেরা পর্যন্ত সময় নেই।'

'সময় নেই!' চিড় খাওয়া স্বরে প্রীতমের বক্তব্য ফুটে বেরুল, 'তুমি আমায় সবদিক দিয়ে অসহায় করে তুলেছ দত্তা, কিন্তু এ কাজটা যে হয়ে যাওয়া খুবই উচিত ছিল, তারপর তুমি কত উঁচুতে উঠে যেতে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতে!'

'কি করি –' শিলাদিত্য আবার কি যেন বলতে গেল।

প্রীতম কাওর শিলাদিত্যর কথা কানে নিল না, অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'মুখে মদের বোতল আর বিছানায় মে'মানুষ গুঁজে দিলেই সে কুকুরের মতন ছুটে আসত। কিন্তু একথা আমি তোমায় আগে বলতে পারিনি, কেন জানি না, মুখে বেধেছে।' কিঞ্চিৎ বিরতি দেয় প্রীতম, আবার বলে, 'তুমি আমায় সবদিক দিয়ে অসহায় করে তুলেছ দত্তা, তবু এই আমার ভাল লাগছে!'

মাদক তামসে আচ্ছন্ন প্রীতম কাওরের চোখ, লণ্ঠনের অর্ধোন্মোচিত আলোয় নিরুত্তর শিলাদিত্যর মুখ লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে সে, তারপর উঠে দাঁড়ায়, 'কি ভাবছ দত্তা, চুপ করে আছ কেন?'

মন্থর শব্দে শিলাদিত্য জবাব দেয়, 'তোমার কথা ভাবছিলুম, তুমি যা বলছিলে!'

'ওঃ!' তাঁবুর নির্গমন পথের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে অনায়ত্ত পা দুটির টাল সামলাতে না পেরে প্রীতম শিলাদিত্যর গায়ের ওপর

ঢলে পড়ে, তারপর সুদৃঢ় অবলম্বনের মতো তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'না দত্তা, আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না, তোমার মতো করে আমায় ভাবতে দাও!' একই কথা বার বার বলতে বলতে কেঁদে ফেলে সে, নেশাগ্রস্ত কান্না থামতে চায় না।

কিংকর্তব্যবোধশূন্য শিলাদিত্য প্রীতমকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজছিল, ক্রমশ স্পৃহা কেটে গেল। প্রীতমের তরল অশ্রু তার গায়ের গেঞ্জি ভেদ করে বুকের ঠিক মাঝখানটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে প্রীতম বলছিল—আমার খুব ভাল লাগছে, এখন তারও তাই বলতে ইচ্ছে করছে, প্রীতমের মুখের কাছে, বুকের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে। প্রীতমের কানে কানে, মর্মে মর্মে।

আটাশ

এতদিন পর্যন্ত অনুলেখার ধারণা ছিল ভবিষ্যৎই সবচেয়ে অস্থির ও অনির্ণীত, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে বিপরীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার। আজ এই বছরের পনেরোই মার্চ সে নিজের একত্রিশ বছর সাতমাস পাঁচদিন বয়েসে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে দশ বা বিশ বছর পরের এই মাস এই তারিখে একচল্লিশ বছর সাতমাস পাঁচদিন অথবা একান্ন বছর সাতমাস পাঁচদিনে সে কোথায় কি অবস্থায় থাকবে। অনুরূপভাবে পরের দু'তিন দশকও, তবে ততদিন বাঁচতে চায় না। আরো নিষ্ঠুর সত্য, এই মুহূর্তেও তার প্রাণধারণের তিলমাত্র বাসনা নেই। এখন অবশ্য জীবনের দুর্বহ অনিশ্চয়তা বিলুপ্ত, উপরন্তু পরিপূর্ণ জীবনের সুখাস্বাদ সম্ভাবনা সমাগতপ্রায়, কিন্তু আগতমানের মোহ ছেড়ে যেতেও তার আপত্তি নেই; যেমন অর্পণা তার আয়ত্তাধীন সমস্ত ঐশ্বর্যই ছেড়ে চলে গেছে।

অর্পণা সমস্তিপুর থেকে ফিরে আসার আগেই অনুলেখা ডক্‌টর সেনশর্মাকে মামার বাড়িতে এনে মেজমামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। মিশুক ও রসিক স্বভাব নিমু চৌধুরীর প্রথম দর্শনেই ডক্‌টর সেনশর্মাকে পছন্দ হল, 'দেখ অধ্যাপক, আমার কাছে তোমার মতন শিশুদের জন্যে আপনি-আজ্ঞে নেই। কিন্তু তুমি বললে তোমার মান যাবে না তো?'

'না, না!' ঘরে ঢুকে ডক্‌টর সেনশর্মা হাত তুলে নিমু চৌধুরীকে নমস্কার জানিয়েছিলেন, এবার ঝুঁকে পড়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

'লেখাকে পড়াবার যে দায়িত্ব নিয়েছ তার জন্যে মাসিক দক্ষিণা তোমায় কি দিতে হবে?'

নিমু চৌধুরীর কথার ভঙ্গিতে ডক্‌টর সেনশর্মা হেসে ফেলেন, তারপর অনুরূপ ভাষায় জবাব দেন, 'মাসিক নয়, দৈনিক এককাপ চা।'

প্রায়-বর্তুল নিমু চৌধুরী তাঁর গালের মাংসপিণ্ডের মধ্যে লুপ্তপ্রায় চোখদুটি মিট্‌মিট্‌ করে ডক্‌টর সেনশর্মার মুখের দিকে তাকান, 'তোমার এ অমায়িকতা শুভ লক্ষণ নয়, তুমি বরং আমার চোখের সামনে বসে লেখাকে পড়িও, বুঝলে ?'

ডক্‌টর সেনশর্মার মুখ লাল হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই সামলে নেন তিনি, 'য়্যুনিভারসিটির বাইরে মাইনে নিয়ে পড়ানো আমাদের নিষেধ।'

'কিন্তু বিনা স্বার্থে যত্রতত্র দানখয়রাত, এটাও তো অনুচিত এবং অস্বাভাবিক।' বলেই হো হো করে হেসে ওঠেন নিমু চৌধুরী, তারপর নিজের দিকে আঙুল দেখান, 'এই যে বিপুলাকার বরতনুটি দেখছ অধ্যাপক, সুইট সেভন্‌টিফোর। এখন নানা রোগে কুপোকাৎ, নয়তো একটি দশক আগে পর্যন্ত দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় আমি পতিতালয়ে যাপন করতুম। মনুষ্যচরিত পাঠের ঐ একমাত্র অবজারভেটরি, পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনদর্শনের শীশমহল। তবে আমায় নিয়ে দুশ্চিন্তা কোর না, আমি উদারপন্থী। দেহটাকে কেন্দ্র করেই তো জীবনমৃত্যু হাসিকান্নার খেলা, দেহের পরিতৃপ্তির জন্যেই সব!'

নিমু চৌধুরী ঘরজোড়া পালংকে আসীন, অল্প শীতের দিনেও মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, খাটের অদূরে ক্যাবিনেটেড্‌ এয়ারকুলার, তিনি অবশ্য লঘু কাশ্মিরী শীতবস্ত্রে ভূষিত। পালংকই তাঁর বৈঠকখানা ও শয়নাগার এবং রন্ধনশালা। শখের রান্নার দু'চারটি তিনি খাটের ওপর বসেই তৈরি করে নেন। আয়োজন তাঁর হাতের কাছে রাখা শ্বেতপাথরের টেবিলে সদাসর্বদা সাজানো থাকে।

গ্যাস চুল্লিতে গরমজল চাপিয়ে নিমু চৌধুরী ডক্‌টর সেনশর্মার দিকে তাকালেন। ডক্‌টর সেনশর্মাকে তিনি এই পালংকেই নিজের পাশটিতে বসিয়েছেন। অনুলেখার বসবার উপযুক্ত অনেকখানি জায়গা খালি রয়েছে, তবু সে দাঁড়িয়ে আছে, বসেনি। মেজমামার কথাবার্তার ধরন-ধারণের সঙ্গে তার আবাল্য পরিচয়, তবু ডক্‌টর

সেনশর্মার উপস্থিতির দরুন একটু লজ্জা হচ্ছে তার। নিমু চৌধুরীর পরিহাসের ভাষাটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মতো বিঁধছে।

'কি চলবে, চা-কফি-কোকো?'

বিব্রত চিত্তের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা রক্ষা করে ডক্টর সেনশর্মা জবাব দিলেন, 'চা।'

ফুটন্ত গরমজলে চায়ের পাতা ছেড়ে নিমু চৌধুরী তাঁর পূর্বকথাব জের টেনে আনেন, 'মেয়েছেলের সঙ্গে যত বন্ধুত্ব করবে ততই ভাল, এটা আত্মশুদ্ধির উপায়। সোনা-হীরে শোধনের জন্যেও পঞ্চগব্যের দরকার পড়ে, যে পাঁচটা জিনিষের অন্তত ছু'তিনটি নারকীয় পদার্থ। নরক দর্শন না করলে কি স্বর্গপ্রাপ্তি হয় অধ্যাপক? যুধিষ্ঠির দ্য গ্রেটের গল্প জানো তো?'

একটু বিরতি পড়ে গিয়েছিল, নিমু চৌধুবী চা ছাঁকছিলেন, ছুটি পেয়ালা ডক্টর সেনশর্মা ও অনুলেখাকে দিলেন তিনি, বাকি একটা নিজের জন্যে রাখলেন, 'কি বলছিলুম যেন! হ্যাঁ, লেখাও তোমায় রৌরব দর্শন করিয়ে ছাড়বে, নারীর হাতে পুরুষের সদ্গতি ঐভাবেই হয়, কিন্তু ওটাই স্বর্গযাত্রার একমাত্র পথ। জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যেব দর্শন ঐখানেই পাবে তুমি। সত্য মানেই তো স্বর্গ! এত বড় সত্য মঠমন্দিরেও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

চায়ের পেয়ালা ঠক্ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে অনুলেখা চাপা তর্জনে প্রতিবাদ করে, 'আচ্ছা মেজমামা!'

'তুই থাম্ হারামজাদী' নিমু চৌধুরী ধমক দেন, 'ছুটো প্রাণের কথা বলছি, তাতে ফোড়ন কাটে! তুমি যে এই সরলমতি অধ্যাপকটিকে গেঁথে এনেছ, তা আমি বেশ জানি! হ্যাঁ, অধ্যাপক, তুমি বিবাহিত?'

না বলা কোনোমতেই সম্ভব নয়, কিন্তু অনুলেখার উপস্থিতিতে নিজেকে বিবাহিত বলে স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ হয় ডক্টর সেনশর্মার। অনুলেখার ধারণা তিনি আক্ষরিক অর্থে বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা, কিন্তু তাঁর দাম্পত্যজীবনে এমন একটা ফাঁক থেকে

গেছে যার জন্যে তাঁকে প্রকৃত বিবাহিতের পর্যায়ে গণনা করা যায় না, যেমন যায় না অম্লুলেখাকে। যেন তাঁদের দু'জনের কৌমার্য ও কুমারীত্ব পরস্পরের জন্যে সংরক্ষিত।

ডক্টর সেনশর্মার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়, ঘাড নেড়ে জড়িত স্বরে জানান, 'ঐ একরকম—'

'একরকম কি হে?' নিমু চৌধুরী সবিশেষ অবাক, 'বিবাহিতা স্ত্রীর সমান কে হতে পারে? আমার দু'হাতের নিচে দিয়ে কত শত যে পার হয়ে গেছে, কিন্তু তেরোবছর বয়েসে যে পঞ্চবর্ষীয়া পত্নী-দুলিটি গলায় ধারণ করেছিলুম, তাকে ফেলতে পারিনি। সে-ই আমার রক্ষাকবচ। এমন কালও গেছে, পতিতালয়ের প্রাপ্য বাকি পড়ে সেখানে তমস্সুক হয়ে আছি, জায়াদেবী তাঁর গয়না বিক্রি করে পতিদায় মুক্ত হয়েছেন। ভি. পি. খালাস করিয়েছেন।'

ডক্টর সেনশর্মা সলজ্জ রসিকতা করেন, নিমু চৌধুরীর উৎসাহজনক স্মৃতিগীতে সংগত করবার জন্যেই তাঁকে ঠেকা দিতে হয়, 'আপনার বিপুল সৌভাগ্য!'

'উঁহু' নিমু চৌধুরী ঘাড় নাড়েন, সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করেন, তারপর শিথিল সংশয়াকুল ভাষায় বলেন, 'আমার মনে হয় অধ্যাপক, দিনকাল সম্পূর্ণ বদলে গেছে, আমাদের কালের পারিবারিক চিত্র এখন অচল। এই বোধহয় ভাল, বাইরে বাইরে আমি ব্যভিচারের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেব, আর আমার স্ত্রী সতীত্বের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ঘরে বসে নারীধর্মের কীর্তন করবে, এ অনুচিত। দু'পক্ষ সমান হলে একটা মাঝামাঝি জায়গায় এসে রফা হয়।' অম্লুলেখার দিকে চোখ পড়ে তাঁব, 'আমি লেখাকে বলেছি, বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে। ও নিজে সিঁদুরের আড়াল দিয়ে অপরের প্রণয়মধু পান করবে, আর যত দুর্নামের ভাগীদার হয়ে থাকবে শিলাদিত্য—তুমি কি বল?'

এতক্ষণ বেশ চলে যাচ্ছিল; কিন্তু নিমু চৌধুরীর মন্তব্যের বুমেরাং ডক্টর সেনশর্মাকে আঘাত করে আবার এক সামাজিক

প্রশ্নের আকার নিয়ে একই ক্ষেত্রে সমাধান খুঁজতে যায়। অনেকখানি অস্বস্তি পরিপাক করার পর তিনি জবাব দেন, 'না, না, স্বামী-স্ত্রীতে মিলেমিশে থাকাই ভাল।'

নিমু চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে ডক্‌টর সেনশর্মার মুখের কাছে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ নাড়েন, 'সেটি হচ্ছে কোথায় বাপু? লেখা তো তোমার খপ্পরে পড়ে গেছে! আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই রমণী-মোহন লাইনে শিক্ষিত লোকেরাই বেশি সাংঘাতিক। তাদের প্রেমের কামড় বোড়াসাপের দংশন, রুগী মরে না বটে, কিন্তু পিরিতের ঘা-ও সহজে শুকোয় না।'

ডক্‌টর সেনশর্মা প্রবল আপত্তি করেন, 'না, না, এ আপনি কি বলছেন।'

অনুলেখার কিন্তু ডক্‌টর সেনশর্মার বৈষ্ণবতা ভাল লাগে না, অথচ তার আর একটি ভাবচিত্ত খিক্‌খিক্‌ ডাইনী-হাসি হেসে ওঠে। এই ব্যক্তিটির জন্যেই অখণ্ড অপযশ ও পাহাড়-প্রমাণ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চলেছে সে। স্থিরনিশ্চিত, তার পক্ষ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের মোকর্দমা হবেই, কিন্তু অধ্যাপক নিজের পরিকল্পনা গোপনীয়তার শামুক-খোলে লুকিয়ে রেখেছেন। ভোগের মুহূর্তে অক্‌টোপাশের মতো অজস্র কামবাহু মেলে ছুটে আসেন, নিবৃত্তির পরই তাঁর মোহহীনতার নির্মোকের মধ্যে অন্তর্ধান। লজ্জাবশত অনুলেখাও কোনো স্বার্থসংরক্ষিত প্রশ্ন করতে পারে না। সে স্থির করছে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর অসহায়তার পথে এসে দাঁড়িয়ে এই প্রসঙ্গ তুলবে। সেদিন অভিযোগ করা ও প্রতিকার চাওয়ার অধিকারীও হবে সে।

কিন্তু হিসেব-নিকেশের তিক্ততা-পর্ব অতিক্রম করে নিঃস্বার্থ ও আনন্দঘন জীবনে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থেকে অনুলেখা অব্যাহতি পেয়ে গেল। পরিস্থিতি এবং পথ এখন সম্পূর্ণ অনুকূল। তার সরলমতি তন্বী-মন ছাড়া অধ্যাপককে আর কিছুই দেখাবার প্রয়োজন হবে না। নিরীহ নিয়তি তাকে ঈপ্সিত জীবনের সন্ধিক্ষেত্রে পৌঁছে দেবে।

সমস্তিপুর থেকে অর্পণার ফিরে আসতে কিছুদিন দেরি হল, ঠিক যাত্রামুহূর্তেই অসুখ। লোক-দেখানো দায় রক্ষা করতে ডক্‌টর সেনশর্মা একদিনের জন্যে শ্বশুরালয়ে গেলেন। বলতে গেলে অনুলেখাই জোর করে পাঠাল তাঁকে, 'না, যখন টেলিগ্রাম এসেছে সিরিয়াসলি ইল, তখন একবার গিয়ে দেখে এস; যাওয়া উচিত তোমার। একদিনের বেশি থাকা নয় কিন্তু!' তাই করলেন ডক্‌টর সেনশর্মা, সমস্তিপুরে একরাত্রি কাটিয়ে অর্পণাকে নিরাময়ের ভরসা দিয়ে পরের দিনই ফিরে এলেন।

তারপর অবশ্য অনুলেখা বলল, 'তুমি কি রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ বল তো, একদিন বলেছিলুম বলেই কি একদিন! বাড়াবাড়ি অসুখ বলছ, তোমার আরো দু'চার দিন থেকে আসা উচিত ছিল, যতদিন পর্যন্ত একেবারে সেরে না উঠছে।'

ডক্‌টর সেনশর্মা জবাব দিলেন, 'আমার উচিত অনুচিত এখন তোমার বিধান অনুযায়ী চলছে অনুলেখা, নিজের ব্যক্তিত্ব আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।'

ডক্‌টর সেনশর্মার কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুলেখার বোধগম্য হয়, তবে এই বক্রোক্তির তিক্ত স্পর্শ এড়িয়ে যাবার জন্যে সে ভাবতে চেষ্টা করে অধ্যাপকের কথাটি প্রণয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। দুটি গ্রন্থিবদ্ধ হৃদয়-মন-তনুর পরস্পর-নির্ভরতার প্রকাশ।

অর্পণার রোগ-নিরাময় হল, প্রয়োজন পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু এবার বাপেরবাড়ি আসবার জন্যে সে যেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, ফেরার জন্যেও তেমনি। একবার ভাবল চিঠি লেখে, 'আমার অসুখ সেরেছে, তুমি এসে আমায় নিয়ে যাও, নয়তো কিছুদিন পরে এখান থেকে আপত্তি উঠবে, কারণ তোমার তপুর পরবর্তীটির আবির্ভাবকাল ততদিনে অনেকখানি এগিয়ে আসবে।' চিঠিটা লিখলও সে, কিন্তু

ডাকে দেওয়াতে গিয়ে দিল না, ছোট ভাইটিকে বলল, 'চল, আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবি।'

অর্পণার মা আপত্তি তুললেন। বাবা পারিবারিক ব্যাপারে মৃৎপাত্রতুল্য, তাঁকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না, কখন কার বিপক্ষে ফেটে পড়বেন তা অনিশ্চিত। পিতামহ কতকটা সেইরকমই, কোনো ব্যাপারেই বড় একটা মতামত দেন না তিনি, কিন্তু একবার কিছু একটা বলে ফেললে তা অপরিবর্তনীয়। তাই অর্পণা স্থির করল, যাত্রার আয়োজন চুকিয়ে নেওয়ার পরই এই দুই কর্তাব্যক্তির অনুমতি আদায় করে নেবে।

পিতামহকে প্রণাম করল অর্পণা, 'দাদু, আজ যাচ্ছি।' পিতামহ, ডক্টর সেনশর্মার ভাষায় আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়ো, একখানি সংস্কৃত ভেষজশাস্ত্রের পুঁথি ওল্টাচ্ছিলেন। পদ্মমধু এবং আরো কয়েকটি দ্রব্য-মিশ্রিত আরকে তিনি নিয়মিত চক্ষুধৌত করেন, তাই চশমার প্রয়োজন হয়নি। দৃষ্টিশক্তি এখনো বেশ প্রখর। সেই দৃষ্টিতে তিনি অর্পণার দিকে তাকালেন, 'তার মানে?'

উত্তর এড়িয়ে গিয়ে অর্পণা প্রশ্ন করে, 'বাবা কোথায় দাদু?'

'এখনো তো দোকানে বেরোয়নি, আছে ওদিকে কোথাও!'

'ওঃ, দেখি তো খুঁজে!' অর্পণা তাড়াতাড়ি পিতামহর কাছ থেকে সরে পড়ল।

উত্তর বিহার থেকে দক্ষিণ বিহার, রেলপথ ছাড়া জলপথও খানিকটা। অসুস্থ শরীর। সন্ধ্যের ফেরী স্টিমার। আসবার সময় অর্পণার ঠাণ্ডা লেগে গেল। তার অসুস্থতা দেখে ডক্টর সেনশর্মারও ধারণা হল ঠাণ্ডা লেগেছে।

রাত্তিরের দিকে ডাক্তারের কাছে যাবার পথে ডক্টর সেনশর্মা খবর দিতে এলেন, 'অর্পণা হঠাৎ এসে পৌঁছেছে, খবর না দিয়েই— জ্বর গায়ে।'

অনুলেখার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে গেল, 'এত তাড়াতাড়ি?' তারপর অধ্যাপক যেন তার অনবধান উক্তির যথাযথ অর্থ টের না

পান, তাই আবার বলল, 'মানে, এই তো তার খুব অসুখ গেল, একেবারে না সেরে আসা উচিত হয়নি। তুমি ভাল ডাক্তার দেখাও, গাফিলতি কোর না। ঘুরে ঘুরে রোগে পড়া ভাল নয়, এই থেকে দুরারোগ্য কিছু একটা দাঁড়িয়ে যেতে পারে।' এরপরও নিজেকে সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত করার জন্যে সে একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'তাছাড়া কি একটা হবে বলেও শুনেছি, এখন তোমার সবদিক দিয়ে সাবধান হওয়া দরকার।'

নিরীহ গোবেচারা মুখে ডক্‌টর সেনশর্মা বললেন, 'যদি বল—'

অনুলেখা ভ্রূ কোঁচকায়, 'এ ব্যাপারেও আমায় জিগ্যেস করতে হবে?'

ডক্‌টর সেনশর্মাও ভ্রূকুঞ্চিত করেন, কিন্তু ভাবার্থ আলাদা অনাবিল প্রত্যয়, 'হবে না।'

অনুলেখার মনে পড়ে, অর্পণাকে দেখে সমস্তিপুর থেকে ফিরে এসে অধ্যাপক বলেছিলেন, আমার উচিত অনুচিত এখন তোমার বিধান অনুযায়ী চলছে, নিজের ব্যক্তিত্ব আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। অধ্যাপকের কথাটা সেদিন ভাল লাগেনি, তবু নিজের মনটাকে সাধ্যমতো উদার বিস্তারে ছড়িয়ে দিয়ে সে একটা সুষ্ঠু অর্থ খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছিল। আজও অধ্যাপক যেন একই ভাব ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করলেন, অনুলেখা আবার পুরনো পন্থায় তার তাৎপর্য গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা চিড়্ ধরে গেছে, বার বার উন্মোচিত হয়ে তা আর মিলিয়ে যেতে চায় না, তাই সে শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়, 'দেখ, এখন কিছুদিনের জন্যে তোমার দেখাসাক্ষাতের ছট্‌ফটানি বন্ধ রাখতে হবে। যেদিন এসে আমায় জানাতে পারবে অর্পণার অসুখ একেবারে ভাল হয়ে গেছে, সেদিন এস, তার আগে এলে আমি দেখা করব না।'

এতখানি কথার একটি শব্দও অনুলেখার উচ্চারণ করতে ভাল লাগেনি। মনে হচ্ছিল ভালমানুষ সাজতে গিয়ে মানুষ নিয়তই

নিজের সহনশীলতায় বোঝা চাপিয়ে চলে, যথার্থ আত্মাধিকার সংকুচিত করে রেখে অযথাই আত্মনিপীড়ন করে। অর্পণার চেয়ে তার দাবি অধ্যাপকের ওপর বেশি বই কম নয়, কারণ এই সম্পর্কে এসে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে সে। সবচেয়ে বড় সম্পদ, সম্ভ্রম; সামাজিক নিয়মে পুরুষের চেয়ে নারীর কাছে যা অধিকতর মূল্যবান, সেটা পর্যন্ত আপাতত ঘোর অনিশ্চয়তায় ভেসে রয়েছে। শিলাদিত্যর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হবে, তারপর অধ্যাপক তাকে নিয়ে কি করবেন, কোথায় রাখবেন, বা জীর্ণ খড়কুটোর মতো তার ব্যবহারজীর্ণ নারীচর্ম আবিল ভাগ্যস্রোতে ভাসিয়ে দেবেন, কে জানে! নৈশাভিসারের শ্রান্তি অপনোদনের অবসরে অধ্যাপক তাকে নিজের জীবনস্বত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু দিবাদৈনন্দিনতার পরিপ্রেক্ষিতে সে সর্ত কতটুকু বজায় থাকবে তার ছায়াভাসও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সম্পর্কটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এবার চক্ষুলজ্জা ছেড়ে একটা দোকানদারী হিসেব করে নিতে না পারলে তার লাভের ঘরে কিছু জমা হবার সম্ভাবনা দূরে থাক, আসল সত্তাও উপেক্ষিত এবং বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু অসহায় অথচ অর্থহীন লজ্জায় সে আজকাল যেভাবে জর্জরিত, তার ওপর এই প্রশ্ন তুলে নিজের অন্তর্জ্বালা বাড়াতে সাহস হয় না আর। তাই সে বাধ্য হয়েই সরলতার নির্মোক ধারণ করে অনিশ্চয়তায় কালাতিপাত করছে।

সম্ভবত অনুলেখার নির্দেশেই ডকৃটর সেনশর্মা ক'দিন নিমু চৌধুরীর বাড়ি এলেন না। য়্যুনিভারসিটিতেও যাননি। তারপর য়্যুনিভারসিটির অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অনুলেখাও একদিন শুনল অর্পণা মারা গেছে। চিকিৎসা চলছিল নিউমোনিয়ার, মৃত্যুর ঠিক আগের দিনটিতে ধরা পড়ল, মেনিনজাইটিস। মেরুদণ্ডে ছুঁচ বিঁধিয়ে তরল রোগপদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল। সেদিন তার দুটি চোখই অন্ধ।

মরার আগে অর্পণা আংশিক চেতনা ফিরে পেয়েছিল, ডক্‌টর

সেনশর্মার হাত ধরে বলেছিল 'তোমায় ছুঁয়ে চিনতে পারছি, কিন্তু দেখে চিনতে পারছি না কেন? আমি তো অন্ধ হয়ে যাইনি—আর সবই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

মৃত্যুপথযাত্রিণী অর্পণার হাত ধরে থাকতে থাকতে অধ্যাপকের দুটি চোখ দিয়ে জল-ধারা গড়িয়ে পড়েছিল, তারপর তিনি নাকি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। ডক্টর সেনশর্মার এক অনুগত ছাত্র গুরুপত্নীর সেবায় নিযুক্ত ছিল, সে-ই পরের দিন ক্লাশে সবিস্তার গল্প করেছে। শুনে অনুলেখা ভাববার চেষ্টা করেছে, সব মানুষই এই দুর্বলতার বশীভূত, এ ধরনের আচরণ কোনো বিশেষ আত্মিক সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না। অনুলেখা চেনে না অর্পণাকে, দেখেনি পর্যন্ত তাকে, তাছাড়া অর্পণাই তার জীবনের সর্ববৃহৎ অনিশ্চয়তা হয়ে ছিল, মৃত্যুর পরও সে প্রতিবন্ধক খানিকটা থেকে গেছে, তবু তারও চোখ তো জলসিক্ত হয়ে উঠেছে!

য়্যুনিভারসিটি থেকে সবচেয়ে বড় খবরটা সংগ্রহ করে এনেও অনুলেখা বাড়িতে, অর্থাৎ তার বর্তমান নিবাস মামার বাড়িতে, বলতে পারেনি। মেজমামা এবং সম্প্রতি বড়মাসিমা—যিনি মেজমামার চেয়ে বছর তিনেকের বড়, কিছুদিন আগে বৈধব্যলাভ করে প্রায় বিশবছর পরে এলাহাবাদ থেকে এখানে এসেছেন—এঁদের দু'জনের কাছে সংবাদ পরিবেশনের জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছিল তার। ইতিমধ্যে মেজমামা প্রায় রোজই খোঁজ নিয়েছেন, অধ্যাপকের বউ কেমন আছে। যা হোক একটা মনগড়া জবাব দিয়েছে অনুলেখা, বলেছে ভাল; কখনো বলেছে, সেরে এসেছে প্রায়। বলবার সময় মুখের বিকৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে সে, নয়তো বড়মাসিমার সুমুখেই মেজমামা হয়তো মন্তব্য করে বসবেন, 'তোর নাগিনী-নিঃশ্বাসেই বউটা মরল; যা তোর মাইল দু'মাইল মাপের এক-একটা দীর্ঘশ্বাস!'

য়্যুনিভারসিটি থেকে ফেরার পর অম্লুলেখার পুরো দুটি ঘণ্টা বাথরুম ও পোশাক-প্রসাধনে খরচ হয়, আজ মেয়াদটাকে সে পনেরো মিনিটের বেশি এগুতে দেয়নি, তারপর মেজমামার ঘরে এসে তাঁর পালংকের একটি কোণ ঘেঁষে বসে পড়েছে। মেজমামাও দিন-কয়েক যাবৎ অসুস্থ। মামিমা কমলনয়না তাঁর পরিচর্যায় রত। চব্বিশ ঘণ্টার দিনের মধ্যে অন্তত বিশ ঘণ্টা তিনি পতিসেবায় ব্যয় করেন, মুখের একটা সাড়া পর্যন্ত শোনা যায় না, তবু বড়-মাসিমা অসন্তুষ্ট। তাঁর দৃঢ় ধারণা ভাই নিমুর ভবলীলা-সমাপ্তি আসন্নপ্রায়।

নিমু চৌধুরীর পালংকে বসেই বড়মাসিমা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। স্টেটস্‌ম্যান। অন্য ইংরেজি কাগজের ভাষা তিনি গলাধঃকরণ করতে পারেন না। ওরা না জানে গ্রামার, না পারে ভাবপ্রকাশ। কিছুক্ষণের মধ্যে সবক'টি পাতা উল্‌টে নিয়ে কাগজটা দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি ভ্রাতৃবধূর সেবাপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কমলনয়না তখন ঈষদুষ্ণ গরমজলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে স্বামীর গা মুছিয়ে তাঁর পিঠে সুগন্ধী ট্যালকাম্ পাউডার মাখাচ্ছিলেন। নিমু চৌধুরীর চোখে চশমা, বাঁ হাতে রেসগাইড্, ডান হাতে একটি আতশী কাচ—চোখে অল্প ছানি পড়েছে, এখনো পাকেনি, তাই ছোট্ট অক্ষরগুলো প্রাঞ্জল করার এই ব্যবস্থা।

নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে বড়মাসিমা নিমু চৌধুরীর পাশে বসলেন, ঈশ্বরের অফুরন্ত কৃপার ছাপ তাঁর শরীরেও পরিস্ফুট। নিমু চৌধুরীর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন তিনি। ডান হাতখানি তাঁর মাথায় সঞ্চালিত হতে হতে চিবুকের নিচে পর্যন্ত এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর সভয়ে হাতখানি সরিয়ে এনে সেই হাতের আঙুলগুলোর ডগায় কি যেন নিরীক্ষণ করে কমলনয়নার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাকলেন, 'বউ!'

পঁয়ষট্টি বছর বয়েস উত্তীর্ণ, তবু কমলনয়নার মাথার ঘোমটা কখনো স্থানচ্যুত হয় না। সহজে তাঁর কপালটুকুও দেখা যায় না। বড়মাসিমার ডাকে কমলনয়না মৃদুস্বরে সাড়া দিলেন, 'বলুন ?'

'কি আর বলব বউ, এতদিন যে তোদের নজর পড়েনি, তাতেই আমি অবাক।' ঘরের মধ্যে সক্রিয় এয়ার-কুলারের মতো বড়-মাসিমা সুদীর্ঘ শ্বাসমোচন করেন, 'নিমু আর বেশিদিন বাঁচবে না বউ, এই ঠাণ্ডা বাতাসেও গা দিয়ে চট্‌চটে ঘাম বেরুচ্ছে। চেয়ে দেখ, মুখের হনু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, চোখদুটো ইস্পাতের ছুরির ফলার মতন চক্‌মকে, অথচ ঘোলাটে। এ সবই মৃত্যুর লক্ষণ বউ।'

কমলনয়নার দৃশ্যমান মুখটুকুতে অস্বস্তি ও ক্রোধের ভাব ফুটে ওঠে, সর্বাঙ্গে বিতৃষ্ণার কম্পন, কিন্তু মুখে তিনি একটাও প্রতিবাদ করেন না।

বড়মাসিমার স্বামী এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার লক্ষ্মণ সেন মাত্র সাতমাস আগে পরলোকগত হয়েছেন। একাশিটি সমঋতুদর্শিত পরমায়ুর সাড়েআশিটা বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি সুস্থ-সবল দেহে ইওর লর্ডসিপ্‌ করে কাটিয়ে গেছেন। মহান্যায়ালয়ে তাঁর প্রতিটি উপস্থিতির মূল্য ছিল সাড়েসতেরোশ' টাকা। সেই মহার্ঘ্য মহাবলী ব্যক্তিরও তিরোধান-পূর্ব মৃত্যু-চিহ্নাদি প্রকাশিত হয়েছিল।

দশটা বাজছে প্রায়, তাড়াতাড়ি আহার সমাধা করে টেবিল ছেড়ে ওঠবার সময় চোখে অন্ধকার দেখলেন লক্ষ্মণ সেন। মস্তিষ্কের যন্ত্রাদি তখনো কিন্তু সবল সচল। টেবিলের অপর পারে বড়-মাসিমা। স্বামীর সঙ্গে একত্রে ভোজন তাঁর চিরদিন। শ্বশুর-শাশুড়ীবিহীন সংসারের বধূ হয়ে এসেছিলেন বলে কোনো সাবেকী রীতিনীতির পাহাড় তাঁর ওপর ভেঙে পড়েনি। আর বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টারের গৃহরীতি একটু ভিন্ন ধরনের হয়ও।

প্রেসারকুকারে সিদ্ধকরা মুরগীর ঠ্যাংটি বড়মাসিমা তাঁর বাঁধানো দাঁতে বেশ বাগিয়ে ধরে চিবুচ্ছেন, মনে হল, স্বামীর কি যেন হয়ে গেল। 'কি গো, কি হল তোমার?' তখনো বড়মাসিমা উঠবেন কি না ভাবছেন, যদিও তাঁর ধারণা স্বামীর ওপর প্রকৃতির এই শেষ এবং চরম প্রহার, কারণ কিছুদিন আগে থেকে তার অল্পবিস্তর আভাস দেখা যাচ্ছে।

লক্ষ্মণ সেন আবার পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়েছেন, মাথাটা ডিনার টেবিলের সঙ্গে প্রায় সেঁটে এসেছে। স্ত্রীর কথা শুনে অতিকষ্টে চোখ তুললেন তিনি, ঝোঁকানো মাথা, কষ্টকৃত উন্নত দৃষ্টি অবশ-বিভ্রান্ত, তবু বললেন, 'কিছু নয়, সুইটী, মাই লাইট ইজ আউট। তুমি আমার জুনিয়ার বসুকে ফোন করে দাও, টু অ্যাটেনড্ মাই কেসেস টু-ডে।'

তারপর সার্থক পাতিব্রত্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন বড়-মাসিমা। নিমু চৌধুরী সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি আজ সেই দৃষ্টান্ত টেনে আনেন, 'স্বামীর সেবা তুমি এমন কি করছ বউ, একটা আটটাকা ফী-র পাটনা-পাশ ডাক্তারের হাতে গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, সে-ও দুটো অ্যান্টিবায়োটিকস্ ঠুঁসেই খালাস। স্বামীসেবা আমি যা করেছি তা গিয়ে এলাহাবাদের বড় বড় লোকদের জিগ্যেস করে এস। উনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেই ফোন করে অ্যামবুলেন্স আনিয়ে ডাক্তার ভাদার নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলুম। সব মিলিয়ে দিনান্তে খরচ তিনশ' টাকা, মাসে ন'হাজার। উপরন্তু বাড়তি দুটি আয়া, একটি নার্স। তাদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। চেক কেটে কেটে মাসপিছু দশটি হাজার করে আমি স্বামীসেবায় খরচ করেছি। তিনি মোট পাঁচমাস একুশদিন নার্সিং হোমে ছিলেন, হিসেব করে দেখ বউ, তার মানে কত! তাঁর প্রাণটা যখন বেরিয়ে গেল আমি তখন মাদ্রাজে বড় ছেলে সুপ্রকাশের কাছে। সুপ্রকাশের স্টিভেডোরী ব্যবসা, ডকে সাতখানা জাহাজ লেগে রয়েছে, দম ফেলার ফুরসৎ নেই। তবু টেলিফোনে খবর পেয়েই আমি আর সুপ্রকাশ প্লেন

চাটার্ড করে এলাহাবাদ—মড়ার গা তখনো বেশ গরম, ঠাণ্ডা হয়নি!'

এতটা শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে কারো কথা শোনার অভ্যেস নেই অনুলেখার, যদিও বড়মাসিমা মেজমামিমার উদ্দেশেই আত্মস্তুতি গাইছেন, তবু মাঝে মাঝে অনুলেখার দিকেও তাকাচ্ছেন তো—তাই তাকে সমর্থনসূচক মাথা নাড়তে হচ্ছে, যদিও সে অন্যমনস্ক, চিন্তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপযুক্ত একটা ঘাট খুঁজে চলেছে। বড়মাসিমাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না সে, অথচ তার নিজের চিন্তাধারা প্রকৃতই উদার এবং দিন দিন এই ভাবের বৃদ্ধি হচ্ছে। তবু বড়মাসিমার কথাবার্তা তার গায়ে বিষ ঢেলে দেয় যেন, বলতে ইচ্ছে হয়, 'ভূতের মুখে রামনাম মানায় না বড়-মাসিমা!'

দিনকয়েক থেকে বড়মাসিমা অনুলেখাকে অজস্র উপদেশ দিয়ে চলেছেন। তিনি এখানে আসা অবধি বিবাহবিচ্ছেদ মোকর্দমা তুলে নিতে প্ররোচনা দিচ্ছেন। সেদিন বেলা ন'টায় ঘুম থেকে উঠছেন তিনি, সাতাত্তর বছর বয়স্কা হিন্দু-বিধবা, বাসিমুখে এক পেয়ালা কফি আর দুটো ডিমসিদ্ধ খেয়ে নিত্যপূজায় বসেছেন, সামনে দিয়ে অনুলেখাকে বাথরুমের দিকে যেতে দেখে ডাকলেন, 'লেখা, শোনো একটু!' অনুলেখা কাছে আসতে বললেন, 'আমি যা বলেছিলুম তা কি তুমি ভেবে দেখেছ? ঐ মোকর্দমা-টমা তুমি তুলে নাও, হিন্দু ঘরের বউ, সতীত্ব আর পাতিব্রত্যর চেয়ে বড় ধর্ম কি আছে!' অনুলেখার মনে হল, জবাব দেয় 'আপনাকে দেখে আমার তাই-ই মনে হয়!' কিন্তু কিছু না বলেই সে সেখান থেকে চলে গেল, কারণ এখন মেজমামার ভরসাই তার তেজ-শক্তি-মনোবল, সব কিছু—এবং মেজমামা সম্প্রতি সবিশেষ দিদিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

স্বামীকে পাউডার মাখানো শেষ করে তাঁর গায়ে একটা মির্জাই-বেনিয়ান পরিয়ে দিয়ে কমলনয়না ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, ঠিক

সেই মুহূর্তে নিমু চৌধুরী উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখ্ দিদি, দেখ্!'

নিমু চৌধুরীর গলার স্বরে চমকিত হয়ে কমলনয়না পিছু ফিরে তাকালেন, নিমু চৌধুরী ইসারায় জানালেন, তাঁকে উপলক্ষ্য করে নয়; তারপর বড়মাসিমার দিকে রেসের বইটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি, 'ওরে দিদি, এবার গারুদাই ফার্স্ট সিটিজেন অফ্ ইণ্ডিয়া, তারই বাজার—সব বাজি মারছে গারুদা!'

বড়মাসিমা বিস্ফারিত চোখে ভাইএর মুখের দিকে তাকান, তারপর জিজ্ঞাসু মুখভঙ্গি করেন, তৎসহ প্রশ্ন, 'গারুদা! সে কে রে?'

'কে? রেস হর্স, রেস হর্স; আঃ, আজ যদি আমি কলকাতায় থাকতুম!'

বড়মাসিমা তখনো চমকিত, 'গারুদা, এ নাম তো শুনিনি কখনো?'

'শুনবি কি দিদি, একেবারে নতুন, ফ্রেস ফ্রম মাউ সে তুংস নিউ ওয়ার্ল্ড অফ্ চায়না—চীনে ঘোড়া।'

'চীনে ঘোড়া!' রেস সম্বন্ধে অভিজ্ঞা বড়মাসিমার সন্দেহ জাগে, 'হ্যাঁ রে নিমে, চীনে ঘোড়া আবার রেস জিতল কবে? বইটা গেল কোথায়?' বইটি নিমু চৌধুরী আগেই এগিয়ে দিয়েছিলেন, কুড়িয়ে নিয়ে বড়মাসিমা ঘোড়ার নাম পড়লেন, পরক্ষণেই আঁৎকে উঠলেন তিনি, 'নিমে হতচ্ছাড়া, এই বিদ্যে তোর? জি এ আর ইউ ডি এ, গারুদা না গরুড়? আমি তাই ভাবি, চী-ঈ-নে ঘোড়া আবার রেস জিতল কবে! এ কি নেফার পাহাড়ে লড়াই, ঘোড়ার মাঠ আরো শক্ত জায়গা—আরব অস্ট্রেলিয়া গেল তল, চীন বলে কত জল!'

নিমু চৌধুরী প্রবলকণ্ঠে চিৎকার করেন, 'তুই আমায় ঘোড়া চেনাবি দিদি, আমি চোদ্দ বছর বয়েস থেকে ঘোড়া-বাই আর বাঈ-বাই রোগে ভুগছি। আমার স্বনামধন্য বাপ ঘোড়া-রোগেই মারা গেছেন।'

বড়মাসিমাও সমান তালে চেঁচান, 'রাখ্, তুই আর তোর স্বনামধন্য বাপ—তোরা এককুলে রেস্নুড়ে, আমি দু'কুলে। পিতৃবংশ, শ্বশুরবংশ। তোর জামাইবাবু বছরে পঞ্চাশহাজার টাকার রেস খেলতেন, তোর ভাগ্নে সুপ্রকাশ রেসের আগের রাত্তিরে মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ঘুমোয়। তাছাড়া তার নিজেরও দুটো ঘোড়া আছে, রোজ কাগজে নাম বেরোয়, লাকি টপ্, আনলাকি ডাউন।'

এ রঙ্গকলহ অনুলেখার মন্দ লাগছিল না, যদিও অনেকটা অংশই রুচিগ্রাহ্য নয়, তবু তার ভারাক্রান্ত মনে একটা হাল্‌কা বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছিল যেন। ঘরের দরজার দিকে হঠাৎ তার নজর পড়ে, পাশাপাশি দুটো দরজায় সিল্কের পর্দা। দুটি পর্দার ওপর দিয়েই একটা পরিচিত ছায়া প্রবাহিত হয়ে গেল। ছায়াস্রোতের গতি তারই ঘরের দিকে, এই ঘরটির পর তিনটি বাদ দিয়ে চতুর্থটা।

অনুলেখার মনে ত্বরিতের ব্যস্ততা, অথচ শরীরের শক্তিকেন্দ্রগুলিতে নির্জীবতার আবির্ভাব; দুই বিরোধী ভাবের মধ্যে কিঞ্চিৎ' সামঞ্জস্য আনতে কিছু সময় লাগল। উপস্থিত দুটি যুযুধান বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার দৃষ্টির অলক্ষ্যে একক মানসিক যুদ্ধটা শেষ করতে হল তাকে, তারপরই অচঞ্চল বহিরাবরণ সর্বাঙ্গে নিয়ে এ ঘর থেকে নিজের ঘরে এল। পর্দার ছায়াটা এখানে মূর্তিরূপে বিরাজ করছে, ডক্টর সেনশর্মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন—অনুলেখার প্রতীক্ষায়।

অধ্যাপককে দেখার পর অনুলেখা আবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, এত তাড়াতাড়ি তাঁর আবির্ভাব কল্পনার প্রত্যাশাকেও হারিয়ে দেয়। অর্পণা মাত্র গতকাল মারা গেছে, অনুলেখার সামান্যতম অনুমান হয়নি অধ্যাপক আজই এখানে আসবেন। আকস্মিক বলে যে একটা শব্দ আছে, তিনি তাকেও পেছনে ফেলে এসেছেন। আকস্মিক মৃত্যুপ্রদত্ত চিরকালীন বিরহে জর্জরিত মানুষটাকে অতঃপর

কোন্ ভাষায় সান্ত্বনা দেবে, কিভাবে সম্ভাষণ করবে, সে তার একটা মানসিক মহড়া পর্যন্ত দিয়ে রাখেনি।

কথার বিনিময়ে দু'চোখে মমতা সাজিয়ে অনুলেখা অধ্যাপকের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে, তাকায়ও একবার, কিন্তু সে চাহনি এতই চকিত যে না-এরই নামান্তর। অথচ তার এই ক্ষণিক দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে অধ্যাপকের সারা দেহে যেন এক মূর্ত অভিযোগ। লক্ষ্য অনুলেখা—তারই ঈর্ষা ও অভিশাপের অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে অর্পণার মৃত্যু। অনুলেখা কোনো সান্ত্বনার ভাষা ব্যবহার করতে পারল না, বরং নিজের নিরাপত্তার অনুসন্ধানেই তৎপর হল সে। অধ্যাপক যেন প্রতিপক্ষ।

ডক্‌টর সেনশর্মা অনুলেখার দিকে তাকালেন, তারপর ধীর অকম্পিত গলায় বললেন, 'অর্পণা কাল মারা গেছে।'

দৃষ্টিটা অধ্যাপকের দিকে ফিরিয়ে না নিয়ে গিয়েই অনুলেখা মলয়-নিঃশব্দ স্বরে বলল, 'শুনেছি।'

অনুলেখা আরো কিছু শোনবার প্রত্যাশায় ছিল, কিন্তু ডক্‌টর সেনশর্মা নীরব, দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, বসেননি পর্যন্ত। বেশ কিছুক্ষণ পরে অনুলেখা বলল, 'তুমি দাঁড়িয়েই থাকবে, বসবে না?'

ডক্‌টর সেনশর্মা বসলেন না, চুপ করে থাকার পর বললেন,'আজ যাচ্ছি, বলতে গেলে তপু বাড়িতে একাই আছে।'

এতক্ষণে যেন অনুলেখা বলবার মতো সত্যিকার কথা খুঁজে পায়, 'তাকে নিয়ে এলে না কেন?'

ডক্‌টর সেনশর্মা তখুনি কোনো উত্তর দিলেন না, একটু পরে বললেন, 'ওকে এখানে আনার কথা আমার মনে হয়নি।'

'ওঃ!' একটা অভিমানস্ফুরিত শব্দ অনুলেখার কণ্ঠ থেকে স্বকীয় ক্ষোভে বেরিয়ে এল। মাত্র গতকাল অর্পণা মারা গেছে, এরই মধ্যে সে নিজেকে তার জায়গায় গুছিয়ে নিতে যাচ্ছিল, অধ্যাপকের উত্তর সেই নির্লজ্জ আয়োজনের শান্ত প্রতিবাদ। এত তাড়াতাড়ি তিনি তাকে এগুতে দিতে চান না, আদৌ চান কিনা আজ পর্যন্ত তা-ই জানে

না সে। যদিও বিবাহবিচ্ছেদ ডিক্রী হয়ে যাবার পর তাঁর ব্যক্তিগত চাওয়া না-চাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু বাধ্যবাধকতার কথা বাদ দিলে, তিনি কি ইতিমধ্যে বীতকাম হয়ে পড়েছেন? অনুলেখার ইচ্ছে হল, কথাটা স্পষ্টভাবে জিগ্যেস করে, কিন্তু অর্পণা মাত্র গতকালই মারা গেছে! অর্পণা বর্তমানে সে অধ্যাপকের যতটা সমীপে ছিল, তার জীবনান্তের পর সেই ঘনিষ্ঠতা যেন অনেকখানি শিথিল হয়ে গেছে; মাঝখানে সদ্যমৃত্যুর ছায়া এসে পড়ার জন্যেই। কারণ যাই হোক, এ প্রশ্ন আজই করা যায় না। কিন্তু বিচ্ছেদের ডিক্রীর পর কথাটা তুলতেই হবে, যদিও তখন প্রশ্ন অনর্থক, নিরুপায় কর্তব্যের মাঝে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক তাঁর মনের প্রকৃত তথ্য গোপন রেখেই জবাব দেবেন।

'যাচ্ছি তাহলে?' ডক্টর সেনশর্মা অনুমতি চাইলেন।

'হ্যাঁ।' অনুলেখা ঘাড় নাড়ল, 'তপুকে বেশিক্ষণ একা ছেড়ে রেখ না, ছেলেমানুষ! আমার পড়ার জন্যে ভেব না, আমি কিছুদিন নিজেই চালিয়ে নেব।'

অনুলেখার অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডক্‌টর সেনশর্মা চলে গেলেন। আজ এখানে আসবার তেমন স্থিরতাও ছিল না, হঠাৎই আসা-যাওয়া। অর্পণা মারা যাবার পর তাঁর মনে হয়েছিল কণ্টক-বিমুক্ত প্রাণোচ্ছ্বাস নিয়ে অনুলেখা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসবে, কিন্তু তা না হওয়ায় তিনি যেন এক কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশেই তাকে দেখতে এসেছিলেন। অর্পণার মৃত্যু মানে তাঁর পক্ষে অবধারিত রূপে অনুলেখার ভবিষ্যৎ স্বামীপদ গ্রহণ, তাই তার মারা যাওয়াটাকে তিনি যথাসাধ্য সহজভাবেই নিতে চেষ্টা করছিলেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডক্‌টর সেনশর্মার মনে হত, বিপুল ভয় ও ভ্রান্তিবশত মানুষ আধুনিক জীবনকে পূর্বাপেক্ষা জটিল মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনকার জীবন তাৎপর্যহীন মূল্যবোধহীন অতিসরল দিনক্ষেপ। সবই অস্থিরতায় চিহ্নিত। চিন্তা ও স্থিতিমুক্ত।

বন্ধনহীন সম্পর্কহীন নিয়মে রচিত বর্তমান সমাজ। প্রাণ ও প্রণয়ের ভাবমুক্ত আধুনিক জীবনদর্শন।

অথচ অম্বুলেখার সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার পর মনে হতে লাগল, জাগতিক পটভূমিকা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরই অর্পণা যেন তার সর্বসত্তায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। অম্বুলেখাকে ভাল না লাগলেও তিনি গ্রহণ করবেন, দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন না, কিন্তু অর্পণার কায়াহীন ছায়াহীন অস্তিত্ব তাঁর সুমুখে এত বেশি সপ্রমাণ হয়ে রয়েছে যে, এ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সহজে অতিক্রম করা যাবে কিনা সন্দেহ। অর্পণার জীবনকালে তাকে এতবড় বাধা মনে হয়নি।

নিজের অন্তর-বিবর্তন বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্যে ডক্টর সেনশর্মা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। উপলব্ধি হয় তাঁর জীবনের বহু পরিবর্তন হয়েছে, জীবনের মূল্যবোধ বদলে গেছে, কিন্তু যে মূল অনুভূতি থেকে জীবনবোধের জন্ম তা যেন সর্বকালীন অবিচলতার মাঝে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহু দিবারাত্রির সৃষ্টি-বিলয়, বহু সূর্যের উদয়াস্ত তাকে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত রূপেই রেখেছে। সব সুর সেই আদি সুরেই সমাহিত হয়ে যাচ্ছে। তাই যেন অর্পণার স্মৃতির আড়ালে অম্বুলেখার অস্তিত্ব বিলীন।

উনত্রিশ

ইতিমধ্যে অম্লুলেখা আর একদিন আদালত ঘুরে গেছে। আবার গতকাল তার উকিলের মুহুরি এসেছিল, 'কাল শুনানীর তারিখ, সকালে একবার উকিলসাহেবের বাড়ি আসবেন ; কোর্টে কি বলতে হবে, শিখে নেবেন।'

সকাল আটটায় উকিলবাড়ি গিয়েছিল অম্লুলেখা, বেলা সাড়ে এগারোটায় আদালতে হাজির হয়েছে। শুনল তিনটের সময় তার মোকর্দমার ডাক হবে। ন্যায়াধীশের একান্ত কক্ষে গোপনীয় সওয়াল। ক্যামেরা প্রসিডিং। স-পেশকার বিচারক, অম্লুলেখা ও তার উকিল ভিন্ন আর কারো প্রবেশ নিষেধ। তবে ইতিমধ্যে যদি শিলাদিত্য আদালতে উপস্থিত হয়, তাহলে সোজাসরল ধারাপদ্ধতি বেঁকেবর্তে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা যায় না।

বেলা তিনটে পর্যন্ত শিলাদিত্য এল না। অম্লুলেখাব মনে হয়েছিল আসবেই সে, শেষ মুহূর্তে এসে পড়ে বিবাহবিচ্ছেদ রুখবার চেষ্টা করবে। কিন্তু যখন জজের চেম্বারে ডাক পড়ল ও উকিল একগাল হেসে বললেন, 'আপনি সত্যিই ভাগ্যবতী, একটা বড় রকমের স্ক্যাণ্ডাল বাঁচিয়ে এক্সপার্টি ডিক্রীটা পেয়ে যাবেন।'—তখন কার অদৃশ্য হাত যেন তার মুখটাকে অবহেলা ও অপমানের কষাঘাতে জর্জরিত করে তুলল। রক্তগৌর মুখের ওপর কালো ছাপ নিয়ে সে জজের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল। উকিলের দেখাদেখি তাঁকে নমস্কার জানাল।

নমস্কারের স্বীকৃতি দিলেন না ন্যায়াধীশ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অম্লুলেখার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে হাতের ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তারপর স্মিতহাসি হেসে তার উকিলকে বললেন, 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন আলোকলবাবু, বসুন ?'

জজের পাশে পেশকার দাঁড়িয়ে, নথিটা সামনে এগিয়ে দিল। নথি খোলবার আগে জজ জিগ্যেস করলেন, 'অল প্রসেসেস্ এগজস্টেড্?'

ঘাড় নাড়ল পেশকার, জানাল, 'হ্যাঁ। নোটিশ, রেজিস্টার্ড পি. সি. গেজেট, সব হয়ে গেছে।'

উকিলের উপদেশ মতো অনুলেখা মুহুরির হাত দিয়ে পেশকারকে দশটি টাকা আগাম দক্ষিণা দিয়ে রেখেছিল, পেশকার আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল, 'রেসপনডেন্ট নোটিশ নিজের হাতে সই করে নিয়েছে, পোস্টাল অ্যাকনলেজমেন্টেও তার নিজের সই।'

'দেখি?' ন্যায়াধীশ নোটিশ ও ডাকবিভাগীয় রসিদের সই মিলিয়ে দেখলেন, 'তাই তো দেখছি!'

অনুলেখার উকিল জজকে নিঃসন্দেহ করবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, 'ইওর অনার, রেসপনডেন্টের পুরো নলেজ আছে, কিন্তু কনটেস্ট করবে না—হোয়াট হি উইল সে এগেনস্ট্ দ্য হার্ড ফ্যাকট্‌স্?'

ন্যায়াধীশ উত্তর দিলেন না, অনুলেখার দিকে তাকালেন আবার, অনুলেখা চোখ নামিয়ে নিল।

উকিল যেন বিচারককে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে বললেন, 'আজ স্যার এক্সপার্টি ডিসপোজালের জন্যে রাখা হয়েছে। দ্য রেসপনডেন্ট ওয়াজ গিভন্ সাফিসিয়েন্ট অপরচ্যুনিটি টু অ্যাপিয়ার অ্যাণ্ড কনটেস্ট।'

জজসাহেব চাপা বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'ইয়েস, দ্য হোল রেকর্ড ইজ বিফোর মি, য়্যু নীড্ নট বি সো মাচ অ্যাংশাস।' তারপর অনুলেখার দিকে তাকিয়ে একটা অতর্কিত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তিনি, 'মিসেস দত্ত, বিয়ের কতদিন পরে আপনি বুঝলেন যে, বিয়ে করে মস্ত ভুল করেছেন?'

অনুলেখার গলা শুকিয়ে গেছে, প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ও সরল, কিন্তু জবাবটা কি দেওয়া যায় তাই চিন্তা করতে লাগল সে। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে জড়িতস্বরে বলল, 'তিন-চার বছর।'

'তাহলে তো অনেকদিন! অধিকাংশ নারী-পুরুষ বিয়ের পরদিনই বুঝতে পারে জীবনের বৃহত্তম ভুলটা গতকালই হয়ে গেল। তবু তারা আজীবন দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখে, আপনি তা পারছেন না কেন?'

অম্বুলেখা যাতে কোনো আত্মঘাতী জবাব দিয়ে না ফেলে তার জন্যে উকিল তৎপর হয়ে ওঠেন, 'কারণ একটা নয় স্যার, অনেকগুলো —ডির্ভোস অ্যাপ্লিকেশনে ডিটেলড্ দেওয়া আছে।'

আইনের ইঙ্গিত দিয়ে বিচারক উকিলকে সাবধানতার নির্দেশ দেন, 'ম্যাটার ইজ বিট্যুইন কোর্ট অ্যাণ্ড দ্য উইটনেস, শ্যুড য়্যু ইনটারাপট্?'

'আই অ্যাম সরি স্যার!' বলতে বলতে উকিল আড়চোখে অম্বুলেখার দিকে তাকান, তাঁর দৃষ্টি বাক্যময়।

অম্বুলেখার মনে হয় তাকে সূর্য-প্রত্যূষে শেখানো মিছে কথাগুলিই আবৃত্তি করতে বলা হচ্ছে। পাঠ কণ্ঠস্থ, জিভের ডগাতেই আছে, কিন্তু অন্তরের ভীতিময় বিশুষ্কতা যেন ঠোঁটদুটির ওপর মৃত্যুবৎ জড়তা জমা করে দিয়েছে, মুখ কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না।

যাঁর নামে সর্বাধিকারের উকিলনামা সই করে দিয়েছে অম্বুলেখা, সেই অভিবক্তা নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে জাগ্রত এবং সচেতন। অম্বুলেখার অসহায় নীরবতা লক্ষ্য করে তার দেয় জবাবটি নিজেই দেবার চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু এইমাত্র বিচারক তাঁর অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেছিলেন, সেইজন্যে অন্য কথা বলবার আগে অনুমতি প্রার্থনা করেন, 'ইফ্ আই অ্যাম পারমিটেড্ টু মেক্ এ সাবমিশান, স্যার?'

'ইয়েস?'

'আমি স্যার পার্টির স্টেটমেণ্ট করিয়ে দিচ্ছি, তারপর যদি দরকার হয় কোর্ট ক্যোশচেন করা যেতে পারে।'

কি যেন ভাবলেন বিচারক, অম্বুলেখার দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা প্রণয়নের চেষ্টা করলেন। মনে হল, এ মেয়ে সুখী হবার জন্যে জন্মায়নি। এক স্বামিত্বের অধীনে স্নিগ্ধ-

সুন্দর জীবন প্রার্থনা করে না, বহুল সংস্পর্শের উগ্র ক্ষুধায় হিংস্র কামাতুর—অতএব আইনের প্রতিবন্ধক দিয়ে রাখলেও তার স্পৃহা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তার স্বামী নামে পরিচিত একটি ব্যক্তিকে বিবাহের নাগপাশে বেঁধে রাখা ন্যায়ধর্মের অপলাপ। ন্যায়াধীশ বললেন, 'য়্যু আর বেন্ট আপন্ সিকিয়োরিং ডিভোর্স, অলরাইট্, প্রসীড অন!'

উকিলের উত্তরতুল্য প্রশ্নের জবাবগুলি অনুলেখা ছোট ছোট হ্যাঁ-না দিয়েই শেষ করল, বিচারক বাধা দিলেন না। অনুলেখার যা বক্তব্য তা তিনি পুরোটাই লিখে নিলেন, তারপর পেশকারকে বললেন, 'স্টেনোকে ডাকুন, অর্ডার এখুনি ডিক্টেট্ করে দিচ্ছি।'

উকিলের ইঙ্গিতমতো জজসাহেবকে নমস্কার জানিয়ে অনুলেখা তাঁর একান্তকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে এল। তিনটে থেকে চারটে, উদ্বেগ-পূর্ণ একটি ঘণ্টা অতিবাহিত করার পর মুক্তির স্বাদ পেল সে, সেইসঙ্গে বুঝি এক নতুন জীবন, নতুন বন্ধনের সূচনাও!

নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকবার আগে অনুলেখা নিমু চৌধুরীর ঘরে এল। অকারণেই নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একবার, তারপর ডাকল, 'মেজমামা?'

নিমু চৌধুরীর দিবানিদ্রার সময় শেষ হয়নি, তবু অনুলেখা অপেক্ষা করতে লাগল, আবার ডাকবে। বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রী হয়ে গেছে, এ বাড়ির আর কারো সমর্থন নেই, একমাত্র মেজমামা ছাড়া। মামি-মার দিক থেকে নিষেধ বা সম্মতি কিছুই প্রকাশিত হয়নি, স্বভাবগুণে তিনি মৌন, কিন্তু তাঁর নৈমিত্তিক জীবন থেকে ধারণা করে নেওয়া শক্ত নয়, অনুলেখাকে সমর্থন করেন না তিনি। বড়মাসিমার প্রতিবাদ সুস্পষ্ট এবং সোচ্চার, গালিগঞ্জনায় অলংকৃত।

নিমু চৌধুরীর নাসিকাগর্জন শান্ত হল, পাশ ফিরলেন তিনি, সেই সুযোগে অনুলেখা একটু উঁচু গলায় ডাকল, 'ও মেজমামা!'

বার ছ'তিন চোখ পিট্‌পিট্‌ করার পর নিমু চৌধুরী উঠে বসে অনুলেখার দিকে তাকালেন, 'ওঃ, লেখা, আদিত্যকে ভাসিয়ে দিয়ে এলি? এবার শাঁখ বাজাতে বাজাতে অধ্যাপকের বাড়ি চলে যা, ওখানে তো গ্রীন সিগ্‌ন্যাল হয়েই আছে।'

মেজমামার সমর্থনে—বরং তাঁরই উৎসাহে—অনুলেখা এতখানি এগিয়ে আসতে পেরেছে। জীবনের ত্যক্তবিরক্ত ও উপেক্ষিত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যবনিকা দিয়ে তৃতীয় এবং শেষ পরিচ্ছেদের পূর্ণ সূচনা আজ নিয়ে এসেছে। তবু আদালত থেকে ফিরে আসার পর মেজমামার দিকে পর্যন্ত সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না—জানে, মেজমামার চোখে ভর্ৎসনা নেই, স্নেহ-সমর্থন ও শুভেচ্ছা-চিহ্নিত দৃষ্টিতেই তিনি অভিনন্দিত করছেন, তবু কেন তার নিজের চোখদুটো অপরাধের ভারে নমিত হয়ে পড়ছে! অনুলেখার মনে হয়, আজ কি এক অজ্ঞাত কারণে তার হৃদয়মনের আনাচকানাচে সঞ্চিত যত গ্লানি উজাড় হয়ে ওপরপানে ঠেলে উঠে তার স্বপক্ষের যত যুক্তি সমর্থন সব ঢেকে দিয়েছে। নিজের দিকে তাকাতে গিয়ে আবিল মানস-সত্তাই নজরে পড়ছে। সবাই যেন তারই চোখ দিয়ে তাকে দেখছে। এমনকি মেজমামা পর্যন্ত!

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুলেখার পা দুটি ভারি হয়ে এল, ক্রমশ অবশ। মনে হতে লাগল, তার মেরুদণ্ডের মাঝ দিয়েও যেন একটা বিকৃত চেতনার চলিষ্ণু ভাব প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত উঠে জমিয়ে বসবার চেষ্টা করছে। আরো কিছুক্ষণ এইভাবে চললে সে আত্ম-নির্ণয়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। নিজের মনের চতুর্দিকে নৈতিক সমর্থনের বেড়া দিয়ে সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত নিমু চৌধুরীর পালংকে একেবারে তাঁর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে মুখে কৌতুকময় হাসির হাল্‌কা আভা নিয়ে অনুলেখা মেজমামার কথার উত্তর দেয়। বলে, 'তার জন্যে একবছর অপেক্ষা করতে হবে।'

নিমু চৌধুরীর কণ্ঠস্বর আগ্রহহীন বলেই অনুলেখার মনে হয়, তিনি প্রশ্ন করেন, 'কেন ?'

'আইন নাকি ঐ রকমই!' অনুলেখাও মেজমামার দেখাদেখি ব্যাকুলতা-বিসর্জিত গলায় বলে।

'কিন্তু শকুন্তলার অপেক্ষার অবসরে দুষ্মন্তের পিরিতির আংটি যদি বিস্মৃতির রাঘব-বোয়াল গিলে বসে, তখন উপায় ?'

মেজমামার মতো অনুলেখা রসহীন কণ্ঠস্বরে রসিকতা করে, 'তখন শকুন্তলা, মানে অনুলেখা নিরুপায়। তা ভাগ্যকে একটু-আধটু নিজের খুশিমতো চলবার স্বাধীনতা দিতে হবে তো!'

'তা তো হবেই।' মেজমামা এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলেন না, নিজের নেশার দিকে চলে যান তিনি, 'রেসের নতুন বইটা র‍্যাক থেকে এনে দে।'

অনুলেখা গিয়ে বই নিয়ে আসে, মেজমামার হাতে দেয়, তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাতে তার মনের কৃষ্ণমলিন গ্লানিময় মুহূর্তে হঠাৎ কারো সাক্ষাৎ না ঘটে এ জন্যে নিঃশব্দ অথচ ত্বরিত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে সে।

দু'একটা ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল অনুলেখা বুঝতে পারে না। আকাশ-পাতাল এবং সম্পূর্ণ অর্থহীন চিন্তায় ডুবে ছিল সে। ঘুমিয়েই পড়েছিল যেন। চিন্তা-সুপ্তি কাটিয়ে উঠে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যে নেমেছে, কিংবা বুঝি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হাতঘড়িতে আটটা। গ্রীষ্মের রাত আটটা। অর্থাৎ রাতঘেঁষা সন্ধ্যে। বেশবাস বদলানোর কথা মনে হল তার, সেই সূত্রে ভাবল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও একটু ঘুরে এলে হয়।

ডক্টর সেনশর্মার বাড়ি অনুলেখার পক্ষে এখন অবাধ প্রবেশের জায়গা। অধ্যাপক বিপত্নীক, তপু শিশু, তাছাড়া যেটুকু বাধা ছিল আজ তা সম্পূর্ণ অপসারিত। আইন একবছর ব্যবধান রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু আইনের চেয়ে বড় অবরোধ কোথাও যেন রয়ে গেছে। অর্পণা মারা যাবার পরের দিন অধ্যাপক এসেছিলেন,

তারপর এই একমাস সাতাশ দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। অধ্যাপক অবশ্য নিয়মিত য়্যুনিভারসিটিতে যাচ্ছেন, কিন্তু পাঁচের ভিড়ে যে সাক্ষাৎ তা যেন প্রকৃত দূরত্বকে দীর্ঘতর করে। মনে হয় দেখা-সাক্ষাৎই নয়, সম্পর্কও বুঝি সম্পূর্ণ নিঃশেষ!

ইতিপূর্বে অনুলেখার বারকয়েক মনে হয়েছিল, তার তরফ থেকেই অধ্যাপককে নিষেধ দেওয়া আছে, তিনি বারণ করে যাননি; ইচ্ছে করলে সে তাঁর কাছে যেতে পারে, কিন্তু তার ইচ্ছের সঙ্গে তাল রেখে পা-জোড়া এগিয়ে যেতে পারেনি।

অনুলেখার ছুটি নাসা স্ফীত হয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। প্রায়নিশ্চল জড়বৎ অনড় মন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশবাস পরিবর্তনের কথা ভুলে গিয়ে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা একান্ত অভ্যাসবশেই হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। একবার মনে হল, অধ্যাপক এখন কোথাও বেরিয়ে যাননি তো? পরক্ষণেই মনে পড়ল, তপুকে একা বাড়িতে রেখে তিনি বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবেন না।

পায়ে পায়ে অনেকখানি পথ চলে এসেছে অনুলেখা, একবার মনে হয়েছিল উদ্দিষ্ট রাস্তাটা ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু সে চিন্তায় আমল না দিয়ে যেমন হেঁটে আসছিল, তেমনিভাবেই এগিয়ে চলল। তারপর একসময় নিজের চেতনার পূর্ণতম আয়ত্ত নিয়ে দেখল শিলাদিত্যর বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে কখন! ত্রস্তচোখে একবার চতুর্দিক দেখে নিয়ে সে ফিরে চলল, অধ্যাপকের বাড়ি যাওয়ার কথা মনে রইল না আর। যেখান থেকে যাত্রা করেছিল, মামারবাড়িতে পাওয়া সাময়িক আবাসের সেই ঘরখানিতে গিয়ে সে ঢুকে পড়ল।

ত্রিশ

শিলাদিত্য খুশি আজ মানমাত্রাহীন। ইতিপূর্বে নিজেকে কখনো এতখানি মূল্যবান মনে হয়নি তার, এখন সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ও কর্ম-কুশল; উপরন্তু করুণাপ্রত্যাশী ব্যক্তিকে নিয়ে খেলা করার সামর্থ্যে সমৃদ্ধ। অনুলেখা—অনুলেখার কথা থাক্, সে তো নিজের চূড়ান্ত শক্তিলীলা দেখিয়ে শেষাবধি এক সার্বজনীন পরিহাসপাত্রী; বিশ্বের সঞ্চয় থেকে মুষ্টিভিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করতে পারে না।

গত রাত্তিরে প্রীতম কাওর মদের ঝোঁকে শিলাদিত্যর তাঁবুতে চলে এসেছিল। কথাবার্তায় বেআব্রু, কিন্তু ইঙ্গিত আচরণে নয়।

শিলাদিত্য নিজের ক্যাম্পখাটে উঠে বসে, প্রীতম এসে চেয়ারটায় জায়গা নেয়। কথায় কথায় প্রীতম বলে, 'জানো দত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সব কাজগুলো আমি নিজের হাতে করলেও আজকাল মনে হয়, এ আমার শক্তির অপচয়। বরং আমার যদি একটা ছোট্ট ছেলে থাকত, ওয়ার্ক সাইট-এ ঘুরে ঘুরে তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে সেটাকে তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে মজা দেখতুম আমি। দত্তা, আমার আশা কবে পূর্ণ হবে বল তো?'

নিরুত্তর শিলাদিত্য অন্যমনস্কতার ভান করে, আকাশে মেঘের গুর্ গুর্ শব্দ—তাই শোনে কান পেতে।

প্রীতম চটে ওঠে, 'কি ভাবছ তুমি দত্তা, উত্তর দিলে না যে?'

তখনো শিলাদিত্য মূক-মৌন, প্রীতমের ক্রোধ আরো বেশি জাগিয়ে তোলার জন্যে মাথার ঊর্ধ্বে আঙুল তুলে ইসারায় আকাশের কারসাজির কথা বোঝাবার চেষ্টা করে।

রক্তাভ ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে প্রীতম ব্যঙ্গ ও বেপরোয়া ভাবের ধারা গড়িয়ে দেয়, 'মেঘ? চুলোয় যাক্ সব, সব ভেসে যাক্। এখানে আসার পরই তো আমি জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষের

সন্ধান পেয়েছি ; কিছু অর্থক্ষতি হবে, তার জন্যে আর মাথা ঘামাই না।'

তারপরও প্রীতম অনর্গল বক্‌বক্‌ করে, যেন শত জীবন ধরে আয়ত্ত করা ভালবাসার ভাষাগুলো শিলাদিত্যর উদ্দেশে উজাড় করে দেয়, মাঝে মাঝে বলে, 'কই, তুমি তো কিছুই বলছ না ? একপক্ষীয় প্রেম বা ঝগড়া, কোনোটাই যে বেশিক্ষণ চলে না !'

শিলাদিত্য কথা বলতে চায় না, কথা শুধু সময়ের বাজে খরচ, গতির অবরোধ ; ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে প্রীতমকে কাছে টেনে আনে, আদরে আদরে আপ্লুত করে নির্বাক শাস্তিতে নির্বাসন দেয়। কিন্তু মনের গভীরে গাঁথা ইচ্ছেটুকুই—তার ওপারে সে অগ্রসর হয় না, নির্বাক একাগ্রতায় প্রীতমের কথা শোনে। শেষরাতের দিকে প্রীতমের নেশা কেটে আসে, ঘুম পায়, সে নিজের তাঁবুতে চলে যায় —কিন্তু শিলাদিত্য বাকি রাতটুকু বিনিদ্র।

তাঁবুর প্রবেশপথ দিয়ে শিলাদিত্য আজ প্রত্যূষের শুভাগমন দেখে। কি মনে করে বাইরে বেরিয়ে দুটি তাঁবুর মাঝখানে রাখা প্রীতমের স্কুটারটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আবার তাঁবুতে ফিরে এসে অতিদ্রুত তৈরি হয়ে স্কুটার চেপে সাইট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। তখনো ঘুমোচ্ছে প্রীতম। নদীগর্ভে পুল-নির্মাণের কর্মক্ষেত্র ছাড়া বাকি পরিবেশও সুপ্ত।

উৎফুল্ল মন নিয়ে শহর থেকে সাতমাইল পথ শিলাদিত্য যেন উড়ে এসেছে। এতখানি রাস্তার একটি কথাও মনে নেই তার, দুটো একটা ঘটনা চোখে পড়ে থাকবে হয়তো, তাও স্মৃতিধৃত নয়।

সন্ধ্যের পর প্রীতম নিজের তাঁবুতে বসে প্রতিদিনের হিসেবপত্র যাচাই করে, তাই শিলাদিত্য সর্বপ্রথম প্রীতমের তাঁবুতে উঁকি দিল। চারপাইর ওপর বিভিন্ন আকারের খাতাপত্র ছড়িয়ে প্রীতম হিসেবের লিখন ও নিরীক্ষায় মগ্ন। মনে হয় না গতকাল রাত্তিরে সে এসবের বন্ধন কেটে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। তখন যদি শিলাদিত্য তাকে একবার বলত, 'কি হবে কাজকর্ম, কি হবে হিসেবপত্র ; চল,

সব পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে দিয়ে আমরা নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।' তাতে এক মুহূর্ত দেরি হত না তার।

শিলাদিত্য নিজের আবির্ভাবের পৌরুষব্যঞ্জক সাড়া তুলে তাঁবুতে ঢুকতে প্রীতম চমকে উঠল, তারপর সামনের খোলা খাতাদুটো পাশে সরিয়ে রেখে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কি বল তো দত্তা, হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে? আমি সকলকে তোমার কথা জিগ্যেস করলুম, কেউ জানে না, কেউ তোমায় যেতে দেখেনি! তুমি আমায় বলে যাওনি কেন?'

প্রীতমের চারপাইটার কাছে চলে এসে নিজের গায়ের ছায়া ফেলে শিলাদিত্য যেন তার অভিযোগময় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিল, তারপর কলহোন্মুখ ভঙ্গিতে বলল, 'বেশ করেছি বলে-কয়ে যাইনি!'

উত্তরে প্রীতম কিছু একটা বলতে যায়, তার আগেই শিলাদিত্য হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে তোলে। অজস্র অগাধ চুম্বনে প্রীতমকে প্রায় রুদ্ধশ্বাস করে দেয় সে। তার প্রতিটি ক্রিয়ার ফাঁকে একটি মাত্র বাক্যাংশ গুনগুন করে, 'এ-ও বেশ করছি, বেশ করছি!'

শিলাদিত্যর আকস্মিক উচ্ছ্বাসের প্রথম স্রোতটা প্রীতম কাওর নির্বিঘ্নে বয়ে যেতে দেয়, তারপর সে নিজেকে শিলাদিত্যর প্রথম পৌরুষময় কবল থেকে মুক্ত করে চারপাইর ওপর বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'কি হল তোমার দত্তা, হঠাৎ কোনোদিন তো—?' একটু হাসে প্রীতম, আবার বলে, 'না, তোমায় সরিয়ে রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় মাতাল হয়ে কাছে গিয়ে প্রেমের বুলি আওড়ানো।'

কথা বলতে বলতে প্রীতম কাওর লক্ষ্য করে আজ যেন নতুন উদ্দীপনায় শিলাদিত্য অশেষ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কথা শেষ করে বিস্মিত পুলকভরা তির্যকদৃষ্টিতে সে শিলাদিত্যর দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রীতমের কথাটাকে শিলাদিত্য বুঝি যৌবনোচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান মনে করে শক্তিপ্রমত্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'বেশ তো, আবার তা করে দেখতে পার?'

ঘাড় নাড়ে প্রীতম, দুষ্টু দুষ্টু হাসি হাসে, 'না, আর না।'

'কেন ?'

শিলাদিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রীতম আবার হাসতে যায়, কিন্তু না পেরে লজ্জায় ঘাড় নিচু করে, 'তুমি আমায় সবদিকেই হারিয়ে দিয়েছ, পৃথিবীর এতকিছু দেখার পর এখন মনে হয়, সব আবার নতুন চোখ দিয়ে দেখতে হবে। জানো দত্তা, আমার কপালে এত সুখ আছে, বিক্ষুব্ধ জীবনে এত শান্তি পাওনা আছে, তা আমি জানতুম না।'

আদর উপচার ও ভালবাসায় প্রীতমকে ঈপ্সিত জীবনবাসনায় অভিষিক্ত করার পর শিলাদিত্য ক্যাম্প চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে নিজের সারাদিনের কাহিনী শোনায়।

চূড়ান্ত কিছু একটা করে ফিরবে, এই উদ্দেশে পকেটে প্রচুর টাকা নিয়ে আজ সকালে শিলাদিত্য সর্বপ্রথম এগ্‌জিক্যুটিভ এনজিনিয়ারের বাংলোয় গিয়ে উদিত হয়েছিল, কিন্তু সে লোকটাও যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এত বড় পরিকল্পনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাক্, তবু নিজের কর্তব্য অবহেলিত রাখবে। স্পষ্টই বলল, 'টাকা আমি অনেক দেখেছি, দেখছিও—যদি আপনি সত্যি সত্যিই চান যে, আমার দ্বারা কিছু উপকার হয়, তাহলে আজ সন্ধ্যের পর আপনার পার্টনার প্রীতম কাওরকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। তার সঙ্গে টার্ম স্থির হয়ে গেলে আমি সাইট না দেখেই লোকাল ইনস্‌পেকশন রিপোর্ট লিখে দেব, আপনাদের প্রাপ্যের চেয়ে দ্বিগুণ বিল পাশ হয়ে যাবে।'

শিলাদিত্যর ইচ্ছে হল, ঈ-ঈ'র গালে গুটিকয় চড় কষিয়ে দিয়ে স্থানত্যাগ করে, কিন্তু জায়গাটা তারই বাংলো, তাই আত্মসংবরণ করে বেরিয়ে এল। তারপর আবার নিষ্ফল প্রয়াসের গ্লানি নিয়ে সাইট-এই ফিরে আসছিল সে, হঠাৎ মনে হল, সব খবর জানিয়ে নীলকণ্ঠ সেনাপতিকে ট্রাংক কল্ দেয়। পোস্টঅফিসে কল্ বুক করতে গিয়ে খবর পেল, কটকের লাইন আপাতত অচল, বিকেল নাগাদ ঠিক হয়ে

যেতেও পারে। টেলিগ্রাম—! তা নেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু এক সাম্প্রতিক ঝড়ের জন্যে অনেকটা পথ সে টেলিগ্রামকে রেলগাড়ির ভরসায় যেতে হবে, অথবা সরাসরি ডাকযোগেই।

কয়েকটি নৈরাশ্যজনক সংবাদপ্রাপ্তির পর শিলাদিত্য বাড়ি চলে এল। আজকাল বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক অতিশয় ক্ষীণ, অধিকাংশ দিনই তো সাইট-এ কাটে। সেজকাকা জীবনভূষণ তাকে ঠিকেদারিতে প্ররোচিত করেছিলেন, তিনি তার সাফল্যকুশলের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন, তাই শিলাদিত্য তাঁকে বর্তমান দুঃসংবাদ নিবেদন করার প্রয়োজন বোধ করল।

জীবনভূষণ বললেন, 'তাহলে বিকেলের দিকে আর একবার ফোনের লাইন ধরার চেষ্টা করিস, এখন বাড়ি থাকবি তো?'

ঘাড় নাড়ল শিলাদিত্য, 'হ্যাঁ।'

'বেশ, তাহলে চান-টান সেরে খাওয়া-দাওয়া কর, একটু বিশ্রাম করে নে, তারপর যা করার করিস।' পরে তিনি যেন নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বললেন, 'পরশু লেখা তোর খোঁজে এসেছিল।'

বিজ্ঞগাম্ভীর্যের সঙ্গে শিলাদিত্য বলল, 'টাকা নিতে বোধহয়, শুনেছি মাসিক তিনশ' টাকা খোরপোশের ডিক্রী পেয়েছে!'

জীবনভূষণ যেন কিছু গোপন করে নিলেন, 'তা হবে। কেন, কি দরকার, আমায় কিছু বলেনি।'

ঈ ঈ-কে ঘুষ দেবার জন্যে শিলাদিত্য যে টাকার তোড়া নিয়ে গিয়েছিল হাতব্যাগ খুলে তা থেকে কয়েকখানি নোট জীবনভূষণকে দিতে যায় সে, 'তুমি তিনশ'টা টাকা রাখ, আবার যেদিন আসবে দিয়ে দিও।'

'আমি কেন' জীবনভূষণ তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'যার গরজ, সে-ই তোকে খুঁজে-পেতে টাকা নিয়ে যাবে।'

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রীতম কাওর দু'চোখ ভরা আগ্রহ নিয়ে শিলাদিত্যর কথা শুনছিল। তা থেকে কোনো মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করার পরিবর্তে সে যেন দেখছিল শিলাদিত্যর চেহারায় জীবন-যুদ্ধাশ্রয়ী পৌরুষের নিদর্শন। অভিভূত হয়ে পড়েছিল প্রীতম কাওর। নিজের সমস্ত সত্তা শিথিল করে ঐ লোকটির জীবনাবর্তে নিজেকে মিশিয়ে দেবার বাসনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে। মেঘাক্রান্ত আকাশের প্রাণবিদারী গর্জন কানে যাচ্ছিল না।

শিলাদিত্যর কথার মধ্যে হঠাৎ অনুলেখার নাম এসে যেতে সমস্ত আগ্রহ নির্বাপিত হয়ে প্রীতম বিবশ-অবশ অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তবু বিপুল প্রয়াসে একটু সৌজন্য বজায় রাখে, শিলাদিত্যর চোখে নিজের ভাবান্তর ধরা পড়তে দেয় না।

অবশেষে শিলাদিত্য বলল, 'বিকেল পাঁচটায় টেলিফোনের লাইন পেলুম প্রীতম, নীলকণ্ঠ সেনাপতিকেও ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলুম। তিনি ছুটি নাকচ করে আজই কটক থেকে রওয়ানা হচ্ছেন, মানে পরশু—পরশু সকালে নিজে সাইট-এ আসবেন। তারপর—'

প্রীতম হাসল, 'তারপর তুমি লাখপতি!'

শিলাদিত্য তার রসিকতায় সায় দিল, 'নিজের কথাটা বাদ দিলে কেন, আমি লাখপতি, তুমি তস্য পত্নী—কি হলে তবে?'

প্রীতম আবার হাসল, শিলাদিত্য তার হাসির মৃদু খিল্‌খিল্ শব্দটাই শুনতে পেল, কিন্তু সে হাসির বর্ণ তার চোখে ধরা পড়ল না।

তারপর শিলাদিত্য বলে, 'আমার আফসোস প্রীতম, অনু-লেখার সে চেহারা তুমি দেখতে পেলে না। আজন্ম উপবাসী

ভিখিরীও বোধহয় অত দীন হয় না! আমার মনে হয়, সেজকাকাই তাকে খবর পাঠিয়েছিলেন।'

জীবনভূষণের চিঠি নিয়ে পারিবারিক ভৃত্য অনুলেখার কাছে গিয়েছিল। তারপর এক মুহূর্তও দেরি করেনি সে, যে অবস্থায় ছিল সেইভাবেই ছুটে এসেছে। শিলাদিত্য তখন অঘোর ঘুমে মৃতপ্রায়। অনুলেখা তাকে ডেকে তুলতে সাহস করেনি। ইতিপূর্বে দত্তবাড়ির ফটকের সুমুখ থেকে একদিন ফিরে গেছে সে, একদিন এসে জীবনভূষণের সঙ্গে দেখা করেছে। সে দুটি দিনের চেয়েও তার আজকেব অবস্থা অসহায়, অধিক সংকটপূর্ণ।

স্বাভাবিকভাবেই শিলাদিত্যর ঘুম ভাঙল, দেখল অপেক্ষারতা অনুলেখা। সেজকাকা তাকে খানিকটা খবর দিয়ে না রাখলে অনুলেখার আগমন সে স্বপ্ন বলেই ভুল করত।

ধীরেসুস্থে বিছানার ওপর উঠে বসে শিলাদিত্য হাতব্যাগ খুলল, ব্যাগটা পাশেই পড়েছিল। তারপর অনুলেখাকে দেখিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতো দলাপাকানো একমুঠো নোটের মধ্য থেকে তিনটি একশ' টাকার নোট বেছে নিয়ে তার দিকে প্রসারিত করে দিল, 'এই নাও তোমার তিনশ' টাকা। এরপর তোমায় আর আসতে হবে না, আমি নিয়মিত চাকর-বাকরের হাতে টাকা পাঠিয়ে দেব।'

অনুলেখা হাত বাড়াল না, বলতে গেল, 'আমি—'

শিলাদিত্য তার কথা কানে তুলল না, 'তোমার টাকা রইল, নিতে হয় নাও, না হয় যাও, আমার বিশেষ সময় নেই।'

অনুলেখা দাঁড়িয়েই রইল, যেন সমস্ত শক্তি দুটো ঠোঁটের মাঝে একত্র করে অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'আমি অনুতপ্ত।'

'আমিও অনুতপ্ত।' সঙ্গে সঙ্গেই বলল শিলাদিত্য, বলে বলল, 'আর এখানে এস না তুমি, এ বাড়িতে অন্য বউ আসবে।'

একটা বিস্ময়ের ধাক্কা, তারপর এই বিপর্যস্ত অবস্থার মাঝেও অনুলেখার নারী-কৌতূহল চাড়া দিয়ে ওঠে, 'কে সে ?'

'যাও তুমি !' শিলাদিত্যর কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গের বিরতি চিহ্নিত।

শিলাদিত্য বলল, 'অনুলেখাকে আমি তাড়িয়ে দিলুম প্রীতম, এর চেয়ে বড় অপমান সে জীবনে কোথাও হয়নি। ডক্‌টর সেন-শর্মাও বোধহয় পরকীয়া অনুলেখাকে এভাবে তাড়াতে পারতেন না।'

প্রীতম খুব খুশি হয়েছে, সেইসঙ্গে যেন একটু ক্ষুণ্ণও, 'শুধু তাড়িয়ে দেওয়াতে কতটুকু শাস্তি হল তার ? অপরাধের তুলনায় তো কিছুই নয় ! তোমার উচিত ছিল প্রহার করা। এমন মার মারতে যে, একটা অঙ্গহানি হয়ে থেকে সারাজীবন মনে করত, অগাধ অপরাধের যথার্থ শাস্তি হল !'

প্রীতমের কথা শুনে শিলাদিত্য হাঁ হয়ে যায়। অনুলেখা তার কোনো ক্ষতি করেনি, বরং একবার সবিশেষ উপকারই করেছিল। প্রীতমের প্রকৃতি একটু পুরুষালি, কঠোর, কিন্তু এতটা নিষ্ঠুর, তা শিলাদিত্যর কখনো মনে হয়নি। প্রীতমের মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে সে মৃদু ভর্ৎসনার ভাষায় বলে, 'তুমি কি বলছ প্রীতম, অনুলেখাকে আমার মারা উচিত ছিল ?'

'তাই তো ছিল !' প্রীতম হেসে ওঠে, তবু তার কণ্ঠ অশ্রুসজল হয়ে আসে, তা গোপন করবার জন্যে অধিকতর জোরে হাসতে হাসতে বলে, 'যাকে ভালবাসতে হবে, যাকে নিয়ে আজীবন কাটাতে হবে, তাকে মাঝে মাঝে শাস্তিও দিতে হবে বইকি ! শুধু নরম হাতে নারী বশ হয় না দত্তা, কড়া হাতে চাবুকও ধরতে হয়।'

প্রীতমের কথা শুনে শিলাদিত্যর ক্ষোভ নিমেষে দূর হয়ে গেল, পরিবর্তে সে বিস্মিতভাবে বলল, 'কি বলছ প্রীতম !'

প্রীতমের বিস্ময় যেন শিলাদিত্যর চেয়ে বেশি, 'এ ছাড়া তুমি প্রীতমের কাছে আর কি আশা কর? তুমিও কি তাকে দুনিয়ার সাধারণ লোকের চোখ দিয়েই দেখ? তা যদি হয় দত্তা, প্রীতম তোমার তোয়াক্কা করে না। সে আজ নিজের ভাবেই মুগ্ধ, নিজেকে নিয়েই সুখী।'

খানিকটা হতাশ-নিরাশ সুরে শিলাদিত্য বলে, 'তোমার কথা কতটা সত্যি আমি কি করে বুঝব?'

হিসেবের খাতাপত্র হাতের কাছে টেনে নিয়ে প্রীতম কাওর তাতেই আবার মনোযোগ অর্পণ করে তবু শিলাদিত্যর কথার উত্তর দেয়, 'অনুলেখাকে জিগ্যেস কোর, সে বুঝিয়ে দেবে।'

'তাই করব তাহলে!'

প্রীতমের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে শিলাদিত্য নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল। হঠাৎ প্রচণ্ড শ্রান্তিতে তার সমস্ত শরীর ভেঙে পড়েছে যেন, বেশ পরিবর্তন করতেও ভাল লাগল না।

শিলাদিত্য চলে যাওয়ার পরই প্রীতম কাওর হিসেবের খাতা-পত্র দূরে ঠেলে দিয়েছে। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি। মেঘের গর্জন সাড়ম্বর। আজকের রাত বুঝি পার হবে না। এ ক'মাসের সমস্ত প্রয়াস আগামীকাল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পরশু সকালে নীলকণ্ঠ সেনাপতি এসে ভরা নদীর জলই মাপবেন শুধু!

এটুকু বাঁচিয়ে নেওয়া প্রীতম কাওরের অসাধ্য ছিল না মোটেই। এগ্‌জিক্যুটিভ এনজিনিয়ার একবারের জন্যে ডেকেছিল, মাত্র এক-বারই তো! একটি দিনের নিভৃত আসঙ্গ, সত্মসৃষ্ট জীবনের নীতি-সন্দর্ভময় হিসেব থেকে একটিমাত্র মুহূর্তের বিচ্যুতি—কথাটা মনে হতেই প্রীতমের মন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। একটা অতি-সহজ জীবনপ্রয়াসও আজ তার পক্ষে দুঃসাধ্য, অসম্ভব।

প্রীতম কাওরের ইচ্ছে হল একটি ব্যঙ্গময় হাসি দিয়ে নিজের অনীপ্সিত অসহায় বিবর্তনকে অভিষিক্ত করে, কিন্তু পারল না। তার যুগপ্রতিভূ চঞ্চল সত্তা গভীর ভাবস্রোতে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

বৃষ্টির বেগ প্রবল হয়েছে, অস্থির যুগের কয়েকটি অধীরতা-চিহ্নিত আবর্ত চিরনিয়তের প্রবাহে মিশে যাচ্ছে যেন।

শেষ

প্রীতম কাওরের ইচ্ছে হল একটি ব্যঙ্গময় হাসি দিয়ে নিজের অনীপ্সিত অসহায় বিবর্তনকে অভিষিক্ত করে, কিন্তু পারল না। তার যুগপ্রতিভূ চঞ্চল সত্তা গভীর ভাবস্রোতে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

বৃষ্টির বেগ প্রবল হয়েছে, অস্থির যুগের কয়েকটি অধীরতা-চিহ্নিত আবর্ত চিরনিয়তের প্রবাহে মিশে যাচ্ছে যেন।

শেষ

প্রীতম কাওরের ইচ্ছে হল একটি ব্যঙ্গময় হাসি দিয়ে নিজের অনীপ্সিত অসহায় বিবর্তনকে অভিষিক্ত করে, কিন্তু পারল না। তার যুগপ্রতিভূ চঞ্চল সত্তা গভীর ভাবস্রোতে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

বৃষ্টির বেগ প্রবল হয়েছে, অস্থির যুগের কয়েকটি অধীরতা-চিহ্নিত আবর্ত চিরনিয়তের প্রবাহে মিশে যাচ্ছে যেন।

শেষ